তসলিমা নাসরিন

শরম

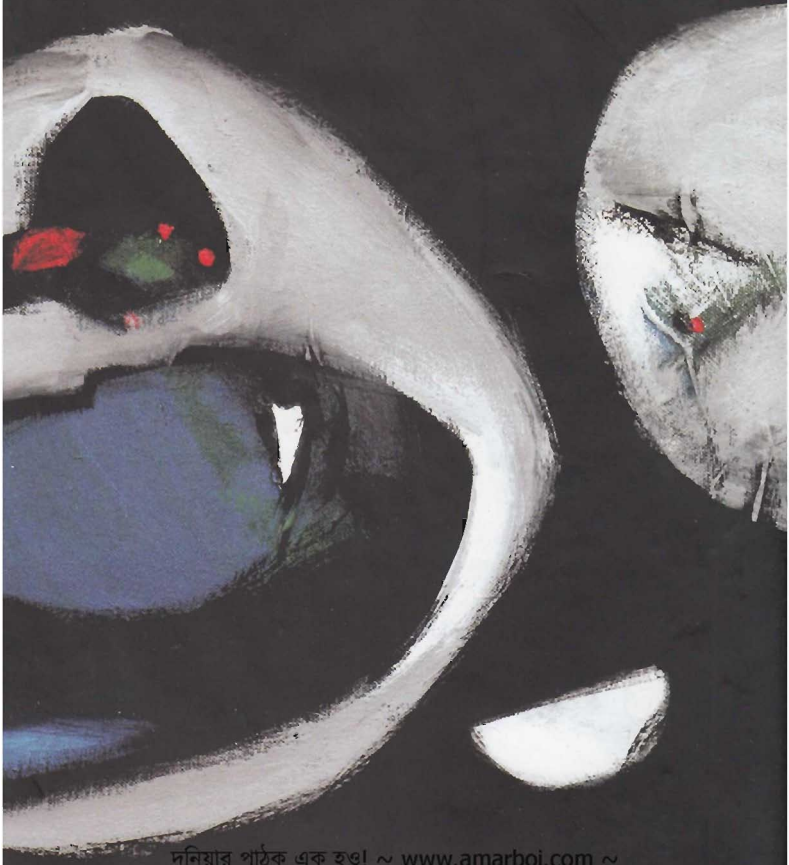

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটি উঠতে চায় নিজে, পারে না। সুরঞ্জনকে উঠে মেয়েটাকে তুলে ধরতে হয়। তার সারা গায়ে ব্যাথা। জায়জায় জায়জায় ক্ষত, কোনওটাতে রক্ত। ও নিয়েই সে জুলেখাকে সায়া ব্লাউজ পরিয়ে দেয়, শাড়ি পরিয়ে দেয়। মেয়েটার সম্ভবত মাথা ঘোরায়, দাঁড়াতে গেলেই পরে যেতে নেয়। সুরঞ্জন জড়িয়ে ধরে রাখে। ধীরে ধীরে মেয়েটাকে নীচে নামিয়ে সে ট্যাক্সিতে তোলে। রাস্তার লোকেরা হয়তো ভেবে নেয় যে অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে ভদ্রলোক। ভদ্রলোকই বটে আজ সুরঞ্জন। পার্ক সার্কাসের গলিতে ঢুকে বাড়ির দরজার কাছে সিড়িতে জুলেখাকে রেখে সুরঞ্জন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। ভেতর থেকে কেউ নিশ্চই দড়জা খুলে দেবে। স্বামী বা কেউ। ট্যাক্সিতে জুলেখাকে উঠিয়ে দিলেই জুলেখা বাড়ি ফিরে যেতে পারতো, সুরঞ্জনেরও কোনো ঝুঁকি নেওয়া হতো না। কিন্তু ঝুঁকি যে আছে নিজে পৌছে দেওয়ায়, ভাবেনি। তাকে পুলিশ ধরতে পারতো, পাড়ার লোকেরাও ঘেরাও করতে পারতো, মুসলমান গুন্ডারা মেরে হাড়গোড় ভেঙে দিতে পারতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তসলিমা নাসরিন জন্ম ২৫ আগস্ট ১৯৬২ সালে বাংলাদেশের ময়মনসিংহে। ময়মনসিংহ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় থেকে পাস করে ১৯৯৩ সাল অবধি চিকিৎসক হিসেবে সরকারি হাসপাতালে চাকরি করেছেন। চাকরি করলে লেখালেখি ছাড়তে হবে– সরকারি এই নির্দেশ পেয়ে তিনি সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দেন।

তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম আপসহীন নারীবাদী লেখক। লেখালেখির জন্য অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, আবার বিতর্কিতও হয়েছেন।

দীর্ঘ নির্বাসন জীবনে প্রচুর পুরস্কার এবং সম্মান অর্জন করেছেন। এর মধ্যে আছে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট থেকে মুক্তচিন্তার জন্য শাখারভ পুরস্কার, ধর্মীয় শান্তি প্রচারের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার, ফরাসি সরকারের মানবাধিকার পুরস্কার, ধর্মীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য ফ্রান্সের এডিট দ্য নান্ত পুরস্কার, সুইডেনের লেখক সংস্থা থেকে কুর্ট টুখোলস্কি পুরস্কার, জার্মানির মানববাদী সংস্থার আরউইন ফিশার পুরস্কার, নারীবাদ বিষয়ে লেখালেখির কারণে ফ্রান্সের সিমোন দ্যা বোভেয়া পুরস্কার, আমেরিকার ফেমিনিস্ট প্রেস পুরস্কার। বেলজিয়ামের গেন্ট ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব লোভেইন, আমেরিকার ইউনির্ভাসিটি অব প্যারিস এবং প্যারিস ডিডেরো ইউনির্ভাসিটি থেকে পেয়েছেন সাম্মানিক ডক্টরেট। ফেলোশিপ পেয়েছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ভারত থেকে *নির্বাচিত কলাম* এবং আমার *মেয়েবেলা* গ্রন্থের জন্য দু'বার আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন। ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়সহ মোট তিরিশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তসলিমার বই। মানববাদ, মানবাধিকার, নারী-স্বাধীনতা ও নাস্তিকতা বিষয়ে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন মঞ্চে এবং হার্ভার্ড, ইয়েল, অক্সফোর্ড, এডিনবরা, সরবনের মতো বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে সারা বিশ্বে তিনি একটি আন্দোলনের নাম।

তিনি এখনও যাযাবর জীবনযাপন করছেন। বাংলাদেশে ফেরার অপেক্ষা করছেন অথবা পশ্চিমবঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরম শ র ম শরম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তসলিমা নাসরিন

শরম

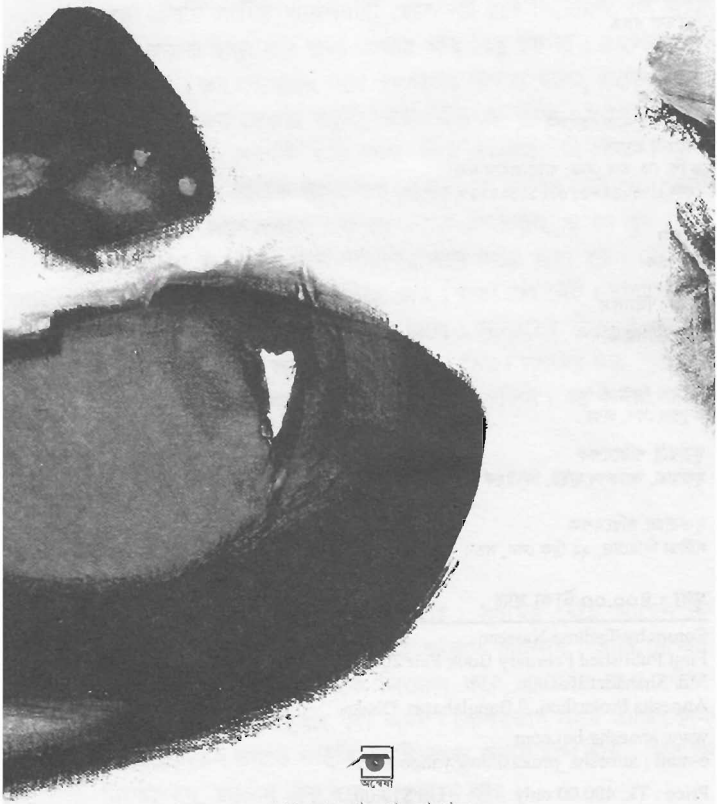

অন্বেষা প্রকাশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরম
তসলিমা নাসরিন

স্বত্ব © লেখক

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে বইমেলা ২০১৫

অন্বেষা ৪৪৯

প্রকাশক
মো. শাহাদাত হোসেন
অন্বেষা প্রকাশন
৯ পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার ঢাকা
ফোন : ৭১২৪৯৮৫, ০১৯১১৩৯৪৯১৭

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অক্ষর বিন্যাস
মো. নাসির উদ্দিন

মুদ্রণ
পানিনি প্রিন্টার্স
তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা মাত্র

Sorom by Taslima Nasreen
First Published February Book Fair 2015
Md. Shahadat Hossain
Annesha Prokashon, 9 Banglabazar, Dhaka.
www.annesha-boi.com
e-mail : annesha_prokashon@yahoo.com
Price : Tk. 400.00 only US $17.00
ISBN : 978 984 91365 4 5 Code : 449

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

নঈম নিজাম
সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

লজ্জা বেরিয়েছে ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে। বাংলাদেশ সরকার এটি নিষিদ্ধ করেছে ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে। এ পর্যন্ত ৪১টি বই লিখেছি, বইগুলোর মধ্যে সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে লজ্জা। কলকাতায় যখন ছিলাম, তখন মনে হয়েছে লজ্জার চরিত্ররা তো কলকাতাতেই আশ্রয় নেয়!

কেমন হয় যদি ওদের কথা লিখি, দেশ ছাড়ার পর নতুন পরিবেশে নতুন দেশে ওরা কেমন আছে! লজ্জা দ্বিতীয় পর্ব নয়, শরম নামটাকেই বই-এর নাম হিসেবে ভেবেছি। লিখে ফেললাম দ্রুত, ঘোরের মধ্যে যেন দেখতে পাচ্ছিলাম ওদের সবাইকে, যেন কথা হচ্ছিল আমার সঙ্গে ওদের, আমিও তো দেশ ছাড়া। আমাদের কষ্টগুলোও হয়ত একই রকম। এই শরম বইটি কয়েক বছর আগে মালায়ালম ভাষায় বেরিয়েছে। বাংলা ভাষায় বেরোচ্ছে এই প্রথম। সুরঞ্জনরা নিরাপত্তা পেয়েছে কতটুকু। মায়া কি বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে, সুধাময় কি মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন! মৌলবাদীদের অত্যাচারে বাপ দাদার ভিটেমাটি আর প্রিয় দেশ ছেড়ে আসা পরিবারটির সুখ-দুঃখের গল্প এই শরম।

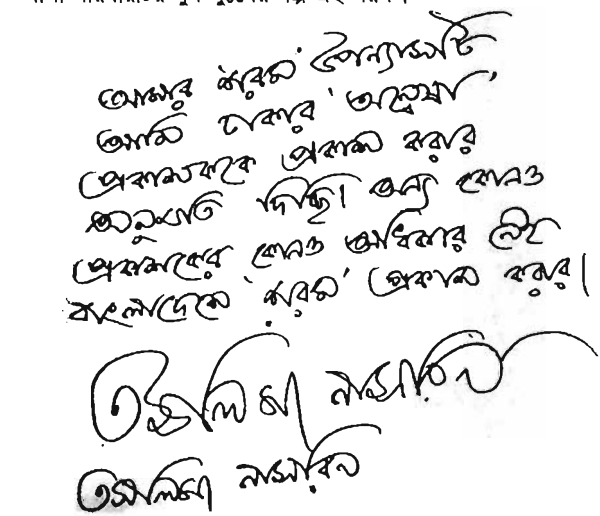

পাঠক, শুভকামনা
তসলিমা নাসরিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সঙ্গে হঠাৎ সুরঞ্জনের দেখা। আমার রাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে সে একদিন বেল টিপল। খুলে দেখি অচেনা একটি ছেলে।

— কী চাই?

— আপনাকে চাই।

— আমাকে কেন?

— খুব দরকার।

— খুব দরকার বললে তো হবে না, আপনি কোত্থেকে এসেছেন, কেন এসেছেন— বলুন।

ছেলেটি মাথা চুলকালো নাকি হাত চুলকালো আমার মনে নেই, তবে কিছু একটা চুলকেছিল। খুব স্মার্ট কিছু বলে আমার মনে হয়নি।

— এভাবে এলে দেখা করা সম্ভব নয়। ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তবে আসুন।

এই বলে দরজা বন্ধ করে দিলাম। দরজার ওপাশে— আমি সুরঞ্জন, সুরঞ্জন দত্ত, দরজাটা খুলুন, একটু কথা বলতে চাই— হাওয়ায় হারাতে থাকা আবছা আওয়াজ। নামটা চেনা লাগলো, সুরঞ্জন দত্ত। বড় চেনা নাম। কিন্তু যুবকের মুখ তো চেনা নয়। কোথায় দেখেছি, নিশ্চিত হওয়ার জন্য দরজা সামান্য ফাঁক করি। না, মোটেও পারছি না। মনেই হচ্ছে না কোনকালে একে আমি দেখেছি কোথাও।

মুখে অপ্রস্তুত হাসি, যুবক বললো— আমি সুরঞ্জন। আমাকে চিনতে পারছেন না? আমাকে নিয়ে তো আপনি একটি উপন্যাস লিখেছিলেন।

— উপন্যাস?

— হ্যাঁ, উপন্যাস। 'লজ্জা' নামের উপন্যাসটি লিখেছিলেন। মনে আছে?

গা কেঁপে উঠলো আমার। যে মানুষ মরে গেছে জানি, অনেক বছর পর যদি তাকেই দেখি আমার দিকে হেঁটে আসতে, বোধহয় এমনই বোধ হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিছোতে পারবো না, এগোতেও পারবো না। বোবা হয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকবো। যেমন আছি। তেমনই ছিলাম দাঁড়িয়ে, সুরঞ্জনের দিকে অপলক তাকিয়ে। সুরঞ্জন একবার আমাকে দেখছিল, আবার চোখ নামিয়ে গাল চুলকোচ্ছিল। হ্যাঁ তখন গালই চুলকোচ্ছিল। আমার মনে আছে, কারণ গালে ওর বড় একটি তিল আছে, উঁচু হয়ে থাকা তিলটিতে যখন ওর নখের আঁচড় লাগছিল, মনে হচ্ছিল বুঝি তিলটি উঠে চলে আসবে। আমার ওই গা কাঁপা বোধটি চলে গেছে ওই তিলের কথা ভেবে। তিল নিয়ে আমার ভয় কয়েক বছরের।

আমার এক ফরাসি বন্ধুর তিল দেখেছি, হাতের একটি ছোট্ট নিরীহ তিল কী করে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ক্যান্সার হয়ে গেল। যখন অল্প বয়স, মুখে ছোট হলেও একটি যেনতেন তিলের জন্য কত হাঁ-হুতাশ করেছি। ভুরু-পেন্সিল দিয়ে একটি তিল ঠোঁটের ওপর কত দিন এঁকেছি। আর এখন, কোথাও তিল গজাচ্ছে দেখলে আতঙ্ক হয়।

সুরঞ্জনের তিলটি আমাকে ওই ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থা থেকে সরায়, নড়ায়। আমি দরজা পুরো খুলে ছেলেকে আহ্বান করি ভেতরে ঢোকার। দরজার সামনে যে দুজন পোশাক পরা পুলিশ রাইফেল হাতে বসে আছে, তারা ঝিমোচ্ছিল না, কিন্তু যাকে ঘরে ঢোকাচ্ছি, পকেটে তার বোমা আছে কিনা, কোনও বদ উদ্দেশ্য আছে কিনা আমার সঙ্গে দেখা করার, কিছু পরীক্ষা করলো না। পুলিশ আসলে আমার ঘরের সামনে ঠিক কী কারণে বসে থাকে আমি জানি না।

এত লোক আসে-যায়, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। আমি না হয় আজ দরজা খুলেছি, কিন্তু অন্যদিন দরজা খোলে সুজাতা। সুজাতাকে যদিও বলা আছে অচেনা কাউকে যেন দরজা না খোলে, কিন্তু গ্রামের খোলা বাড়িতে বড় হওয়া মেয়ে সে কথা সব সময় মনে রাখতে পারে না।

আমার ইন্টারকমটা বছর দুয়েক অকেজো হয়ে পড়ে আছে। অভিযোগ অনেক করেছি, কিন্তু বাড়ির মেইনটেইনেন্স কমিটির কিছু যায়-আসে না তাতে। এমন অনেক দিন হয়েছে যে, অচেনা লোক এসে ঢুকে গেছে বাড়িতে, পুলিশ যথারীতি দরজার সামনে রাইফেল পাশে রেখে ঝিমোচ্ছে। পুলিশ দেখে সুরঞ্জনের একটু ভয় হয় কি! মনে হয়। কেমন যেন ফ্যাকাসে ভাব মুখে।

আমি যখন তাকে ভেতরে ঢুকতে বলি, বসে থাকা পুলিশ আর দাঁড়িয়ে থাকা আমার মাঝখানের পথ দিয়ে তাকে এগোতে হবে, একটু দ্বিধান্বিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম। সে কারণে তিলের ওপর আঁচড় দু-চারটে বেশি পড়ে। প্রথম পদক্ষেপে যে গতি ছিল, সেই গতি শ্লথ হয় দ্বিতীয় পদক্ষেপে। তৃতীয়তে গিয়ে আরও শ্লথ। চতুর্থতে গিয়ে, যখন দরজার ওপর তার শরীর, দ্রুত সুরঞ্জন ঢুকে গেল। দরজা বন্ধ হলো। সোফায় বসল সে। আমি উল্টোদিকে সোফায়।

সুজাতাকে চা দিতে বলে আমি যখন বসলাম তার মুখোমুখি, চোখ নামিয়ে নিল সে। মন এক অদ্ভুত জিনিস, আমার তখন মনে হতে লাগলো, কে বলেছে সে সুরঞ্জন। যদি অন্য লোক কোনও অভিসন্ধি নিয়ে সুরঞ্জন নামে এসে থাকে? তবে!

তারপর 'বলো' বা 'বলুন কী খবর'– এ রকম কিছু বলার আগে আমি, চকিতে উঠে দরজা খুলে দিলাম। হাট করে নয়, আধখোলা। সুরঞ্জন বলে নিজেকে যে দাবি করছে, যদি তার উদ্দেশ্য মন্দ হয়, তবে সে বুঝলে দরজার ওপারে পুলিশ, যে কোনও আতঙ্কের চিৎকারে তারা ঘরে ঢুকে যেতে পারে, উদ্ধার করতে পারে আমাকে যে কোনও আততায়ী থেকে এবং সন্ত্রাসী বা দুষ্কৃতির পরিণাম যে কী ভয়াবহ হবে, তা আমি অনুমান করার জন্য কিছুটা সময় তাকে দিই।

সুরঞ্জন সময় নেয়। সময় নেওয়ার সময় মাথা তার নিচের দিকে ঝুলে থাকে। চুলে কিছুটা পাক ধরেছে। বয়স কত হবে তার! হিসাব করে দেখি আমার চেয়ে কম, কিন্তু খুব কম নয়। চুল তো আমারও পেকেছে। বয়স, এই একটা জিনিসই বোধহয় চোখের পলকে জীবন থেকে চলে যায়। জীবন থেকে অন্য কিছু এভাবে যায় না, বয়স যেভাবে যায়। আমার যে কী করে গেল! হঠাৎ একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখি অনেকগুলো চুল পাকা। নিজেকে চিনতে পারিনি। এ আমি তো! নিজেকে তো সেই সেদিনও কিশোরী বলেই জানতাম! সুরঞ্জন মাথা তুলে প্রশ্নের উত্তর দেয়—কী আর খবর!

যখন চোখাচোখি হয়, মনে হয়, চোখ দুটো চেনা। তার সঙ্গে কি আমার কখনও দেখা হয়েছিল!

সুরঞ্জনের খবর নেই, খবর আর এ সংসারে কী থাকতে পারে, বরং আমি যদি আমার খবরই ওকে জানাই, তার একটা অর্থ হয়, এ রকম বলতে থাকে সে। আর আমি ভাবতে থাকি কোথায় কবে সুরঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

— আচ্ছা, তোমার সঙ্গে কি আমার কখনও...

— না, কোনদিনই দেখা হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— হতে পারে? দেখা নিশ্চয়ই হয়েছে। দেখা না হলে কী করে উপন্যাস লিখলাম?

— শুনে লিখেছেন। কাজল দেবনাথ তো আমার বন্ধু, আপনারও চেনা ছিল। ওর কাছেই শুনেছেন আমার গল্প।

— তাঁতিবাজারে তোমাদের বাড়িতে তো আমি গিয়েছিলাম। তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি?

— না। আমার সঙ্গে হয়নি। মা'র সঙ্গে হয়েছিল। আমি বাড়িতে পৌঁছেছিলাম আপনি চলে যাওয়ার ঠিক সাত মিনিট পর।

সাত মিনিট শুনে হেসে উঠলাম আমি।

— এত মনে আছে?

সুরঞ্জন হেসে মাথা নাড়লো। বললো, মনে না থেকে উপায় আছে?

তার চোখে যতবারই চোখ পড়ছে, মনে হচ্ছে এই চোখের সঙ্গে দেখা আমার আগে হয়েছেই। কোথায় হয়েছে, কখন— কিছু মনে নেই। কিন্তু সুরঞ্জন নিজে অস্বীকার করছে দেখা নাকি হয়নি। যে ছেলের সাত মিনিটের কথা মনে থাকতে পারে, দেখা হওয়ার কথা মনে থাকলে তারই থাকবে।

খবর দেওয়া নিয়ে সুরঞ্জনের খুব উৎসাহ আছে বলে আমার মনে হয় না।

সুজাতা চা দিয়ে গেল। সঙ্গে এক ব্যাগ মজার টোস্ট বিস্কুট। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট দেওয়ার রীতি আমাদের খুব পুরনো। বিস্কুট দেওয়া হলেও দেখেছি লোকে বিস্কুট নেয় না। চা-টাই খায়। সুরঞ্জন একটা বিস্কুট চায়ে ভিজিয়ে কামড় দিল। এই টোস্ট বিস্কুটগুলো আমাকে দেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। বাবা রাতে ফেরার সময় প্রতিদিন কিছু না কিছু আনতেন। সেই কিছু না কিছুতে বিস্কুট থাকতোই। ছোটবেলায় কোনদিনই বিস্কুটহীন রাতের বাবাকে দেখিনি। বাদামি কাগজের প্যাকেটে টোস্ট বিস্কুট থাকতোই। ওই বিস্কুট খেতে খেতে এত বীতশ্রদ্ধ ছিলাম যে টোস্ট হাতে নিয়ে ফিরলে মন খারাপ হয়ে যেত, বাবার ওপরও রাগ হত খুব। চাইতাম অন্য বিস্কুট। মিষ্টি বিস্কুট। ক্রিম লাগানো। টোস্ট ছাড়া অন্য কিছু। আর এখন সেই জীবন থেকে যোজন দূরের জীবনে এসে নানা রকম সুস্বাদু সব বিস্কুটের মধ্য থেকে এক কিনারে অবহেলায় পড়ে থাকা টোস্ট বিস্কুটকে বড় ভালোবেসে তুলে নিই। এর ঠিক কী নাম, এই তুলে নেওয়ার? জানি না।

সুরঞ্জনকে সচেতনভাবেই আমি 'তুমি' সম্বোধন করছি। আমার মনে হয়, যখন দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে ওকে আমি 'তুমি' বলেই ডেকেছিলাম। মাথা থেকে আমার এক বছরে অনেক কিছু উবে গেছে। সুরঞ্জন নামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি ছেলের সঙ্গে দেখা হওয়ার যাবতীয়ও উবে গেছে। দেখাটা কবে কোথায় তার সামান্য তথ্যও নেই মাথার কোনও আনাচে কানাচে।

— সেই তিরানব্বইয়ে এ দেশে এসেছো। অনেক বছর।

শুনে সুরঞ্জন মাথা নাড়ে, হ্যাঁ। অনেক বছর।

— আমার যদি তেরো বছর নির্বাসন। তোমাদের চৌদ্দ বছর।

এটুকু বলে বুঝতে পারে, সামান্য ভুল রয়ে গেল বলায়। তৎক্ষণাৎ শুধরে দিই— অবশ্য নির্বাসনটা আমার, তোমাদের নয়।

সুরঞ্জন হাসলো। এই হাসিটি এমন যার কোনও ব্যাখ্যা করা যায় না।

আমার খুব জানার ইচ্ছে হয় কী করে যাপন করে সে তার জীবন। খুব ভালো একটি সৎনিষ্ঠ আদর্শবাদী ছেলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সে জানি। কষ্ট ছাড়া, করুণা ছাড়া তার জন্য আমার আর কিছু হয় না। তালেবানদের জন্য যেমন হয়। তালেবানদের সঙ্গে সুরঞ্জনের পার্থক্য হলো, ওদের সামনে আর কোনও সম্ভাবনা দেওয়া হয়নি, এক মৌলবাদ ছাড়া। সুরঞ্জন সাম্প্রদায়িক হয়েছিল বটে, সামনে তার অন্য কিছু হওয়ার, বিপরীত কিছু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আসলে সুরঞ্জনকে দেখার পর আগের সেই আদর্শবাদী যুবক বলেই ওকে মনে হচ্ছিল। ও যে বদলে গিয়েছিল, ও যে খুব ছোট মনের ছেলে হয়ে উঠেছিল, মনে পড়েনি। মনে পড়ে মায়া হয়। ভেতরের মায়া আমাকে মায়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। মায়া তো নেই। মায়াকে তো মেরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল লেকের জলে। সুরঞ্জনের নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়, কষ্ট তো তার মা'র আরও নিশ্চয়ই হয়। কিরণ সুধাময় দত্ত, সুরঞ্জনের বাবা কি বেঁচে আছেন? জিজ্ঞেস করতে চেয়েও করিনি। আমি বরং জানতে চাই সে থাকে কোথায়।

খুব ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর, পার্ক সার্কাস।

— কাছেই তো।

— হ্যাঁ কাছেই।

— বাড়িতে কে কে আছে?

এই প্রশ্নটির উত্তরই জানতে চাই। সুধাময় বেঁচে আছেন কিনা, তা সরাসরি না জিজ্ঞেস করে এভাবেই জানতে চাইলাম। আমি নিজের জীবনে দেখেছি কেউ যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার বাবা বেঁচে আছেন তো? ভীষণ অপ্রস্তুত বোধ করি আমি। বেশিরভাগ সময় আমি কোনও উত্তর না দিয়ে, যেন শুনতে পাইনি প্রশ্নটি, অন্য কথায় চলে যাই। আর উত্তর যদি দিতেই হয়, জাতীয় কিছু বলে প্রসঙ্গান্তর করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরঞ্জন বললো— মা আর আমি।

— মা আর তুমি? আমি পুনরুচ্চারণ করলাম। জেনেই করলাম যে করলাম। আসলে আমি ওর উত্তরটি আবার বলে বুঝতে চাইলাম যে, ওর বাবা নেই। আর ও বিয়ে করেনি। বিয়ে করলে বউ থাকতো। এমনও হতে পারে, বিয়ে করেছিল। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

— মা কেমন আছেন তোমার?

এই প্রশ্নটিই সম্ভবত সব থেকে ভালো প্রশ্ন, ওই প্রশ্নগুলোর চেয়ে, তোমার বাবা কি নেই? কী করে মারা গেলেন? বাবার না থাকায় তোমাদের নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হচ্ছে? টাকা কড়ি..?

যে প্রশ্নগুলো করার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও করিনি, সেগুলো নিয়ে ভাবতে গেলেই দেখি টাকাকড়ির প্রসঙ্গ আসে। এই প্রশ্নটিকে তখন আমি আর আটকে রাখি না, ফোকর থেকে চড়ুই পাখির মতো সুরুৎ করে বেরিয়ে আসে।

— কী করো তুমি? মানে চাকরি-বাকরি? বা ব্যবসা, বা কিছু? বলছিলাম জীবিকার জন্য কী করছো?

সুরঞ্জন ধীরে ধীরে হাত কচলাতে কচলাতে বলে, আপাতত কিছুই করছি না।

এই কিছুই না করার সংবাদটি দুঃসংবাদ নিঃসন্দেহে। কিছুই না করে সংসার কী করে চলছে ওর, তা আমি অনুমান করতে পারি না। লক্ষ করি, আমি খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুরঞ্জনের সঙ্গে কথা বলতে পারছি না, পারছি না সম্ভবত এই কারণে যে, তার ওই নষ্ট হয়ে যাওয়াটি আমি কিছুতেই মানতে পারিনি। সে যদি ও দেশ থেকে নিরাপত্তার অভাব বলে আসতো, কোনও অসুবিধে ছিল না। কিন্তু যে ঘৃণা ছুড়তে ও চলে এসেছে, তা আমার গা কাঁপিয়ে দেয়। ঘৃণা মৌলবাদী এমনকি সরকারের বিরুদ্ধে হতেই পারে, ঘৃণার পক্ষে সব রকম যুক্তি আছে। কিন্তু ঘৃণা যদি সাধারণ মানুষের জন্য হয়, যে কোনও মানুষের জন্য, তারা মুসলমান বলেই হয়, তাহলে যথেষ্ট আপত্তি আমার। আমি তা কোনদিনই মানবো না। হিন্দু হয়েও যেমন মানুষ উদার এবং সৎ হতে পারে, একই রকম মুসলমান হয়েও পারে।

— আপনি এখানে অনেক দিন আছেন?

এবার সুরঞ্জন প্রশ্ন করলো। ওর প্রশ্নে আমি এক রকম বাঁচলাম। অতিথি আপ্যায়ন করা মানে যদি করে করে কথা চালিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে, তবে ওই অস্বস্তিকর আপ্যায়নের চাপ থেকে আমার অতিথিই আমাকে বাঁচালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোফায় হেলান দিয়ে কুশন একটিকে কোলের ওপর নিয়ে বললাম, হ্যাঁ, অনেক দিনই তো। প্রায় আড়াই বছর।

— ভিসা নিয়ে একটা সমস্যা হচ্ছিল। ওটা মিটেছে?

— এখন রেসিডেন্ট পারমিট পাচ্ছি। ছয় মাস করে করে পারমিশন দিচ্ছে।

— সিটিজেনশিপের কিছু হয়নি? সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে।

— নাহ্।

এই নাহ্ বলার সময় যাকেই নাহ্ বলেছি, আমি খেয়াল করেছি, আমার একটি দীর্ঘশ্বাস বেরোয়।

কথা না পেলে যা হয়, বললাম— তুমি খুব খবর রাখো দেখি।

— খবরের কাগজে পড়ি। তাই জানতে পারি।

— হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা কেন হলো তোমার।

প্রশ্ন করব না এ রকম পণ করার পরও প্রশ্নটি করে ফেলি কৌতূহলে।

— দেখা কয়েক বছর থেকেই করবো বলে ভেবেছি। তখন মাঝে মাঝে আপনি আসতেন কলকাতায়, বিদেশ থেকে। ভাজ বেঙ্গলে আছেন. সেটাও শুনেছি। দেখা করতে খুব একটা সত্যি বলতে কী, সাহস হয়নি বলবো না, সংকোচ ছিল।

— সংকোচ কেন?

সুরঞ্জন এর কোনও জবাব না দিয়ে বললো— এখন তো কিছুদিন এখানে আছেন!

ধীরে ধীরে বলি— হ্যাঁ, তা আছি। এখানেই তো থাকি। অনুমতি যত দিন জোটে, তত দিন আছি।

— বাইরে তো যাওয়া হয়?

— হ্যাঁ, নানা অনুষ্ঠানে ইউরোপে-আমেরিকায় যাই। কিন্তু ফিরে আসি। কলকাতায়।

নিজের কথা বলার ইচ্ছে আমার নেই। ইচ্ছে, সুরঞ্জনের কথা শোনার। পার্ক সার্কাস এলাকায় সে থাকে। এলাকাটি যতদূর জানি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা। এই এলাকায় সুরঞ্জন বাস করছে, যে ছেলেটি প্রচণ্ড রকম হিন্দু! মেলাতে পারি না।

— একদিন আসুন আমাদের বাড়িতে। মা আপনার কথা মাঝে মাঝেই বলেন। আপনার জন্য দুঃখ করেন খুব।

— দুঃখ? কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— বলেন আমাদের কথা লিখতে গিয়েই আপনার এমন হয়েছে। দেশ থেকে বিতাড়িত।

আমি আরও দু'কাপ চায়ের কথা সুজাতাকে বলে তার পর বলি— 'লজ্জা' লেখার কারণে আমার নির্বাসন হয়নি। 'লজ্জা' তো সরকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। আমার বিরুদ্ধে ধর্মান্ধরা খেপে আগুন হয়ে গিয়েছিল, কারণ, আমি ইসলাম ধর্মের সমালোচনা করেছি। নারীর স্বাধীনতার পথে সব ধর্মই বাধা। আমার এই কথাটি ধর্মান্ধরা বা ধার্মিকেরা মেনে নিতে পারেনি।

আমি ইচ্ছে করেই ধর্ম প্রসঙ্গে বললাম। কারণ সুরঞ্জন যেহেতু ধর্মান্ধে পরিণত হয়েছে, ধর্ম সম্পর্কে আমার আগের সেই মতও যে এখনও অটুট আছে, তা সে জানুক! রাজনৈতিক দুরবস্থার শিকার হলে আমি যে আমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হই না, তা বুঝুক।

বারান্দায় রোদ এসে পড়েছে। মিনু, আমার বেড়াল, আমার পালক মেয়ে রকিং চেয়ারটায় চিত হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। টবের গাছগুলো বেশ লাগছে বারান্দায়। বারান্দার কাঁচের দরজাটা আমি খোলাই রাখি। তাতে ঘরটা বেশ বড়, যেন দিগন্ত ছুঁয়েছে এমন মনে হয়। বারান্দায় দাঁড়ালে যদি একটা সমুদ্র দেখা যেত, নয়তো একটা একলা পাহাড়! অবশ্য জীবনে অনেক পাগল-করা প্রকৃতি আমি দেখেছি। পৃথিবীর সমস্ত সুন্দরের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছি। শুধু প্রকৃতি দিয়ে কি মন ভরে। মানুষ চাই, মানুষ। সুরঞ্জনকে কি সেই মানুষের কাতারে ফেলবো আমি! আবার একদিন কি ওর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে আমার হবে!

সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে আমার রাগ হওয়ার বদলে সত্যিই মায়া হয়। কী ভীষণ ঝড় বয়ে গিয়েছিল ওর জীবনে! কিছুই কি আর লিখতে পেরেছি!

— আসলে কি জানো, 'লজ্জা'য় খুব বেশি তোমাদের কথা লিখতে পারিনি। তথ্যই বেশি দিয়েছিলাম। তথ্যমূলক বই করারই ইচ্ছে ছিল বলে!

সুরঞ্জন আবারও সেই হাসিটি হাসে।

হঠাৎ মনে পড়ে বলে বলি ওকে,— বিদেশে তো কত লোক অ্যাসাইলাম পেয়ে গেল 'লজ্জা'য় তাদের নাম আছে বলে, কত মুসলমান নাম পাল্টে হিন্দু নাম রাখলো, যেন অ্যাসাইলাম পেতে সুবিধে হয়। সুরঞ্জন দত্ত নাম দিয়েও অনেকে আমার বিশ্বাস অ্যাসাইলাম পেয়েছে। তুমিও পেতে অ্যাসাইলাম। অবশ্য তুমি তো বোধহয় ভারতেই আসতে চেয়েছিলে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার চোখ আমার চোখে সম্ভবত বোঝে সে, আমি বলতে চাইছি, দেশ ছাড়ার পর অন্য কোনও দেশ নয়, ভারতকেই আশ্রয় ভেবেছিল সুরঞ্জন নিজে হিন্দু বলে, হিন্দুর দেশ ভারত এই ধারণা তো সব কট্টরপন্থির। আর কট্টরপন্থি হতে সুরঞ্জনের বাকিই বা কী ছিল!

— মাকে একদিন নিয়ে আসবো এখানে।

বললো সে। ওর মলিন শার্টটির দিকে, ওর মলিন জিন্সটির দিকে, খুলে রাখা ওর মলিন জুতোর দিকে, মোবাইল বাজতে যেটি সে শার্টের পকেট থেকে ধরে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিল সেই মলিন মোবাইলের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝি সুরঞ্জনের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। ও কোনও অর্থ সাহায্যের জন্য কি আমার কাছে এল! বা কোনও চাকরি চাইতে? যদিও আমার কোনও ক্ষমতা নেই, তার পরও লোক আমার কাছে আবদার করে। এখানকার অনেকের ধারণা, আমার সাংঘাতিক ক্ষমতা। আমার অঢেল টাকা, যে টাকা কোনওদিন ফুরোবে না, এমন ভাবার লোকও কম নেই।

পরের কাপে চুমুক দিয়ে সুরঞ্জন আমার ঘরটি দেখে। খুব মন দিয়ে দেয়ালের ছবিগুলো দেখে। বইয়ের আলমারিগুলো, ফ্রিজের গায়ে সাঁটা বিঅ্যাওয়ার অব ডগমা স্টিকারটির দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। ঘরটি খুব দেশি জিনিসে সাজানো। এতকাল বিদেশ থাকার কোনও চিহ্ন নেই ঘরে, তা কি ও টের পায়!

— মাকে একদিন নিয়ে আসবো?

— হ্যাঁ। নিশ্চয়ই নিয়ে এসো।

সুরঞ্জন অনেকক্ষণ খালি হয়ে যাওয়া চায়ের কাপটি ট্রেতে রেখে হঠাৎ বলে— আমাকে যেতে হবে। বলেই সে উঠে দরজার দিকে হাঁটতে থাকে। দরজা খোলায় সাহায্য করতে করতে আমি বলি— খুব তাড়া আছে বুঝি?

সুরঞ্জন হ্যাঁ এবং না দু'রকম মাথাই নাড়ে।

— তুমি আমার ফোন নম্বরটা রাখতে পারো, তোমার মাকে নিয়ে আসার আগে ফোন করে এসো।

দরজায় দাঁড়িয়ে সুরঞ্জনকে আমার নম্বর দিই। অন্যদের বেলায় এভাবে দরজায় দাঁড়াই না। জানি না সুরঞ্জনের জন্য কেন আমার মায়া হচ্ছে। সে আমার উপন্যাসের নায়ক ছিল বলে, নাকি ওর দারিদ্র্যের কারণে আমার একটু মায়া হচ্ছে বলে? লিফটে ওঠার আগে সুরঞ্জন বললো— মায়াও খুব আসতে চাইবে। ওকেও কি...?

— মায়া?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার চোখ বিস্ফারিত সে আমি বুঝি।

— হ্যাঁ, মায়া।

— মায়া?

— হ্যাঁ, মায়া।

— ও।

যেন আমি দীর্ঘকালের একটি কষ্টের পাথর নিজ থেকে দেখলাম বুক থেকে সরে গেল।

লিফট নেমে গেল। ড্রইংরুমের যে চেয়ারে সুরঞ্জন বসেছিল, সেই চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আমি চোখ বুজে পড়ে রইলাম। আমার কোনও কিছু বিশ্বাস হতে চাইছে না। এই চেয়ারটায় সুরঞ্জন দত্ত বসেছে, বলেছে, মায়া বেঁচে আছে। অনেকক্ষণ ওভাবেই বসে থাকি আমি। মনে হতে থাকে রিয়ালিটির সঙ্গে ফিকশনের দেখা হলো। গল্প লিখতে লিখতে যেভাবে সুরঞ্জনকে আমি কল্পনা করেছিলাম, তার মতো ঠিক নয় সে। তাকে দেখতে, তার কথা বলা, তার তাকানো, তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের সঙ্গে আমার উপন্যাসের সুরঞ্জন মেলে না। সুরঞ্জন অস্বীকার করলেও আমার মনে হয় তার সঙ্গে আমার কোথাও দেখা হয়েছিল। আমার শান্তিবাগের বাড়িতে সে একবার নয়, দুবার গিয়েছিল। কেন, তার সে কথা মনে নেই, তা আমার জানার কথা নয়। কার যে কী মনে থাকে, কী থাকে না, তা কি সে নিজেই জানে! আমরা নিজেরাই আমাদের অনেক কিছু ভুলে বসে থাকি, অন্যরা যারা আমাদের অনেক কিছু মনে রাখে, তার দায় কি অন্যরাই নেবে, নাকি আমরাও কিছু নেব? বর্তমানে আসল সুরঞ্জন ফিকে হয়ে গিয়ে ছবির সুরঞ্জনই আমার কাছে বেশি বাস্তব যেন। তার সঙ্গে দুবার দেখা হলেও আমি তো কল্পনা করে নিয়েছি অনেক কিছু। ঘটনাগুলো করিনি কিন্তু ঘটনার শাখা-প্রশাখাগুলো তো করেছি। যেমন পুলকের কাছে যখন টাকা চায়, ওর বাড়িতেই প্রথম সে যায়নি, কাছের একটি দোকানের সামনে তার সঙ্গে দেখা করেছিল, তারপর দুজন মিলে বাড়িতে যায়। কিন্তু যেহেতু আমি পুলকের বাড়িতে আগে সুরঞ্জনকে নিয়েছি, যেহেতু তাদের বাড়িতে যাবার আগে রাস্তার দেখা করার সেই তথ্যটা তখন, অর্থাৎ লেখার সময় আমার জানা ছিল না বলে যা জানা ছিল যতটুকু, তাই লিখে দিয়েছি বইয়ে। বইয়ে যা লিখেছি, তা লিখতে গিয়ে আমার বহুবার পড়া হয়েছে, ছাপা হওয়ার পরও বারবার পড়া হয়েছে। এই পড়ার কারণে আমার বেশি সত্য বলে মনে হয় বইয়ে যা লিখেছি তা, বাস্তবে যা ঘটেছে তার চেয়েও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ বাস্তবের ঘটনা নিয়ে আমি চর্চা করিনি, চর্চা করেছি বইয়ের লেখা নিয়ে। তাতে হয় কী, বাস্তবে কী ঘটেছে তা অচর্চায় মলিন হয়ে যেতে থাকে। সুরঞ্জন আর পুলকের রাস্তায় দেখা হওয়াটা আমি জানি, জানলেও সেটা মলিন হতে থাকে, আর আমার মাথা থেকে বিস্মৃতি এসে ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায় কোথাও।

মায়া, ভেবেছিলাম মারা গেছে। কারণ লেকের জলে যে মেয়ে ভাসতে থাকে, তাকে কে ভাববে যে বেঁচে আছে? চোখের সামনে আমার দুটো মায়া, এক মায়া মৃত, লেকের জলে মরে-পচে ফুলে ওঠা। আরেক মায়া কলকাতায়, জীবন্ত, ঝকঝকে। দুই মায়া আমাকে দেয়ালে ঠেসে ধরতে থাকে। সারা দিন আমি ঘোরের মধ্যে থাকি। কাউকে বলি না যে সুরঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। ঘটনাটি শুধু আমার একার থাকে। কাউকে বলি না এই শহরের কোথাও মায়া নামের সেই মেয়েটি আছে, যে মেয়েটির বেঁচে থাকার কথা ছিল না কিন্তু বেঁচে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরঞ্জন রাউডন স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে পার্ক সার্কাসের দিকে যাবে ভেবেও যায় না। পার্ক স্ট্রিটের দিকে যাবে না ভেবেও যায়, পার্ক স্টিট্রের মেট্রো ধরবে ভেবেও ধরে না। প্ল্যানেটোরিয়াম পার হয়ে তাঁর একবার ইচ্ছে করে একাডেমির দিকে যায়, ছবির প্রদর্শনী কিছু থাকলে দেখবে, নাহ, তারও ইচ্ছে হয় না, আনমনে হাঁটতে হাঁটতে সে ময়দানে পৌছোয় ঝাঁকড়া চুলওয়ালা একটি গাছের ছায়ায় এক শরীর ক্লান্তি নিয়ে বসে, গাছের পাতা একটু একটু নড়ছে, আলতো করে গায়ে আদর বুলিয়ে যায় হাওয়া। রোদে ভিজে পিঠে লেপ্টে থাকা শার্টটি খুলে শুধু গেঞ্জি গায়ে শুয়ে পড়ে সটান ঘাসের ওপর। এ শহরে তাকে খুব বেশি কেউ চেনে না। জন্ম তো আর এ শহরে নয়। বড় হওয়া, বেড়ে ওঠা কিছুই এ শহরে নয়। হাতে একটি সস্তার ঘড়ি, পকেটে তিরিশ টাকা। এই সম্পদ নিয়ে ঘুমিয়ে গেলে আশঙ্কার কিছু নেই। চোরের পকেটও এর চেয়ে ভারী থাকে, হাতে এর চেয়েও ভালো ঘড়ি থাকে। নিজের হাতের ঘড়িটির দিকে অনেক দিন তাকাচ্ছে সুরঞ্জন, ঘড়ি পরার কোনও দরকার কি তার আছে? নিজেই জিজ্ঞেস করে, নিজেই উত্তর দেয়, নেই। সময় কেবল যায়, সময় কখনও আসে না। ঘড়িকে দিনে দুবেলা পুজো করলেও সেই ফেলে আসা দিনগুলোকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কেবল যে যাচ্ছে এবং তাকেও নিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ একটা অন্ধকার খাদের দিকে, অনিশ্চয়তার দিকে, মৃত্যুর দিকে, তাকে অত ভালোবেসে জড়িয়ে রাখার কী আছে! কোনও একটা লেকের জলে, ভিক্টোরিয়াল জলে ঘড়িটাকে সুরঞ্জনের ইচ্ছে করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে।

ঘুমোতে চায় সে, কিন্তু পারে না। আজকের দিনটি তার জীবনের খুব স্মরণীয় দিন হতে পারতো, আজ কলকাতা শহরে সুরঞ্জন দত্ত, 'লজ্জা'র নায়ক, দেখা করেছে, তাকে নিয়ে উপন্যাস লিখে জগদ্বিখ্যাত হওয়া নাসরিনের সঙ্গে। আজ কেউ জানলো না যে তাদের দেখা হয়েছে, উপচে পড়তে পারতো টেলিভিশনের লোকেরা, সংবাদ সংস্থা, আর সাংবাদিকে ভরে যেতে পারতো ঘর, যে ঘরটিতে আজ দুজন বসে কথা বলছিল। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি ইচ্ছে হয় অমন জমকালো কিছুর মধ্যে দাঁড়াতে? ভেতরে টের পায় সে, ইচ্ছে হয় না। জানে সে, খুব অপ্রতিভ লাগবে তার। তার চেয়ে এই ভালো, যেমন আছে সে। বাংলাদেশ থেকে চলে আসার পর প্রথম প্রথম তাকে নিয়ে হইচই হতো। নিতান্তই পাড়ার মধ্যে ছিল সে হইচই। পাড়া ছাড়িয়ে ছিল সামান্য, ওর বেশি নয়। সাংবাদিকদের নজরে সে পড়েনি। সুধাময়ের মৃত্যুর সময় শুধু ছিল কিছু আলোর ঝলকানি। সুরঞ্জনের একটু ভালো লাগেনি ক্যামেরার চোখ জ্বালা করা সেই সব আলো। সাংবাদিকদের পাথর পাথর মুখ।

'লজ্জা' নিয়ে একশো রকম লেখালেখি তখন খবরের কাগজে। কলকাতা থেকে সোনারপুরে যেতে-আসতে সুরঞ্জন দেখতো ট্রেনে প্রতিদিনই লজ্জা বিক্রি হচ্ছে। 'লজ্জা লজ্জা' বলতে বলতে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে হকারগুলো। তখন সবে এসেছে তারা কলকাতায়। বেলঘরিয়ায় এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছিল। সোনারপুরে প্রায়ই তাকে যেতে হত তখন। দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় তাকে কথা দিয়েছিল কোথাও একটি চাকরির ব্যবস্থা করবে। না হলে ওয়াগন তৈরির কারখানায় ঢুকিয়ে দেবে। সুরঞ্জন অনেক দিন সেই আশায় ঘুরেছে। সেই সব দিন যেন এই সেদিনের ঘটনা। দিন যে কী করে চলে যায় চোখের পলকে! মাত্র কটা বছরেই জীবন কী ভীষণ পাল্টে গেল! সে 'লজ্জা'র সুরঞ্জন— এই কথা বলতে গিয়ে বেশ কয়েকটি জায়গায় মার খেয়েছে সে, নয়তো বিদ্রূপ শুনেছে।

কেউ তাকে বিশ্বাস করেনি। এরপর বলাই সে বন্ধ করে দিয়েছে সে সুরঞ্জন। অনেকে নাম শুনে ভাষায় বাঙাল টান শুনে চোখ কুঁচকেছে, বলেছে

— তোমরা তো বাবরি মসজিদের ঘটনার পর বাংলাদেশ থেকে এসেছো। তুমি কি তাহলে 'লজ্জা' বইয়ের সুরঞ্জন নাকি? সুরঞ্জন সজোরে মাথা নেড়ে না বলেছে। স্বীকার করলে আবার কী থেকে কী হয়ে যায় কে জানে। বিপদ থেকে সে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চেয়েছে। বিপদ কম আসেনি। মুখে ঘুষি খেয়ে চোখের তলায় কালসিটে দাগ পড়েছিল পুরো দুমাস। বিশ্বাস করেনি অনেকে, কিন্তু আবার কয়েকটি জায়গায় তাকে কী কারণে সে জানে না যে বিশ্বাসও করেছে। তাকে স্থানীয় মঞ্চে তুলেছে, সম্বর্ধনা দিয়েছে, এমনকি চাকরিও পাইয়ে দিয়েছে। কিন্তু রাজ্যজুড়ে বেলঘরিয়ার প্রফুল্লনগরে দূর আত্মীয়ের বাড়ির একটি ঘরে বাবা-মা আর বোনকে নিয়ে কোনওভাবে মাথা গুঁজে পড়ে থাকা সুরঞ্জন যে 'লজ্জা'র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরঞ্জন, তা রাষ্ট্র হয়নি। রাষ্ট্র হলে কীইবা হতো, এদিক-ওদিক একটু সুবিধে পেত হয়তো। কীইবা সেসব সুবিধে আর! চোখ বোজে সে। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের ভেতর আকাশের মতো নীল যন্ত্রণা সুঁইয়ের মতো ঢুকে যায়।

দুপুরে সে বাড়ি ফেরে। খায়। ঘুমোয়। বিকেলে দুটো বালক আসে পড়তে, একেক দিন একেকজনকে পড়ানো। 'কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে' কথাটা ঠিক নয়। সুরঞ্জনই তার প্রমাণ। তার টিউশনির টাকা দিয়ে সংসার চলে না। কিরণময়ী শাড়ি বিক্রি করতে শুরু করায় তবু কিছুটা রক্ষে। ঘরেই শাড়িতে এমব্রয়ডারি কাজ করিয়ে বিক্রি করেন কিরণময়ী। খুব বেশি দিন এই কাজ করছেন না। শাড়ি বিক্রি করে এমন এক মহিলার সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো তাঁর, আর তারই উৎসাহে এই ব্যবসায় নামা। অভাবের সংসারের হাল তিনি নিজেও কিছুটা ধরতে পারবেন বলে শুরু করা। তিনি হাল ভালোই ধরেছেন, আবার আগের মতোই রেঁধে-বেড়ে ছেলেকে খাওয়ান। ছেলে বাড়ি ফিরবে কখন, অপেক্ষায় বসে থাকেন।

সুরঞ্জন খেতে খেতেই তার মাকে বলেছে— আজ সকালে তসলিমা নাসরিনের সঙ্গে দেখা হলো।

কিরণময়ী হাঁ হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। উত্তেজনায় কথা বলতে পারছেন না। জল খেয়ে ঢোক গিলে গিলে মাথা শান্ত করে বললেন— কী করে গেলি? কোথায় থাকে জানলি কী করে? কী বললো তোকে? আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করলো? থাকতে চাইছে তো ও? ওকে কি থাকতে দেবে সরকার?

এত কথার উত্তর সুরঞ্জন দেয় না। শুধু বলে— মায়া যে বেঁচে আছে, জানে না। একটু চমকে উঠলো মায়ার কথা বলাতে।

— হতেই পারে। পরে বোধহয় আর খোঁজ নেয়নি। আর দেশেই তো ছিল না। বেরিয়ে যেতে হলো। বেচারা।

কিরণময়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। অনেকক্ষণ দুজনের মুখে কথা নেই। পুঁইশাক, পোনা মাছ আর ডাল দিয়ে সুরঞ্জন খাওয়া শেষ করে। মসুর ডালটা চুমুক দিয়ে শেষে খায়। এ পাড়ায় সবাই ডাল আগে খায়। এ বাড়িতে দেশের অভ্যেসই চলে। ডালটা শেষে খেলে জিভে পাঁচ ফোড়নের অপূর্ব স্বাদ লেগে থাকে।

সোনার চামচ মুখে নিয়ে সে জন্মায়নি। সাধারণ এক মধ্যবিত্ত ঘরে তার জন্ম। দারিদ্র্যের কথা সে শুনেছে, দারিদ্র্য সে দেখেছে, কিন্তু নিজেকে ভোগ করতে হয়নি কোনদিন। কিন্তু দেশ ছাড়ার পর হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দারিদ্র্যের বত্রিশ দাঁতের কামড়। প্রফুল্লনগরে যাদের বাড়িতে উঠেছিল, সম্পর্কে কিরণময়ীর দূরসম্পর্কের দাদা। কথা ছিল, যত দিন না ভাড়ার জন্য ভালো জায়গায় বাস করার মতো একটা বাসা পাওয়া যায়, তত দিন ওই আত্মীয়ের বাড়িতে পুরো পরিবারই থাকবে। এর মধ্যেই সুধাময় ডাক্তারি শুরু করবেন, সুরঞ্জন চাকরি খুঁজে নেবে, মায়া আপাতত টিউশনি করবে, পরে ভালো কোনও চাকরি। আশ্রয় দিল বটে দূরসম্পর্কের দাদা কিন্তু সেই দেওয়ায় ভ্রুকুঞ্চন ছিল। সারাক্ষণ উঠতে-বসতে শোনাতে লাগলো নিজেদের প্রচণ্ড অভাবের গল্প। উঠোনে দশ বাই দশ ফুটের একটি ঘর জুটলো সবার জন্য। রান্না আলাদা, উঠোনে খড়ির চুলোয়। শংকর ঘোষের রান্নাঘরে মাছ মাংস রান্না হয়, আর আশ্রিত পরিবারটির জন্য জোটে রুটি-ডাল আর আলুর তরকারি। সুধাময় যে আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য দেশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেটি, সেই বাড়িটিতে ঢুকে টুকরো টুকরো হয়ে প্রতিদিন ভাঙতে লাগলো। ভাঙলেও তিনি ভেঙে পড়তে চাইতেন না। শংকর ঘোষের একচিলতে বারান্দায় ছোট একটি টেবিল আর একটি মোড়া পেতে রোগী দেখা শুরু করলেন, বাংলাদেশ থেকে এসে চেম্বার খুলে বসেছেন, কেউ ঠিক বিশ্বাস করতো না সুধাময় কোনও ভালো ডাক্তার, অথবা আদৌ কোনও ডাক্তার। এ দেশি ওষুধের নাম তো সুধাময়ের জানা নেই। ওষুধের নাম না লিখে বরং ওষুধের গোত্রের কোনও একটা ওষুধ দিতেন। রোগীরা গোত্র বুঝতে চাইতো না। ডাক্তার হয়ে ওষুধের নাম কেন জানে না, এ ছিল তাদের ভ্যালিড কোয়েশ্চেন। কটা আর রোগী আসতো তার কাছে। সারা দিন বসে থেকে পাঁচ-ছটা রোগী, পাঁচ-ছ টাকা দিত ডাক্তারের ফি। আত্মীয়ের হাতে দিয়ে দিতে হয়, যা জোটে। থাকা-খাওয়ার খরচ।

সুধাময়ের হাতে কোনও টাকা নেই। দেশ ছেড়ে আসার সময় পথে আবার টাকা-পয়সা থাকলে কে না লুট করে নিয়ে যায়, সেই ভয়ে হাতে সামান্য কিছু নিয়েছিলেন পথের খরচ। আলাদা একটা বাসা ভাড়া নেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে আছেন তিনি কিন্তু নতুন নগরে ডাক্তারির উপার্জনে ছোট কোনও বাসাও যে ভাড়া নেওয়ার জন্য তাঁর জুটবে না, টের পেতেন।

হাতে টাকা ছিল না বলে ডাক্তারির ওপরই তাঁকে নির্ভর হতে হতো। কিন্তু টাকা কেন সুধাময়ের হাতে ছিল না? দেশ ছাড়ার আগে চার লাখ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙিয়ে তার কী লাভ হলো! অত টাকা সঙ্গে করে নেওয়া যাবে না। ব্যাংকের মাধ্যমেও সম্ভব নয়। লোকে বুদ্ধি দিল, হুন্ডি করো। হুন্ডি কারা করে, কী করে করে সুধাময়ের জানা ছিল না। শংকর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোষের সঙ্গে কলকাতা যাওয়া নিয়ে ফোনে কথা হচ্ছে। সে-ই উপদেশ দিল, নারায়ণগঞ্জের গৌতম সাহা কলকাতায় আসছে-যাচ্ছে, কাপড়-চোপড়ের ব্যবসা আছে কলকাতায়, তাকে চার লাখ টাকা দিয়ে দিলে কলকাতায় সুধাময়রা পৌনে চার লাখ টাকার মতো পেয়ে যাবেন। নারায়ণগঞ্জের সেই ব্যবসায়ীর খোঁজ করে তাকে নিজের হাতে চার লাখ টাকা দিয়েছিলেন তিনি, শংকর ঘোষের প্রতিশ্রুতির ওপর ভরসা করে সুধাময় জমানো টাকাগুলো দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু শংকর ঘোষ তার কথা রাখেনি। কলকাতায় এসে হুন্ডির টাকা ফেরত চাইলে বললো টাকা তো আর সে দেবে না, দেবে প্রতাপ মণ্ডল, তার ব্যবসা আছে বাংলাদেশে, কিন্তু সে এখন ভোপালে, ভোপাল থেকে ফিরবে শিগগিরই। সেই শিগগিরের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে শ্বাসকষ্ট হতে থাকে সুধাময়ের। কিরণময়ী তার মামাতো ভাইয়ের ভায়রা ভাইয়ের ভাই শংকর ঘোষের কাছে টাকার কথা পাড়ে। টাকাগুলো হাতে পেলে নিজেরাই তারা একটা বাসা ভাড়া করে উঠে যেতে পারে, এখানে থেকে নিজের এবং অন্যের অসুবিধের কারণ হতে হয় না। নরম সুরে, বিরক্ত স্বরে নানা সুরে-স্বরে বলে দেখেছে, শংকর ঘোষ আজ ভোপাল দেখায়, কাল বোম্বে দেখায়। প্রতিশ্রুতি অচিরেই সুধাময় বোঝে যে মিথ্যে ছিল। এই বিদেশবিভুঁইয়ে কী করতে পারে সে এর বিরুদ্ধে। সুধাময়ের সেই লতায়পাতায় মানিকগঞ্জের আত্মীয় ননীগোপাল দমদমে থাকে। তার কাছেও হাত পেতেছেন সুধাময়, ধার চেয়েছেন, না টাকা জোটেনি।

পাগলের মতো একটা চাকরি খুঁজছে তখন সুরঞ্জন। চিনা মাটির ফ্যাক্টরিতে খোঁজে। টেক্সম্যাকোতে খোঁজে। বেলঘরিয়া স্কুলগুলোয় মাস্টারির চাকরি খোঁজে। পায় না। এমন অসহায় সে কখনও কোনও দিন বোধ করেনি। গলা পর্যন্ত বাংলা মদ গিলে এসে সে এক রাতে শংকর ঘোষের কলার টেনে উঠিয়ে চোয়ালে কষে ঘুসি মেরে বলেছে— টাকা ঠিক ঠিক মতো দিয়ে দে হারামজাদা, নইলে তোকে আমি খুন করবো আজকে! খুন করা সুরঞ্জনের হয়ে ওঠেনি। কাউকেই খুন করা সুরঞ্জনের হয়ে ওঠে না। হাত যে তার নিশপিশ করে না, তা নয়।

যখন জীবন অসহ্য রকম দুঃসহ, তখন হই হই করে 'লজ্জা' বিক্রি হচ্ছে। সুরঞ্জন বলা বন্ধ করে দিলেও সুধাময় লোক ডেকে ডেকে বলতেন, 'লজ্জা'য় তো আমাদের পরিবারের কথা লেখা হয়েছে। কেউ কপালে উঠাতো চোখ। কেউ তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে অভিসন্ধি খুঁজতো, কেউ হাসতো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ বিশ্বাস করতো, আহা-উহু করতো। বিশ্বাস করার লোক বরাবরই খুব কম ছিল। যারা বিশ্বাস করতো, তাদের দিয়ে খুব একটা কিছু লাভ হয়নি কারও। বেলঘরিয়ার লোকেরা এসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতো সুধাময়ের দিকে। সুধাময় ডানে ফিরলে তারাও ডানে ফেরে, বামে ফিরলে তারাও বামে। যেন তিনি একটি দ্বিপদী জীব এসেছেন চিড়িয়াখানায়। চিড়িয়াখানায় আসা নতুন কোনও জন্তুর দিকে লোকে যেমন দেখে, ঠিক তেমন করেই তাঁকে দেখে। এতে রোগী যে দু-একটা বাড়বে তা নয়, রোগী আরও কমে গেল।

ওই প্রথম দিকেই। 'লজ্জা' যখন লোকের হাতে হাতে! গোগ্রাসে পড়ছে। এরপর সুধাময় আর বলেননি কাউকে তিনি 'লজ্জা'র ডাঃ সুধাময়। বরং কেউ আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে এড়িয়ে যেতেন। না আমি নই, সে অন্য কোনও সুধাময় হবে— এ রকম বলতেন উদাসীন ভঙ্গিতে। এর চেয়ে ব্যতিক্রম যে কিছু ঘটেনি। কেউ কেউ যারা বিশ্বাস করেছিল তারা বাড়িতে মিষ্টি দিয়ে গেছে। কেউ বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছে। বেলঘরিয়ায় ওপারের লোক প্রচুর। স্মৃতিকাতর লোকে গিজগিজ করছে। এখনও বাড়িতে বাড়িতে লোকে ওপারের ভাষায় কথা কয়।

সুধাময়ের কাছে একটিই লজ্জা ছিল। সুরঞ্জন বেশ কয়েকটি 'লজ্জা' নিয়ে এসেছিল বাড়িতে, একটি তিনি নিজের কাছে রেখেছিলেন। বালিশের তলায় থাকতো বইটি। অবসরে তিনি পড়তেন। যে বইটি বাংলাদেশ থেকে বেরিয়েছে, সেটির জালে ছেয়ে গেছে কলকাতা, পাতলা ফিনফিনে বই। খারাপ কাগজ, খারাপ ছাপা। মানুষ যেখান থেকে পারুক বইটি কিনছে। কোনও দিন যে বই পড়ে না, সেও পড়ছে। সে যে কী উন্মাদনা!

এসব নিজের চোখে দেখা সুধাময়ের। তিনি পাড়ায় বেরিয়ে দেখতেন, লোকের মুখে শুনতেন, খবরের কাগজে পড়তেন। একবার জাল বই ব্যবসায়ীদের কিছু লোককে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। কাগজে এ খবর পড়ে সুধাময়ের সন্দেহ হতো, সুরঞ্জন না জানি আবার এসবে নিজেকে জড়িয়েছে। তিনি বলেছেন বেশ কয়েকবার— দেখ, তুই সাবধানে থাকিস। কাদের সঙ্গে মেলামেশা করছিস কে জানে! নতুন দেশ। অত চেনাজানা লোক নেই। বন্ধু নেই। বিপদ আবার যেন না বাঁধে। আর 'লজ্জা' বইটা নিয়ে লোকে যা খুশি তাই করুক, তুই ঝামেলা থেকে দূরে থাকিস।

সুরঞ্জন কোনও কথা বলে না এসব শুনে। সুধাময়ের কষ্টক্লিষ্ট উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করতো না তার। যত দিন না নিজেদের মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই পাচ্ছে, তত দিন তার শান্তি ছিল না। রাতে তার বাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরতে ইচ্ছে করতো না। মাটিতে মাদুর পেতে কয়েকশ মশার কামড় খেতে খেতে ঘুমোতে হতো। তার চেয়ে রাস্তায় শুয়ে থাকা ভালো। সুরঞ্জন একটি শহর পছন্দ করেছে, যেখানে তার কোনও বন্ধু নেই। আত্মীয় বলতে, স্বজন বলতে কেউ নেই। শুধু চারদিকে গিজগিজ করছে হিন্দু-নারী-পুরুষ-শিশু। যাদের সুরঞ্জন সবচেয়ে আপন ভেবে দেশান্তরী হয়েছে। তাকে সাহায্য করার একটি প্রাণীও কোথাও ছিল না। শংকর ঘোষের অশ্লীল ব্যবহার, আধ পেট খাওয়া, বাড়িতে প্রায় চাকরানির মতো কিরণময়ীকে খাটানো, চার লাখ টাকা হারিয়ে যাওয়া, দেশের যা কিছু ফেলে এসেছিল, সেগুলো বিক্রি করে টাকা পাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়া সুরঞ্জনকে অনেকবার ঠেলেছে আত্মহত্যার দিকে। শেষ অবধি আত্মহত্যা তার করা হয়নি। 'লজ্জা' বেরিয়েছে অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেল। এখনও সুরঞ্জন বইটা মাঝে মাঝে উল্টেপাল্টে দেখে। এই বইয়ের সঙ্গে তার একটা অদ্ভুত সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। মাঝে মাঝে 'লজ্জা'র সুরঞ্জনের কথা সে পড়ে। যেন সেই সুরঞ্জন অন্য সুরঞ্জন। এই সুরঞ্জনের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। সেই সুরঞ্জনের দিকে এই সুরঞ্জন খানিকটা দূর থেকে তাকায়। নিজের দিকে সে খানিকটা দূর থেকে তাকায়। 'লজ্জা'র যারা জাল করেছে তাদের সঙ্গে, সত্যি বলতে কী, সুধাময়ের সন্দেহ হোক, সে জড়িত নয়। তবে দিনের পর দিন ভুগতে ভুগতে, অপমানে-অসহায়ত্বে, অনাহারে-অনিদ্রায় সুরঞ্জন গেছে বিজেপিতে যোগ দিতে। যে লোকেরা লজ্জার সুরঞ্জন বলে তাকে মঞ্চে তুলেছে, সম্বর্ধনা দিয়েছে, ফুল দিয়েছে হাতে, মুখে মিষ্টি দিয়েছে, সুরঞ্জনের সঙ্গে তাদের কোনও বিরোধ নেই। সুরঞ্জন বলেছে সে সুরঞ্জন দত্ত, 'লজ্জা' তাকে নিয়েই লেখা। ওরা কেউ তাকে অবিশ্বাস করেননি। ওদের ব্যবহারে, ওদের আদর্শে, বিশ্বাসে সে আস্থা রেখেছে। একটি চাকরি পাইয়ে দেবার আশ্বাস ওরাই দেয়। রেশন কার্ডের ব্যবস্থা ওরাই করে।

পার্টি অফিসে দিনের পর দিন সে বসে থেকেছে, শুনেছে 'লজ্জা'র জাল বই বের করে বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সস্তায় ছাপিয়ে দশ-পাঁচ টাকা শহরের সর্বত্র বিক্রি করার ব্যবস্থা করছে কারা যেন। যারা করছে তাদের হদিস বহু চেষ্টা করেও সুরঞ্জন পায়নি। নিজে সে যদি জড়িত থাকতে পারতো এই বই বিক্রির ব্যবসায়, মোটা অংকের টাকা তার পকেটে আসতে পারতো। কিন্তু জড়াবে ইচ্ছে করলেও শেষ পর্যন্ত অসততার সঙ্গে নিজেকে জড়াতে ভালো তার লাগেনি। আপাতত এইটুকু অন্তত সে বুঝেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এক বিজেপিই বাংলাদেশে হিন্দুদের দুর্ভোগ নিয়ে জোর গলায় কথা বলছে, তার প্রতিবাদ করছে। এই দলটি তার সবচেয়ে বড় আশ্রয় হয়। তার অসহ্য মানসিক যন্ত্রণাকে প্রশমিত করতে এই দলের লোকেরাই এগিয়ে আসে। শংকর ঘোষের বাড়িটি তার কাছে কোনও আশ্রয় নয়। আশ্রয় এইখানে। রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ আর বিজেপির কর্মীদের আলিঙ্গনে। কিন্তু দলের সদস্য থেকে সুরঞ্জন একদিন হুট করে নাম কাটিয়ে নেয়, যেদিন সে ধার চেয়েছিল অন্তত পাঁচ হাজার টাকা। যে কোনও একটা বাসা তাকে ভাড়া নিতে হবে, অগ্রিম টাকা দিতে হয় বাড়িঅলাকে। তারপর নতুন বাসায় উঠে সস্তায় হলেও কিছু আসবাব তো কিনতে হবে। সুরঞ্জনের হঠাৎ এসে কেঁদে পড়া, আর যে ছেলের কোনও চাকরি-বাকরি নেই, সে কী করে টাকাটা শোধ দেবে, তাও কেউ জানতো না, তাই নেই, টানাটানি যাচ্ছে, আমি তো পারছি না, ইত্যাদি বলে লোকেরা এড়িয়ে গেছে।

সুরঞ্জন সেই পুরনো দিনগুলোর কথা ভাবছে এবং ভাবতে পারছে না এ কথাগুলো সে বলবে 'লজ্জা'র লেখিকাকে! লেখিকা হয়তো এসবই জানতে চেয়েছেন, কী করেছে সুরঞ্জন কলকাতায় আসাতক, কী করছে এখন? লেখিকা তো 'লজ্জা'র মতো কোনও বই তাকে নিয়ে লিখবেন না, এটা জানার পরও এক আশ্চর্য তাড়না সে অনুভব করে তার সঙ্গে দেখা করার। ছটফট করে সে একা ঘরে। তাঁকে কি ফোন নম্বর দিয়েছিলেন লেখিকা। মনে নেই। ফোন নম্বরটি কি সে নিয়ে এসেছে, নাকি নেয়নি? শার্টের পকেটে দেখলো... নেই। প্যান্টের পকেটেও নেই। বোধহয় নেয়নি। না নিয়ে একদিকে সে ভালোই করেছে। আবার যাবে। যেন খুব পুরনো কোনও বন্ধু, যার সঙ্গে খুব হৃদ্যতা ছিল, যত বন্ধু আছে তাদের সবার থেকে বেশি হৃদ্যতা, দীর্ঘ বছর পর তার সঙ্গে দেখা হবে। কেন এমন মনে হয়! যার সঙ্গে জীবনে প্রথম দেখা হলো, যে তার আত্মীয় নয়, বন্ধু নয়, শুধু ওই একটি বইয়ের কারণে এত কাছের মানুষ মনে হতে পারে। ও তো যে কোনও হিন্দু পরিবারেরই গল্পই হতে পারতো। সুরঞ্জনের গল্প তো আলাদা কোনও ঘটনা নয়। সুরঞ্জন শুধু কি ছাপার অক্ষরের কেউ? রক্তমাংসের মানুষ নয়? বইয়ের কালো কালো অক্ষর থেকে সে বেরিয়ে আসতে চায়। সে তার জীবনটা খুলে লেখিকার সামনে ধরতে চায় । বলতে চায় আমাকে তো পুরে দিয়েছো দুই মলাটের মধ্যে, দেখতে চেয়েছো কোনও দিন। তোমার ওই বইয়ের সুরঞ্জনকে আমার রোবট বলে মনে হয়। তার কষ্টের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা, যন্ত্রণার কথা, পারভিনের জন্য তার ভালোবাসার কথা, তাকে না পেয়ে যে হাহাকার তার ছিল, তার কিছুই, সামান্য কিছুই তুমি তুলে ধরতে পারোনি মাদাম লেখিকা। তথ্য দিয়ে ভরাট করেছো বই। আর সুরঞ্জনের গল্প লেখার নাম করে ফাঁকি দিয়েছো মস্ত। হৃদয়হীনের মতো লিখে গেছো। যেন একটা শুকনো প্রবন্ধ। আর সব তো টুকেছো, কোথায় কী ঘটেছে হিন্দুদের ওপর। কার বাড়ি পুড়েছে, কাকে কে ধরে নিয়ে গেছে, কাকে হুমকি দিয়েছে। কাজল দেবনাথ তোমাকে তো বই সাপ্লাই দিয়েছে, জানি জানি সব। সুরঞ্জন উত্তেজনায় উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। তুমি তো আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিয়ে কিছুই দেখনি।

আবার ভাবে সে, হোক না বইয়ের সুরঞ্জন প্রাণহীন। লেখিকা নাহয় ব্যর্থ হয়েছে তার নায়কের ভেতরের অনুভূতি প্রকাশ করতে। তাতে সুরঞ্জনের কী যায়-আসে? জগতের কটা লোক জানে জাননগরের পলেস্তারা খসা পুরনো এক ভাঙা বাড়ির একতলার অন্ধকারে একা ঘরে বসে থাকা প্রায় বেকার ছেলেটি সুরঞ্জন দত্ত? নিজেকে ছেলে বলতে এখন বাধে তার। বয়স অনেক হলো। লজ্জার সেই সুরঞ্জন যে ওই বয়সে পড়ে নেই, সেটি কি লেখিকা জানে! কিন্তু জেনেই বা কী! কী করবে সে সুরঞ্জনের বয়স দিয়ে? তার বয়স, তার নাম-ঠিকানা, তার জীবনবৃত্তান্ত কারও জানা হলে কী লাভ? কে সে! জগতে সে কেউ না। তুচ্ছ তৃণেরও দাম তার চেয়ে বেশি। এ শহরে তার কোনও বন্ধু নেই। এটাই সবচেয়ে বড় সত্য। সুরঞ্জন প্রলাপের মতো ঘরময় পায়চারি করতে করতে বলে— সুরঞ্জন কেমন আছো? কেমন ছিলে? নানা রকম ছিলাম, তবে সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হলো, কী করে যেন বেঁচে আছি! আর..। আর কী? আর, খুব একা বোধ করি। কেন? আমার কোনও বন্ধু নেই। দেশে কি তোমার অনেক বন্ধু ছিল? ছিল। যোগাযোগ হয় না ওদের সঙ্গে? না। কারও সঙ্গেই হয় না। ওদেশে যাচ্ছ না কেন? যাও, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে। চাই না যেতে। কেন? জানি না। জানে না এমন কিছু আছে নাকি কারও। নিশ্চয়ই জানো তুমি। আমার লজ্জা হয়। কী হয়? লজ্জা।

অনেক রাত অবধি সুরঞ্জনের ঘুম হয় না। সিগারেট ছেড়ে দিয়েছিল। আজ সে নতুন একটি প্যাকেট কিনেছে। একটি একটি করে পুরো প্যাকেটের সিগারেটই সে খেয়ে শেষ করে। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকলে হিবিজিবি স্যাঁতার দাগগুলো কোনটা মানুষের মুখের মতো, কোনটা একটা ঘরের মতো, কোনটা অশ্বত্থ গাছের মতো দেখতে। এই ছবিগুলোও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার কদিন পর পর বদলে যায়, অন্য কিছুর মতো দেখতে লাগে। মাথার পেছনে দুটো বালিশ দিয়ে ভাঁজ করা পায়ের ওপর আরেক পা তুলে শুয়ে শুয়ে দেয়ালের দিকে, শুধু দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে আর সিগারেট খেয়ে প্যাকেট ফুরিয়ে যখন সে ঘুমোতে যায়, রাত তখন চারটে। কিছু কিছু রাত থাকে কিছু না-করার রাত। কিছু করতে না ইচ্ছে করার রাত। বারবার করে দীর্ঘশ্বাস ফেলার রাত। কিছু রাত আছে, যেসব রাতের কথা কাউকে বলে বোঝানো যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— কে এসেছে?

— সুরঞ্জন দত্ত।

সুজাতা বললো।

— সুরঞ্জন দত্ত?

— হ্যাঁ, তাই তো বললো। আর আগেও তো একদিন এসেছিল।

বলি দরজা খুলে ড্রইংরুমে বসাতে। এ রকম হুট করে না বলে-কয়ে কেউ আসে না আমার বাড়িতে। এসব সেই ছোটবেলায় ঘটতো। যে কেউ যে কারও বাড়ি চলে যেত হঠাৎ। দরজার কড়া নাড়তো। দরজা খুলে দেওয়া হতো ভেতর থেকে। সাদরে ভেতরে ডাকা হতো অনাহূত অতিথিদের। চা বিস্কুট সেমাই পায়েস এসব দেওয়া হত খেতে। বড় হওয়ার পর এমন দেখিনি। বিশেষ করে বারো বছর ইউরোপে-আমেরিকায় বসবাসের সময়। কলকাতায় বাস করছি। না। কলতাকাতেও এমন ঘটনা দেখিনি। না বলে কেউ কারও বাড়িতে আসে না। সুরঞ্জন কি এখনও দেশের স্বভাবটাই রেখে দিয়েছে নাকি? ভাবি। মোটে তো কথাই বলে না। কেমন আছে? কী করছে? কথা কি আজও আমারও বলে যেতে হবে? নাকি কথাহীন নৈঃশব্দ্যকে সামনে নিয়ে অস্বস্তিকর বসে থাকাই হবে?

কম্পিউটারে লিখছিলাম। কম্পিউটারেই লিখি আজ ষোলো বছর। লেখা ফেলে ড্রইংরুমে ঢুকে দেখি সুরঞ্জন। সেদিনের চেয়ে আজ তাজা লাগছে। নীল একটা ফুলফুল শার্ট পরেছে। এ রকম শার্টেও যে কাউকে ভালো দেখাতে পারে, আগে বোধহয় এতটা জানা ছিল না। কালো একটা কর্ডের প্যান্ট। জুতোটাও আগের দিনের মতো নয়। খোঁচা দাড়ির চিহ্ন নেই। নীলাভ গাল। চোখ নত নয়। খোলা। মুখে স্মিত হাসি। হাতের আঙুলে আগের দিনও সুরঞ্জনের পাথর বসানো আংটি দেখিনি। কব্জিতে লাল সুঁতো দেখিনি। আজও নেই। একটু অবাকই হই। এই কলকাতায় শিক্ষিত হোক, অশিক্ষিত হোক, ধনী-দরিদ্র, শিল্পী-মহাশিল্পী, রাজনীতিবিদ-সাহিত্যিক, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, বৈমানিক সবারই হাতে লাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

সুঁতো দেখি। কারও খালি কব্জি দেখলে একটু অবাক হই। ব্যাপার কী, এ লোক কি ধর্মে বিশ্বাস করে না? খবর নিয়ে দেখি, করে। তবে শিগগিরই কোনও পুজো সারেনি। সুরঞ্জনের কব্জিতে সুঁতো আশা করার কারণ তো ওই একটিই। ধীরে ধীরে সুরঞ্জনের সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠা, নাস্তিকের ধর্ম বিশ্বাসী হওয়া। 'লজ্জা'র লজ্জা তো ওইখানেই ছিল সবচেয়ে বেশি। নাগরিকদের নিরাপত্তা না দিয়ে অসাম্প্রদায়িক আদর্শবাদী একটা প্রজন্মকেই নষ্ট করে দিয়েছিল রাষ্ট্রের উদাসীনতা। সুরঞ্জন একসময়ের সাম্যবাদে বিশ্বাসী কমিউনিস্ট পার্টি করা ছেলে কিনা ভীষণ রকম হিন্দু হয়ে উঠলো। মুসলমানদের সব এক কাতারে ফেলে বললো, ওরা কাউকে ক্ষমা করেনি। তসলিমাকে করেছিল? নাকি তসলিমা ইসলাম ত্যাগ করেছিল বলে সুরঞ্জনের ক্ষমা পেয়েছিল! লাল সুঁতোহীন দুটো হাতের দিকে তাকিয়ে বললাম— বসো। তারপর কী খবর বলো। এদিকে এসেছিলে কোথাও?

সুরঞ্জন সোজা আমার চোখে তাকিয়ে বলে— না। আপনার কাছেই এসেছি।

— ও।

— আমার ফোন নম্বরটা বোধহয় তোমার নেই। তাই না?

সুরঞ্জন আমার ফোন নম্বরটি নেওয়ার কোনও আগ্রহ দেখায় না। তবু আমি একটি কাগজে নম্বর লিখে বাড়িয়ে দিই। অগত্যা সে কাগজের টুকরোটি হাতে নেয়। নেয় বটে, নম্বরের দিকে একবারও না তাকিয়েই বুক পকেটে ঢুকিয়ে দেয়। এসেছে, নিশ্চয়ই কিছু বলতে এসেছে।

— বলো কী খবর। ভালো আছো?

মাথা নাড়ে সে। একবারও জিজ্ঞেস করে না আমি ভালো আছি কিনা। এ শহরের আরও অনেককে দেখেছি, ভালো আছো বা আছেন কিনা জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিয়ে বসে থাকে। পাল্টা জিজ্ঞেস করে না তুমি বা আপনি কেমন আছো বা আছেন। ধন্যবাদ দেওয়ার অভ্যেসও নেই। এই যে আমি ফোন নম্বরটা দিলাম, একটি ধন্যবাদ তো প্রাপ্য ছিল। অবশ্য বাঙালিরা মনে করে ধন্যবাদ জানালে খাটো করা হয়। সে কারণেই হয়তো খাটো করেনি আমাকে।

মাথা নাড়ার পর আর কোনও কথা নেই। এখন সোফায় মুখোমুখি বসে থাকতে হবে। না, এ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কথা বলো, নয় চলে যাও। এ রকম রাগ আমার অবয়বে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— আচ্ছা, তুমি কি এ রকমই কম কথা বলো, সুরঞ্জন! নাকি আমার সঙ্গেই বলো! আগে তো এত চুপচাপ ছিলে না। খুব পাল্টে গেছ কি?

সুরঞ্জন হাসে। এই হাসিটি কোনও সরল হাসি নয়। হাসিটির অনুবাদ করা খুব সহজ বলে আমার মনে হয় না। একে নিয়ে ঠিক কী করবো, বুঝতে পারি না।

— তুমি কি কিছু বলবে আমাকে? জিজ্ঞেস করি।

সুরঞ্জন মাথা নত করে। মাথা নত করা লোকদের নিয়ে আমি খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। সম্ভবত কিছু বলতে চায় সে। আমার ইচ্ছেটির কথা বলি, যে, একদিন তার মার সঙ্গে আর মায়ার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

এবার চোখ তুলে তাকায়। ঘাড় নাড়ে। হ্যাঁ, সে রাজি।

— আজ চলো, আমার সঙ্গে খাবে। সময় আছে তো? কাজ নেই তো?

আমার দিক থেকে প্রস্তাব। সুরঞ্জন লুফে নেয়।

ওকে নিয়ে দুপুরে মার্কো পোলোয় যাই। বুফে খাবার। খেতে খেতে সুরঞ্জন বলে সে ছিয়ানব্বই সালে বিয়ে করেছিল সুদেষ্ণা নামের এক মেয়েকে। দুজনই দমদমের এক বেসরকারি কলেজে পড়াতো। ইতিহাস পড়াতো সুরঞ্জন।

— তারপর?

— তারপর আর কী! ডিভোর্স হয়ে গেছে।

— কেন?

শীতল উত্তরের শীতল প্রশ্ন।

এর সরাসরি উত্তর নেই। উঠে গিয়ে আরও খাবার নিয়ে আসে সুরঞ্জন। মনে হয় অনেক দিন পর সে ভালো খাবার পাচ্ছে। বেশ খুশি মনে খাচ্ছে। কাঁকড়া নিল কয়েক টুকরো। এগুলো কেটে খাবার জন্য ওয়ালা যন্ত্র দিয়ে গেল ওয়েটার। যন্ত্রটা ব্যবহার করলো সে। ব্যবহার করতে করতেই বললো, ফোর নাইনটি এইট, জানেন তো বধূ নির্যাতন মামলায় ফাঁসিয়েছিল আমাকে, বিয়ের দু বছর পর।

আমি তীক্ষ্ণ চোখে সুরঞ্জনকে দেখি। এ তার স্ত্রীকে নির্যাতন করতো! আর একে আমি নেমন্তন্ন করে খাওয়াচ্ছি! একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে ভেতর থেকে। আমার কোনদিন বোধহয় শিক্ষা হবে না। ভুল মানুষদেরই আমি খাতির করে যাবো জীবনভর! বাংলাদেশে অনেকে তো অত্যাচারিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক লোকদের অত্যাচারের মুখে পড়লে সাম্প্রদায়িক হয়ে যেতে পারি। ভেবে দেখি কিছু না। একটা অতীত ছিল তার। যে অতীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে হিন্দু-মুসলমানে কোনও ভেদ করেনি। সে মানুষ হিসেবেই সবাইকে বিচার করতো। ধর্ম মানতো না। ধর্মীয় রীতিনীতির নিন্দা করতো। কিন্তু সুরঞ্জনের ওই মনটা তো অতীত। আসলে সত্যিকার মানববাদী নাস্তিক হয়ে দুম করে কেউ হিন্দু হয়ে যেতে পারে না। সন্দেহ হয়, আদৌ ভেতরে ভেতরে সুরঞ্জন শক্তপোক্ত কোনও নাস্তিক ছিল কিনা। ছিল না, থাকলে এমন হয় না। তাহলে কী আছে আর কারণ, যে কারণে সুরঞ্জনের প্রতি সহানুভূতি আমার! খাবার আমি দ্রুত খেতে থাকি। শেষ করেই উঠবো, ঘড়িও দেখে নিই ফাঁকে। নিজের আদর্শের সঙ্গে মেলে তো না-ই, তার ওপর নারী নির্যাতনকারী একজনের সঙ্গে সময় নষ্ট করার সময় আমার থাকা উচিত নয়। কেবল তার জীবনের গল্প নিয়ে উপন্যাস লিখেছিলাম বলে যে তার সব দুষ্কর্ম আমাকে মেনে নিতে হবে, তা তো নয়।

সুরঞ্জন ক্ষীণ কণ্ঠে বলে— আমি সুদেষ্ণাকে মেরেছিলাম।

আমি প্রায় চেঁচিয়ে বলি— চমৎকার! চমৎকার কাজ করেছো!

মেরেছো। ওই মেয়েটাকে ধরে এনে ধর্ষণ করেছিলে যে রাতে, সেদিনও ওকে মেরেছিলে। মারোনি? শরীরে বেশ শক্তি তো তোমার! মেয়েদের ওপর তাই ক্ষমতা দেখাতে হয়। নিজের মাকেও বোধহয় মারো নাকি মা বলে তাকে রেহাই দাও?

— মদ খেয়েছিলাম সেদিন। সুরঞ্জনের শান্ত গলা।

— যেদিন ঢাকার ওই মেয়েটাকে মেরেছিলে?

— না। যেদিন সুদেষ্ণাকে।

— মদের দোষ দিচ্ছ?

সুরঞ্জন চুপ করে থাকে। আমি দাঁতে দাঁত চেপে বলি— মদের দোষ দিও না। দোষ তোমার। মদ আরও অনেকে খায়, কাউকে মারে না। জেল খাটতে হয়নি?

— জেলে ছিলাম অনেকদিন। পরে ডিভোর্স হয়ে গেছে। চাকরিটাও গেছে।

— বেশ।

আমি বেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম।— ঠিক শাস্তিই তবে হয়েছে তোমার। সুদেষ্ণা চাকরি করছে তো ওই কলেজে?

সুরঞ্জন মাথা নাড়ে। হ্যাঁ করছে।

আমার সত্যি বলতে কী, ভালো লাগে। সে আমার উপন্যাসের নায়ক হোক, তাকে আমি দীর্ঘকাল চিনি বা জানি, যাই হোক না কেন, একটি মেয়ের সঙ্গে অন্যায় করার শাস্তি যে সে পেয়েছে, সে কারণেই ভালো লাগে আমার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— কেন মেরেছিলে? জিজ্ঞেস করি। এবার একটু উত্তেজিত স্বরে। সুরঞ্জন ঠাণ্ডা গলায় বললো— মায়াকে সে সহ্য করতে পারতো না।

— কেন?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে— মায়ার কেন বিয়ে হয় না। কেন সে বাড়ি ছেড়ে যায় না। এসব নিয়ে! বুড়ো হোক, বদমাশ হোক, যে কোনও কারো সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল সে। আমি ছিলাম না।

— তারপর?

— সুদেষ্ণার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হলো। মায়ারও পরে যে-কারও সঙ্গেই অবশ্য বিয়ে হলো।

সুরঞ্জন চোখ রাখে আমার চোখে। চোখ দুটোয় বিষণ্নতা।

বললাম— মিষ্টি আছে ওখানে। যাও নিয়ে এসো। আইসক্রিম ভালোবাসো না?

সুরঞ্জন বলে দেয়, সে খাবে না।

বিল মিটিয়ে ভেবেছিলাম ওকে রেস্তোরাঁ থেকেই বিদেয় দেব। কিন্তু গাড়ির কাছে গিয়ে বলি— আমি তো বাড়ি যাবো। তুমি কী করবে?

— অসুবিধে হবে কি আমি যদি আপনার সঙ্গে যাই?

— না না। অসুবিধে কী!

সুরঞ্জন এল সঙ্গে। খাবার পর কোনও দিন আমার অভ্যেসের মধ্যে নেই সিয়েস্তার। তাই বাঁচোয়া। কিন্তু ও কি একটু বিশ্রাম নিতে চাইছে। জিজ্ঞেস করলে না না করে ওঠে। কিন্তু কোনও কথা কি আছে ওর? আছে নিশ্চয়ই। তা না হলে সঙ্গে এল কেন! কোনকালে লিখেছিলাম ওকে নিয়ে গল্প, ওর পারিবারিক সামাজিক দুর্দশায় গল্প। তার কি খেসারত এখন দিতে হবে? এসেছে। ভালো একটা রেস্তোরাঁয় খাওয়ালাম। এখন তো ও বাড়ি চলে গেলেই পারতো। আমি তো নিজের সময় নষ্ট করে ওর পেট থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কোনও গল্প বার করতে আর চাই না। আমার যথেষ্ট গল্প আছে লেখার। এখানে ওরা নিশ্চয়ই ভালো অথবা মন্দ আছে, যে কোনও মানুষের মতোই। ওদের নিয়ে গল্প লেখার তো কারণ নেই আমার। সুরঞ্জনের বুদ্ধি যে একেবারে নেই এ বিষয়ে, তা তো নয়। ওর বোঝা উচিত যে আমার উপন্যাসের নায়ক বলেই ওর অধিকার নেই যে কোনও সময় আমার বাড়িতে উপস্থিত হওয়ার। তার পরও দেশের লোক বলে আমি খাতির করে যাচ্ছি, অথবা সত্যি কথা বলতে কী, সুরঞ্জন বলেই খাতিরটা করছি। কিন্তু তার যদি ব্যক্তিত্ব-মনুষ্যত্ব কিছুই না থাকে, তবে আর কদ্দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবো? বারান্দার রকিং চেয়ারে বসে এ রকম ভাবছিলাম আর উদাস তাকিয়েছিলাম আকাশের দিকে। বারান্দায় দরজা আমার খোলাই থাকে দিন-রাত্তির। ড্রইংরুমের সোফা থেকে উঠে সুরঞ্জন আমার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে বলে— আমি আপনাকে বিরক্ত করছি, আমি জানি। আপনার যদি বিশ্রাম নেওয়ার থাকে, বা কোনও কাজ করার থাকে আপনি নিশ্চিন্তে করুন।

— আর তুমি?

— আমি এখানে বসি। আমার জন্য একটুও ভাববেন না। আমাকে সঙ্গ দেবার, আতিথেয়তা করার কিন্তু একটুও দরকার নেই।

— তোমার কি কিছু বলার আছে? তুমি খামোখা বসে থাকবে কেন? কিছু বলার থাকলে বলো।

— না আমার কিছু বলার নেই।

— তাহলে?

— তাহলে বসে থাকবো কেন, তা তো জানতে চাইলেন?

আমি কোনও উত্তর দিই না। মাথা নাড়ি না।

সুরঞ্জন বলে আমার চোখের দিকে স্থির তাকিয়ে, বসে থাকতে চাইছি, কারণ আপনাকে আমার খুব আপন বলে মনে হয়।

তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে খুব আপন মনে হয়, তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না, এ ধরনের বাক্য শুধু মনের ওপর নয়, গায়ের ওপরও এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করে। কথাটা শোনার পর আমার গাটা কেমন শিথিল হয়ে আসে। যেন শক্তি ফুরিয়ে গেছে। ওই চেয়ার থেকে উঠতেও আমার খানিকটা সময় লাগে। মনটাও অস্থির হয়ে উঠেছে। কী জানি ঠিক জানি না, কেন ওই বাক্যটি আমাকে ভালো লাগা দিয়েছে। সম্ভবত এভাবে কেউ কখনও বলেনি বলে। আপন বলতে কটা মানুষই বা আমার আছে! যাদের আপন ভাবি, তারা তো আসলে কেউই আমাকে আপন ভাবে না। দূর বিদেশে এক বোন থাকে, অসুখ-বিসুখ হলে, মন খারাপ হলে আমার খোঁজ করে। তাছাড়া দেশভর্তি এত আত্মীয়স্বজন, এত বন্ধু, কেউ কোনও দিন এত কাছে থাকি, পাশের দেশে দেখতে আসে না। বেঁচে আছি কি মরে গেছি এই খবরটাও কেউ নেয় না। সুতরাং সুরঞ্জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও ওর এই বাক্যটি আমাকে অদ্ভুত এক আনন্দ দেয়। কেউ আমাকে আপন ভাবছে। কাউকে আপন ভাবার চল এই বস্তুবাদী আত্মমুখী সমাজে নেই বললেই চলে। এখানে লোকে অন্যের প্রতি যে কর্তব্য বা দায়িত্ব পালন করে, সেগুলোকেই আমরা ধরে নিই যে আপন মানুষের জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবেসে কিছু করা। সম্ভবত ভালোবেসে তার কিছুই করা হয় না। না করে উপায় নেই বলে করা।

সুরঞ্জনকে একটি ঘর দেখিয়ে দিই, শোবার ঘরটিই দিই, বিশ্রাম নিতে। সুজাতাকে বলে দিই, ওর চা টা কিছু দরকার হলে দিতে। নিচে স্টাডির বিছানায় একটি বই নিয়ে শুয়ে পড়ি। ইচ্ছে বইটা পড়বো। কিন্তু কয়েক পাতা পড়া হয়ে যাবার পর আমি বুঝতে পারি যে আমি আসলে পড়ে যাচ্ছি, প্রতিটি শব্দই আমি দেখে দেখে পড়ছি, কিন্তু এই পড়ার নাম সত্যিকার পড়া নয়। কারণ সবই আমার চোখের পড়া, মাথায় তিলতমও কিছু ঢোকেনি। মাথায় ঢোকেনি বলে আমি জানি না কী পড়লাম এতক্ষণ। কিন্তু কেন মাথায় ঢোকাচ্ছি না! মন কোথায়? মন সুরঞ্জনে। ছেলেটার ওপর আমার রাগ হয় খুব, কিন্তু এও ঠিক, ওকে খুব আপন মানুষ বলে আমার মনে হয়। একটা মানুষ যাকে আমি চিনি না, বেশি জানি না, সামান্য দেখা, অতি সামান্যই কথা, তাকে কেন আপন মনে হবে, এই রহস্যেরও আমি কোনও কিনারা করতে পারি না। কী সহজে নিজের শোবার ঘরে ঢুকিয়ে দিলাম প্রায় অচেনা একটি ছেলেকে! আমার বিশ্বাস, ও আমার কোনও ক্ষতি করবে না। যদি করে কিছু, সে অপকার নয়, উপকারই।

পাঁচটার দিকে এক ঢিলে দুটো পাখি মারতে অর্থাৎ সুরঞ্জনকে পৌঁছে দিতে এবং কিরণময়ীর সঙ্গে দেখা করতে যাই জাননগরের গলিতে। আমি তো কলকাতায় বেরোলে পাঁচজনের এক পুলিশ বাহিনী যায় সঙ্গে। আর কলকাতার বাইরে হলে, সামনে প্যাঁ পুঁ করে পোশাক পরা পুলিশ বাহিনী ছোটে। পেছনে সব সময়ই থাকে একটা এসকর্ট কার, এসকর্ট কারে চারজন, আর আমার গাড়িতে বসেন একজন পিএসও, ব্যক্তিগত দেহরক্ষী। তারা, পার্ক সার্কাসে যাবো শুনে আপত্তি করলেন। কেন? মুসলিম এলাকায় যাওয়া আমার জন্য নিরাপদ নয়। মৌলবাদীরা আমাকে যে কোনও মুহূর্তে কতল করতে পারে। আমি তাদের আপত্তি উড়িয়ে দিয়ে বললাম— ধুৎ!

কিচ্ছু হবে না।

— কিচ্ছু হবে না মানে? যে কোনও সময় কিছু একটা হয়ে যেতে পারে। পুলিশ অফিসার বললেন।

— যে কোনও জায়গাতেই তা হতে পারে। তার জন্য পার্ক সার্কাসের দরকার হয় না। আর কেউ ওখানে কি দাঁড়িয়ে আছে নাকি আমাকে মারার জন্য। আর যদি তাই হয়, আপনারা তো আছেন। আমার তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। একা তো যাচ্ছি না আমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলিশ চুপ হয়ে রইলো। আমি বললাম— আর তা ছাড়া, আমাকে যেতেই হবে।

হ্যাঁ, যেতেই হবে কিরণময়ীর বাড়ি। কলকাতায় এসে এমন গলিতে এর আগে যাইনি কখনও। গ্রেট মেডিকেল স্টোরস, হোটেল শান ও ফেরদৌস, ইন্ডিয়ান সাইকেল স্টেট, জগন্নাথ জুয়েলার্সের গলির মধ্যে গাড়ি যদি দাঁড়ায়, দ্বিতীয় কোনও গাড়ি কেন, কোনও রিকশাও পাশ কাটিয়ে যেতে পারবে না, এমন অপ্রশস্ত। বিবর্ণ ঘরদুয়োর। ঘরে অসচ্ছলতা থিকথিক করছে। রাস্তার কিনারে আবর্জনার স্তূপ। নর্দমা হাঁ করে আছে তার সব নোংরা মুখে নিয়ে। স্যাঁতসেঁতে গলিতে ঢুকে গা ছমছম করে আমার। ভুতুড়ে ভুতুড়ে চারদিক।

কিরণময়ী আমাকে দেখে ছুটে এসে আলিঙ্গন করলেন। অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে রাখলেন আর ক্রমাগতই বলতে লাগলেন— মা গো, তুমি কেমন আছো গো মা, মা গো তুমি ভালো আছো তো মা, মা গো তোমার কথা ভেবে কত কষ্টে থাকি মা। মা গো তুমি এত দিন পরে এলে মা। যখন তাঁকে আলতো করে ছাড়িয়ে নিলাম, দেখি চোখে জল তাঁর। আমার জন্য কারও চোখে জল? আমার মা'র ছাড়া আমি আর কাউকে দেখিনি। সারা গা আবারও শিথিল হতে থাকে। মন অস্থির। এ ঠিক এমন নয় যে ভালোবাসা পেয়ে আমার অভ্যেস নেই। প্রায় প্রতিদিনই কত মানুষ আমাকে উজাড় করে ভালোবাসা দিচ্ছে। লেখা পড়ে সাহস বা সততা দেখে তারা ভালোবাসে আমাকে। প্রতিদিনই গ্রহণ করেছি সে সব।

কিরণময়ীকে ঠিক কী বলে সম্বোধন করবো, বুঝি না। মাসি, মাসিমা। বিদেশে দীর্ঘদিন থেকে একটা বদঅভ্যেস হয়েছে, নাম ধরে ডাকা। আজকাল তো দ্বিগুণ বয়সীদেরও দিব্যি নাম ধরেই ডাকছি। আগে যাদের দা বা দি বলতাম, সেগুলো আর পাল্টাইনি, তবে নতুন যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তাদের নামের শেষে আর দা বা দি বসাই না। কেউ যদি কটমট করে তাকায়, পছন্দ না করে, তবে মুশকিলে পড়ি। কিরণময়ীকে অগত্যা দেশি মাসি বলেই সম্বোধন করি— মাসি, বলুন কেমন আছেন? সম্ভবত, ঢাকায় যখন দেখা হয়েছে, মাসিই বলেছিলাম।

— সুরোর কাছে শুনেছো নিশ্চয়ই কেমন আছি। তুমি এলে মা, কটা বছর আগে এলে না কেন! সুরোর বাবা কত যে তোমার কথা বলতেন। কোথাও তোমার খবর দেখলে সেগুলো কেটে রাখতেন। কত বার করে যে পড়তেন। খালি বলতেন, মেয়েটার কত দুর্ভোগ হচ্ছে আমাদের জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটার কত যে কষ্ট হচ্ছে। মা-বাবা ছাড়া বিদেশে পড়ে আছে। কেমন আছে, কী করছে কে জানে! তোমার জন্য কত চোখের জল ফেলেছেন সুরোর বাবা! তুমি এলে, এলে মা ঠিকই, তাঁর সঙ্গে দেখা হলো না।

কিরণময়ী বলতে বলতে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। আমি হাত বাড়িয়ে তাঁর একটি হাত ধরি, ধরে থাকি। কান্নার দমক থামলে চোখ মুছতে মুছতে তিনি বলতে লাগলেন— টেলিভিশনের সামনে বসে থাকতেন, তোমার খবর যদি দেখায়। তোমার সাক্ষাৎকার হবে জানলে দুঘণ্টা আগে থেকেই বসে থাকতেন। তোমার লেখা, তোমায় নিয়ে লেখা, তোমার খবর কিছু বাদ রাখেননি জমাতে। তোমাকে নিয়ে করা তার অনেকগুলো খাতা ছিল, খাতায় আঠা দিয়ে সেঁটে সব লেখা। খাতাগুলো আলমারিতে যত্ন করে তোলা থাকতো। মাঝে মাঝেই নামিয়ে এনে এগুলো পড়তেন। এত খবরের কাগজ তো আমরা রাখি না, উনি পত্রিকাওলাদের সঙ্গে ভাব করে ওদের কাগজ খুলে দেখতেন তোমার সম্পর্কে কিছু লেখা আছে কিনা, বাংলা হিন্দি ইংরেজি কিছু বাদ রাখেননি। তোমাকে নিয়ে লেখা বেরোলেই সেই কাগজ কিনে তবে বাড়ি ফিরতেন। অভাবের সংসার, হলে কী হবে, ওগুলোর যত্ন সব সময় করেছেন। ওগুলোর ওপর ধুলো পড়তে দেননি। খালি বলতেন, মেয়েটা নিশ্চয়ই শিগগির ফিরে যেতে পারবে দেশে। মা গো চিতায় তাঁর প্রিয় অনেক জিনিস দিয়েছি, ওগুলোও দিয়ে দিয়েছি। জানি না কোথায় যাবেন, কোথাও যদি যান তিনি, সঙ্গে ওগুলোও যাক। প্রিয় আর তেমন কী ছিল, দেশের জিনিস মা, দেশের জিনিস। বললে তুমি বিশ্বাস করবে না মা, বাংলাদেশের একটা পতাকা, তার মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট, ও দেশ থেকে কাকে দিয়ে বাখরখানি আনিয়েছিলেন, একটু একটু করে ভেঙে খেতেন, আর ওই বাখরখানি নিয়ে কী যে উচ্ছ্বাস ছিল তাঁর, ওই পুরনো পড়ে থাকা কিছু বাখরখানি, আর তোমার খবর আর লেখার খাতাগুলো। কী হবে এসব রেখে এখানে? বুকের ওপর দিয়ে দিয়েছি। ওনার জিনিস উনি নিয়ে যান। আমরা কি আর সম্মান দিতে পারবো ওসবের? তুমি এসেছো মা, দেখলে কত যে খুশি হতেন উনি। বলেই আবার কিরণময়ী চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলেন। অনেকক্ষণ কাঁদলেন। আমি স্থবির বসে রইলাম পাশে। আমার গা এত শিথিল হয়ে আছে যে, আমার হাতটা কিরণময়ীর হাত থেকে ধীরে ধীরে সরে আসে। কোনও কথা বলা সম্ভব হয় না আমার। অনেকক্ষণ আমি চুপ হয়ে স্থির বসে থাকি। কান্না বোধহয় কখনও কখনও বেশ সংক্রামক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুধাময় দত্ত কী করে মারা গেলেন, তার কোনও গল্প আমি শুনতে চাই না। হয়তো খুব নিষ্ঠুরের মতো হয়, যে মানুষটার কথা এত বলা হচ্ছে, আর তাঁর কথা জানার জন্য আমি কোনও আগ্রহ দেখাচ্ছি না। সত্যি বলতে কী, মৃত্যু নিয়ে আমার কোনও আগ্রহ নেই। মৃত্যুর কথা আমি বলতে চাই না, শুনতে চাই না। তার চেয়ে জীবনের কথা হোক। যৌবনের কথা হোক। ঘরটির চারপাশে দেখে জিজ্ঞেস করি,

— মায়া কোথায়?

— মায়া তো শ্বশুরবাড়ি।

— ও।

— মায়া কী করছে?

কোনও মেয়ের প্রসঙ্গ উঠলে মেয়ে কী করছে, এই প্রশ্নটি সাধারণত আমি করিই। আমার খুব শুনতে ইচ্ছে করে মেয়েটি কিছু একটা কাজ করছে। কারও স্ত্রী বা কারও মা তাদের পরিচয় নয়। মেয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর। চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, উপার্জনের জন্য যা হোক কিছু করে। আমার একেবারেই শুনতে ভালো লাগে না— ও তো কিছু করছে না, বা ও হাউজওয়াইফ, এসব। প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে যে করেই হোক স্বনির্ভর হোক, এ আমি যে করেই হোক চাই। পরনির্ভর মেয়েদের জন্য আমার করুণা হয়। স্বনির্ভর হওয়ার উদ্যোগ যারা নেয় না, তাদের ওপর মাঝে মাঝে রাগও হয়। জীবন তো একটিই এবং একবারই। বাধাবিপত্তি নানা কিছু সামনে আসবেই, তাই বলে ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে না কেন? ঠকবে, একবার দুবার তিনবার। মেয়েদের পথ কেউ মসৃণ করে দেয় না। নিজেদেরই পাথর সরাতে হয়।

কিরণময়ীকে আগে যেমন দেখেছিলাম, কপালের দিকটায় সামান্য কিছু পাকা চুল ছাড়া আর তেমন কোনও বয়সের ছাপ চোখে পড়লো না। শারীরিক পরিশ্রম করলে বয়স তেমন শরীরে এসে বসে না। আমার তো বসে থাকার কাজ। আমার বরং চৌদ্দ বছরে চৌত্রিশ বছর পার করেছি মনে হয়। শরীরে মেদ জমেছে যেমন ইচ্ছে। চুল পেকেছে নানি-দাদিকে হারিয়ে দিয়ে। চেহারা নষ্ট হয়েছে। গলকম্বল বেড়েছে। অথচ 'লজ্জা' যখন লিখেছি, শহরের সুন্দরী বিদুষী মেয়ে হিসেবে এক নম্বর বলা হত আমাকে। চিরকালের মেদহীন ছিপছিপে শরীর এখন ধুমসি। কিরণময়ী আগের মতোই দেখতে। সুরঞ্জন অনেকটাই ভারী হয়েছে। হলে কী হবে, মুখখানা কেমন কচি কচি। বয়স হয়েও হইলো না বয়সের মতো। চোখের চাওয়ায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার ভুলও হতে পারে, নাও হতে পারে, মনে হয়েছে গভীরতা বেড়েছে। মায়া কেমন দেখতে? আগের মতোই কি? এই প্রশ্ন আমি কাউকে করি না। নিজেকেই করি, যখন কিরণময়ী আমার জন্য চা করতে গেলেন। দুটো ঘর, এক চিলতে রান্নাঘর। এটুকুর মধ্যেই বাস। বড় বিছানা। বিছানাতেই অতিথিদের বসানো হয়। দুটো স্টিলের আলমারি। একটা আলনা। আসনায় কাপড়চোপড় গোছানো। জানালায় ছোট ছোট পর্দা। দেয়ালে মন্দিরাকৃতি খোপ, ওতে দেবদেবীর কটি মূর্তি, মূর্তিগুলোর সামনে লাল জবাফুল। ঘরের অন্যদিকে একটি টেবিল, ওতে টেলিভিশন। বাটিকের লাল হলুদ একটি কাপড় দিয়ে ঢাকা দেওয়া। আরেক ঘরে একটা ছোট খাট। একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার। কাঠের একটা আলমারি। কাঠের তাকে কিছু বই। একটা হেলমেট। কোনও খাবার ঘর, খাবার টেবিল এসব নেই। অনুমান করি, এরা বিছানায় বসেই খায়, কারণ চা টা এনে বিছানার ওপরই একটা খবরের কাগজ পেতে রাখলো। ঢাকায় সুধাময়ের বাড়িটি এর চেয়ে অনেক ভালো ছিল, জীবনযাপনের মান ছিল অনেক উন্নত। নিঃসন্দেহে অভাবের কামড় এরা নিয়তই ভোগ করছে। অভাব আছে, থাকলেও এক ধরনের নিরাপত্তা আছে। মুসলমান মৌলবাদীদের অজ্ঞতার এবং অশিক্ষার টার্গেট হচ্ছে না। কিন্তু বেলঘরিয়া থেকে বা দমদম থেকে এখানে এই পার্ক সার্কাসে মুসলিমপ্রধান এলাকায় বাড়ি ভাড়া নেওয়ার কী প্রয়োজন তাদের ছিল! প্রশ্নটি আমার ভেতরে থাকে, আমাকে নাড়ায় চাড়ায়।

— একটা চাকরি করে। ওই ওদিকেই বন্ডেলগেটে। একটা ওষুধ কোম্পানিতে।

— বেতন ভালো পায়?

— ভালো আর কত! ছ-সাত হাজারের মতো।

— এই টাকা দিয়ে আজকাল কি আর কিছু হয়?

— ওর টাকা দিয়েই তো ওর চলতে হয়। স্বামী যা রোজগার করে, তা মায়ার আর দেখা হয় না।

— কোথায় যায়?

— কোথায় আর?

কিরণময়ীর চোখ উপচে তখন জল। সুরঞ্জন তার হাতের চা নিয়ে অন্য ঘরে চলে যায়।

— আর সুরঞ্জন। ওরও তো বোধ হয় কিছু...

— কলেজের চাকরিটা যাওয়ার পর আরও কিছু চাকরি তো করলো। সবখান থেকেই ভালো লাগে না বলে বেরিয়ে পড়ে। এখন আমি শাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাপড় বিক্রি করে সংসার চালাই। ও যে কিছু টিউশনি করে ওতেই ওর হাত খরচ চলে। কিছু অবশ্য দেয় সংসারে। সংসার আর কি! এর নাম কি সংসার? সুরঞ্জনের বাবা মারা যাবার পর একে আর সংসার বলে মনে হয় না। কোনওভাবে টিকে আছি। ভগবান যত তাড়াতাড়ি নিয়ে যান, তত ভালো।

তার ফুঁপিয়ে কাঁদা শেষ হওয়া অবধি থামি আমি। শেষ হলে বলি— আত্মীয়স্বজন যারা আছে, খবর-টবর নেয়। কোনও রকম সাহায্য করে?

— না। না। না।

কিরণময়ী জোরে মাথা নাড়লেন।

— দেশের মতো কিছুই না এখানে। সবাই খুব স্বার্থপর। সুরঞ্জনকে একটা ভালো চাকরি দিতে অনেকেই তো পারতো। কেউ তো দেয়নি। আর ও বাড়িতে থেকে... ওরা আত্মীয়ের নামে কলঙ্ক মা। ওরা আমাদের সর্বনাশ করেছে।

— কারা?

— প্রথম এ দেশে এসে যাদের বাড়িতে উঠেছিলাম।

কী সর্বনাশ করেছে তা আমি নিজ থেকে জিজ্ঞেস করি না। যদিও জানার ইচ্ছা ছিল ভেতরে। সর্বনাশের কথা না বলে সম্ভাবনার কথা শুনতে আমি আগ্রহী।

আমার দিকে কিরণময়ী বড় আকুল চোখে তাকালেন। কেন তাকালেন জানি না। তিনি কি ভাবছেন আমার খুব জানাশোনা আছে এই শহরে, ইচ্ছে করলে সুরঞ্জনের একটা ভালো ব্যবস্থা আমি করতে পারবো! কোনও ভালো কোম্পানির ভালো কোনও চাকরিতে, অথবা ভালো কোনও ব্যবসায় ঢুকিয়ে দিতে পারবো। কিরণময়ী জানেন না, সে ক্ষমতা আমার নেই। আমার নিজেরই পায়ের তলায় মাটি নেই। যে কোনও দিন আমাকেই তাড়িয়ে দিতে পারে ওপরওয়ালারা। আমাকেই তল্পিতল্পা নিয়ে বিদেয় হতে হবে।

চা-বিস্কুট খাওয়া শেষ হলে কিরণময়ীকে বললাম তার শাড়ির দোকানের কিছু শাড়ি দেখাতে। দোকান বলতে কিছু নেই। লোকে এ বাড়িতে এসেই শাড়ি দেখে শাড়ি কিনে নিয়ে যায়। শুধু শাড়ি নয়, সালোয়ার-কামিজও আছে। তিলজলার কিছু মেয়ে দিয়ে কাপড়ে নিজে ডিজাইন করে এমব্রয়ডারি করিয়ে আনেন। এতে শাড়ির দাম সামান্য বাড়ে। আলমারির দরজা হাঁ করে খুলে ভেতর থেকে মহা উৎসাহে শাড়ি এনে বিছানায় ফেললেন তিনি। সাধারণ সুতি শাড়ি। কিছু আবার সিল্ক। কিছু শাড়িতে রঙের আঁকা। কিছুর ওপর সুঁতোর কাজ। কোনটাই, সত্যি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে কী আমার খুব পছন্দের নয়। তবু ওর মধ্যেই সাতটা শাড়ি আমি বেছে নিই। বলি— এগুলো আমি কিনবো।

কিরণময়ী আঁতকে উঠলেন। সাতটা শাড়ি একবারে কেউ কখনও কেনেনি তাঁর কাছ থেকে। বললাম— দাম কত হলে হিসাব করে বলুন।

— তুমি কিনবে কেন? কোনটা তোমার পছন্দ হয়েছে বলো। আমি তোমাকে দেব।

— আমি কিনে নেব। সবগুলোই আমার পছন্দ হয়েছে। কিরণময়ী বড় লজ্জায় বললেন— তুমি কি এগুলো পরবে? এগুলো তো...

— আমি খুব দামি শাড়ি পরি না। কম দামি শাড়িই আমি কিনি। দক্ষিণাপণ থেকে খুব কম দামেই তো শাড়ি কিনি। পাতলা সুতি শাড়িই আমার ভালো লাগে। গরমের দেশে তো তাই পরা উচিত।

কিরণময়ী অত্যন্ত কুণ্ঠিত। বুঝতে পারি তাঁর ইচ্ছে করছে সবগুলো শাড়িই আমাকে উপহার দিয়ে দিতে। কিন্তু বাস্তবতা তাঁকে সেটা করতে দিচ্ছে না। যদি ঢাকা হতো, হয়তো দিয়ে দিতে পারতেন। বাংলাদেশের লোকেরা দুহাতে দান করে, এ দেশে সে অভ্যেস কারও নেই। বললেন। বলার সময় লক্ষ করলাম কিরণময়ীর চোখের কোণে কালি।

— শরীর ভালো তো আপনার!

— না, শরীরে কিছুই হয়নি। যা হয় মনেই হয়।

— ঘুম হয় না?

— কোনও ঠিক নেই।

— ঘুম না হলে ওষুধ খেয়ে ঘুমোবেন।

— সুরঞ্জনটা বদলালো না। আগের মতোই আছে। আলসে। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়। কলেজে চাকরিটা যখন করতো, তখন ভেবেছিলাম, ছেলেটার একটা গতি হলো। ও যে এমন উড়নচণ্ডীই রয়ে যাবে, তা কে জানতো। বসেই ছিল, অনেক বলে কয়ে টিউশনি ধরিয়েছি।

— বন্ধুবান্ধব নেই? অন্য ঘরের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করি।

— তেমন তো দেখি না।

তখনই কেউ এসে ঢুকলো পাশের ঘরে। যেটুকু কথোপকথন কানে এলো, তাতে বুঝি আমজাদ নামের এক লোক সুরঞ্জনের মোটরসাইকেলটা ফেরত দিতে এসেছে। আমজাদের সঙ্গে সখ্য যে বেশ, তা ভেসে আসা টুকরো টুকরো শব্দে বাক্যে বুঝি।

সুরঞ্জন কিরণময়ীর ঘরে হাসিমুখে ঢুকলো। বললো— দু কাপ চা দাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— চা দাও মানে? নিজে করে নাও।

আমার এই কথায় সুরঞ্জন কিরণময়ী দুজনই অবাক। ছেলে চা চাইছে মায়ের কাছে। আর আমি কিনা বলছি, নিজে করে নাও। ওদের অবাক হওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে আমি একটু হাসলাম। না, আমার কথায় কিছু হবার নয়, বরং সুরঞ্জনের বাক্য একটি উপহার পেলাম— এই কুটিরে এসেও নারীবাদ!

— আমার নারীবাদ তো শুধু প্রাসাদের জন্য নয় বাপু। কুটিরের জন্যও। তোমার জন্যও।

সুরঞ্জনের ঠোঁটে মিষ্টি হাসি। এই হাসিটি খুব সুন্দর। আমার সঙ্গে প্রথম বোধহয় ও এভাবে হাসলো। মনে কি কোনও কারণে স্ফূর্তি, কে জানে!

ওদিকে আমজাদের সঙ্গে প্রথম সিপিএম, নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর নিয়ে কথা হলো। সুরঞ্জন শুনলাম সিপিএমের গালাগাল করলো। এরপর হঠাৎ আমজাদের খিদিরপুরের ব্যবসা নিয়ে সুরঞ্জনের দুশ্চিন্তা। ওটি বেগবাগানের কোথাও, সে কারও সঙ্গে কথা বলেছে, নাকি স্থানান্তরিত করা উচিত। ওখানে সন্ত্রাসীদের উৎপাত খুব বেশি। জীবনের ঝুঁকিও আছে। কী দরকার ঝুঁকি নিয়ে? কিরণময়ীর সঙ্গে আমি কথা চালিয়ে গেলেও কান আমার সুরঞ্জনের আলোচনায়। এক ঘরের কথা আরেক ঘরে খুব সহজে না গেলেও শোনা যায়।

— এত এলাকা থাকতে এই এলাকায় কেন? কিরণময়ীকে জিজ্ঞেস করি।

— বেলঘরিয়ায় তো ছিলামই। ওখানে তার বাবা মারা যাবার পর থেকেই আর থাকতে চাইছিল না। কিন্তু বাসা বদলানো আর হয়ে ওঠেনি। এ বছর তো কিছুতেই থাকবে না। কী জানি কী হয়েছে। বদলালো বাসা। গোঁ ধরলো, বাসা বদলালে নাকি পার্ক সার্কাসেই বদলাতে হবে। কেন, কী উদ্দেশ্যে জানিও না। কাছে পিঠে কোথাও চাকরি যদি করতো তাহলে তো বুঝতাম।

— তবে কী কারণে?

প্রশ্নটি করার সময় উদ্বেগ কাঁপে কণ্ঠে। আমার ভালো লাগছে না এক মুসলমান ছেলের সঙ্গে সুরঞ্জনের এমন হৃদ্যতা। সুরঞ্জন কিসে জড়াচ্ছে তবে! এই এলাকায় বাস করার উৎসাহ তার কেন, কী কারণ এর পেছনে থাকতে পারে, তা আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে। সে কি বিজেপি বা আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসএসএর দূত হয়ে এখানে এসেছে? মুসলমানদের ভেতরের খবর নিয়ে তারপর এদেরই এক এক করে নাশ করবে।

আমি কার পক্ষ নেব— ওই নিরীহ আমজাদের, নাকি সুরঞ্জনের? আমজাদ নিরীহ কিনা তাই বা কে জানে? আমজাদ লোকটি বা ছেলেটি আমাকে যেন না দেখতে পায়, এমন আড়ালে থাকি। কারণ, বলা যায় না, যদি সে মৌলবাদী হয় তবে এখানেই আমাকে জবাই করে ফেলে রাখবে। সুরঞ্জন আমাকে রহস্যের মধ্যে পাক খাওয়াতে থাকে। আমার কৌতূহল আর সংশয় ভরা মুখখানির দিকে সে চোখ ছোট করে বার দুয়েক তাকিয়েছে। ওই চোখে আরও রহস্যের আনাগোনা ছিল। কী চায় সে? কোনও তো অন্যায় করিনি যে প্রতিশোধ নিতে হবে। আমাকে বলে দাও আমি যে কট্টর হিন্দু হয়ে উঠেছিলাম, হিন্দু রাষ্ট্র কায়েমের জন্য মাঠে নেমেছি, এখন আমি দরিদ্র একটি বাস এনেছি খোদ মুসলিম এলাকায়। আমার উদ্দেশ্য এই এই এই। বলে দিলে মিটে যায়। আমাকে দুর্ভাবনার মধ্যে রেখে কী আনন্দ তার?

— এখানে মুসলমানদের সঙ্গে আপনাদের ওঠাবসা আছে নাকি?

— হ্যাঁ হ্যাঁ। ওরা খুব ভালো।

— ভালো।

— হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

— এখানকার লোক?

— হ্যাঁ, এখানকার। ওরা তো বাঙালি।

AMARBOI.COM

কিরণময়ী বাংলাদেশের মেয়ে বলেই হয়তো ভুলটা করেননি। বাঙালি মুসলমানদের মুসলমান বলা, আর বাঙালি হিন্দুদের বাঙালি বলাটা এখানকার লোকদের বদঅভ্যেস, এসব আসে চূড়ান্ত অশিক্ষা এবং কুশিক্ষা থেকে। বাঙালি হিন্দু আর বাঙালি মুসলমান বাংলাদেশে এক এলাকায় বাস করে বলেই দুজনের জানাশোনা বেশি হয়। এখানে এলাকা আলাদা। হিন্দু এলাকায় মুসলমানের বাস অসম্ভব। কিন্তু চারদিকে মুসলমানদের বাড়ি আর মাত্র দু-একটি বাড়ি হিন্দুর এখানে। কোনও হিন্দু ঠেকায় না পড়লে এই এলাকায় থাকতে আসে না। আর সুরঞ্জন শুনি শখ করে এসেছে। মুসলমান আছে বলে একটা দেশ, যেটা ওর নিজের দেশ, ত্যাগ করে চলে এল, আর এ শহরে হিন্দু এলাকা ছেড়ে কী স্বার্থে ও মুসলমানের এলাকায় বাস করতে এলো, তা না জানা অবধি আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। সুরঞ্জনের রহস্য ইচ্ছে করে দুহাতে ছিঁড়ি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাতটা শাড়ির দাম সাড়ে তিন হাজার টাকা। টাকাটা খুব কুণ্ঠায় খুব লজ্জায় তিনি নিলেন বটে, কিন্তু একটা শাড়ি, ভালো একটা সিল্কের শাড়ি আমাকে দিলেন।

পাশের ঘরের আমজাদ আমার উপস্থিতির কথা কিছু যেন না জানে। কিন্তু এ কথা কাকে বলি? আমার নিরাপত্তারক্ষীরা আমাকে এ বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে। তারা জানে না কেউ ঢুকে গেছে বাড়িতে, তার নাম আমজাদ। আমজাদের মনে কী আছে, তা এক আমজাদ ছাড়া আর কেউ জানে না। সুরঞ্জন কি জানে?

সংশয় আমাকে স্বস্তি দেয় না।

— যে লোকটি এসেছে, তাকে চেনেন? কিরণময়ীকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করি। আমার সারা মুখ থমথমে।

কিরণময়ী হেসে বলেন— তুমি কি ভয় পাচ্ছ নাকি? ও খুব ভালো ছেলে। আমজাদ। আমজাদ আমার ঘরের ছেলের মতো। ও মেদেনীপুর গেল কাজে। সুরঞ্জনের বাইকটা নিয়ে গিয়েছিল। ফিরলো তো প্রায় এক মাস পর।

এক মাস নিজের বাইক যাকে দিয়ে দেওয়া যায়, তার সঙ্গে সুসম্পর্কই তো থাকে। আমার অস্থির পায়চারি দেখে তিনি চিন্তিত। বেরিয়ে যে যাবো তারও উপায় নেই। ও ঘর দিয়েই বাইরে বেরোবার দরজা। আর ও ঘরে যাওয়া মাত্রই আমাকে আমজাদ নামের লোকটা নির্ঘাত চিনে ফেলবে। চিনে ফেললে সে কি পথরোধ করবে, নাকি অন্য কিছু, অন্য কোনও হাড় হিম করা কিছু! সুরঞ্জন কি তখন রক্ষা করবে আমাকে?

আজ সকালেই যাকে আমার খুব আপন মনে হলো, তাকেই আমি তখন অবিশ্বাস করছি। কিরণময়ী আমার অস্থিরতা লক্ষ করেন এবং বোঝেন, কেন। তিনি দরজার পর্দা সরিয়ে সুরঞ্জনকে এ ঘরে ডেকে নিয়ে আস্তে করে বলে দেন আমজাদকে বিদেয় করতে। সে ঠিক বুঝে পায় না কেন কী কারণে তার বন্ধুকে হঠাৎ বিদেয় করতে হবে। এ রকম তো নয় যে মায়া ঘরে আছে বা কিছু। কিরণময়ী আমাকে আড়চোখে দেখিয়ে ঘটতে পারে এমন একটা বিপদের আশঙ্কার ইঙ্গিত করে।

সুরঞ্জন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় আমার দিকে। আমিও। দুজন দুজনকে চিনতে চেষ্টা করছি হয়তো। কিন্তু আমাকে চেনা তার জন্য কঠিন হওয়ার কথা তো নয়। আমাকে মুসলিম মৌলবাদীরা মেরে ফেলতে চায়। শুধু বাংলাদেশেই নয়, এ দেশেও। মুখে চুনকালি যে মাখতে পারবে, গলায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুতোর মালা যে দিতে পারবে তাকে কুড়ি হাজার টাকা দেওয়া হবে, টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম ফতোয়া দিয়েছিল। আর কদিন আগে ফতোয়া দিল, যে মেরে ফেলতে পারবে তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা। কত কুশপুতুল পুড়িয়েছে ওরা আমার, সুরঞ্জন জানে না? সুতরাং কার মনে কী আছে কে জানে?

চাপা ক্রোধ তার স্বরে— কিছু লোক তো জগতে ভালোও হয়, নাকি?

— হ্যাঁ, হয়। কিন্তু ওর ব্যাপার তো। কিরণময়ী বলেন।

— হুম।

সুরঞ্জন বেরিয়ে গিয়ে আমজাদকে বিদেয় করে।

— একবার মায়াকে দেখতে যাবো।

খাটের রেলিং ধরে নীল মশারি ছুঁয়ে শৈশবের সেই দিনগুলো যেন ছুঁয়ে, বলি,

— মায়া?

কিরণময়ী চমকে উঠে বলেন— কিন্তু ও তো শ্বশুরবাড়িতে।

— তাতে কী?

— তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?

— এতে আমার কিছু যায় আসে না কার বাড়ি। আমি মায়ার কাছে যাবো।

— ওকে তোমার বাড়িতে নাহয় যেতে বলি, অথবা তোমার ওখানে যদি অসুবিধে থাকে, ও বাড়িতে আসতে পারে, তুমি এসো তখন।

টের পাই শ্বশুরবাড়ি খুব ভয়ংকর কোনও বাড়ি। যেখানে যাওয়া যায় না।

কিরণময়ী আমার হাত ধরে টেনে বিছানায় বসিয়ে বললেন— মা গো তুমি যাই যাই করছো কেন! এ বাড়িতে তুমি এসেছো। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি বুঝি! কী খাবে বলো। ভাত না খেয়ে যাবে না।

আমার মাথায় খাওয়াদাওয়া নেই। মাথায় সুরঞ্জনের সঙ্গে আমজাদের সম্পর্কের জটিলতা এবং ওর মধ্যে এখন পা পা করে হেঁটে এলো মায়ার শ্বশুরবাড়ির দুরবস্থা। মায়া যদি ও বাড়িতে ভালোই থাকতো, নিশ্চয়ই কিরণময়ী খুশি হতেন মায়াকে দেখতে তার শ্বশুরবাড়ি পর্যন্ত আমি যাবো বলে।

আরেক কাপ চা খেতে চাইলাম। চা যখন করছেন কিরণময়ী, বললাম— মায়ার সঙ্গে দেখা করতে আপনি বা সুরঞ্জন কি যান না?

কিরণময়ী বললেন— মায়াই আসে। ওর তো আবার দুটো বাচ্চা। এলে বাচ্চাদের নিয়ে আসে।

— একা আসে না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— একাও আসে মাঝে মাঝে।

— সঙ্গে স্বামী আসে না?

কিরণময়ী চুপ করে রইলেন। দীর্ঘশ্বাসটা তাঁর নয়, আমার বেরোলো। ভেবেছিলাম কিরণময়ী বলবেন, জামাইয়ের তো চাকরি আছে, সময় পায় না। আবার কলকাতার বাইরেও এত যেতে হয়। তাই মায়াই অফিস থেকে ফেরার পথে মাঝে মাঝে দেখা করে যায়। না, এ ধরনের কিছু যখন তিনি বলেননি, এ ধরনের ঘটনাও ঘটেনি।

দ্বিতীয় কাপ চা-এর পর আমি যখন বেরোবো, একটি মেয়ে ঢুকলো সুরঞ্জনের ঘরে। পরনে সবুজ সুতি শাড়ি, একটু বেঁটে একটু কালো একটা মেয়ে। হাসিতে একটা স্নিগ্ধতা। বয়স বোঝার উপায় নেই। তেইশও হতে পারে, তেতাল্লিশও হতে পারে। চোখ দুটো বড় বড়। একটু আড়ষ্ট, একটু কী-করবে-বুঝতে-না-পারা-মুখ, একটু আবার মাথা-তোলা। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সুরঞ্জন পরিচয় করিয়ে দিতে হয় বলেই বললো— ও জুলেখা। আমার ঠোঁটে একটুখানি হাসি। এই হাসি কেন, কী কারণে এলো জানি না। আমি যাচ্ছি। জুলেখাকে ঘরে বসিয়ে সুরঞ্জন আমার গাড়ি পর্যন্ত এলো। পেছন পেছন চোখের জল মুছতে মুছতে এলেন কিরণময়ী। তাঁকে বিদায়ের আলিঙ্গনে বেঁধে বললাম— কাঁদছেন কেন! কাঁদবেন না।

কিরণময়ী অস্ফুট স্বরে বললেন— এখানে ভালো লাগে না, মা গো। ইচ্ছে করে দেশে ফিরে যাই।

এর কোনও উত্তর না দিয়ে আমি গাড়িতে উঠি। পেছনে কিরণময়ীর সাদা শাড়ি, পেছনে দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক শহর অন্ধকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরঞ্জন সেদিন আর বাইরে বেরোয় না। সন্ধ্যেয় তার যাওয়ার কথা ছিল আমজাদের সঙ্গে খিদিরপুর। যেতে ইচ্ছে না করার কারণ জুলেখা। জুলেখার সঙ্গে প্রায় এক সপ্তাহ পর তার দেখা। এ সময় কয়েক ঘণ্টা কেটে যাবে তার সঙ্গে। জুলেখা এই ঘরটিতে হাওয়া করার একটা পাখার মতো। ও এলে ফোসকা পড়া গরমকেও তেমন অসহ্য মনে হয় না। জুলেখাকে সুরঞ্জন কখনো বলেনি যে তাকে সে ভালোবাসে। কেবল মুখটি তুলে ধরে চুমু খাওয়ার আগে বলেছে— তুমি যে সাজো না, তাই তোমাকে এত ভালো লাগে।

জুলেখা শুনতে চায় আরও। সুরঞ্জন বলে, তবে নগ্ন দেহটি নিয়ে বলে। বলে— তোমাকে মৎস্যকন্যার মতো লাগে। তুমি ডুবে যাও, আবার ভেসে ওঠো। ভেসে ওঠো, আবার ডুবে যাও। জানি না কোন অতল থেকে সাঁতার কেটে চলে আসো, যখন ডাকি তোমাকে। তোমাকে চিনি, আবার চিনিও না। তুমি ডাঙার কেউ নও, চেনা কেউ নও। তুমি সত্যিকারের, নাকি মিথ্যেকারের বুঝি না। ডান হাতের মধ্যমাটি নগ্নিকার অলিতে-গলিতে ঘোরে। যেন শরীরের ক্যানভাসে ছবি আঁকছে সে। কপাল থেকে নাক বেয়ে গলায় নেমে দু বুকের চুড়োয় উঠে আবার নেমে গিয়ে মাঝখান ধরে সোজা পেট তলপেট উরুসন্ধি থেকে বাঁ উরুতে উঠে হাঁটু বেয়ে পা বেয়ে পা হয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল ধরে উল্টো পথে একই রকম ভাবে ফিরে আসে কপালে। কপাল থেকে আঙুল যখন বোজা চোখের পাতা স্পর্শ করে, তখন চোখ খোলে জুলেখা।

একসময় এই খেলাটি, বিছানায় প্রেমটি জুলেখার বাড়িতেই হত, যখন স্বামী চলে যেত কাজে, বাচ্চা স্কুলে। সুরঞ্জন উপগত হতে নিলেই পাড়ার একটা বেয়াড়া কুকুর জানালার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতো। কেন করতো কে জানে। শেষের দিকে কুকুরের চিৎকার শুনে সুরঞ্জনকে খেলা থামিয়ে বিদেয় নিতে হয়েছে। কুকুরের চিৎকারে জানালার কাছে কেউ ভিড় জমায়নি যদিও, কিন্তু জমাতেও তো পারতো-র একটা আশঙ্কা সব সময় থেকে যায়। পাড়ায় যারা অতি উৎসাহী ছিল সুরঞ্জনকে নিয়ে, জানতো যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলেখার বাপের বাড়ির লোক। বীরভূমে জুলেখার বাপের বাড়ি। অবশ্য বীরভূম থেকে, বছরের পর বছর যায়, কেই উঁকিও দেয় না এদিকে। হঠাৎ উদয় হওয়া বাপের বাড়ির লোকের সঙ্গে খুব সন্তর্পণেই জুলেখা শুয়েছে মাসের পর মাস। কড়া দুপুরের দিকে জনমনুষ্যিহীন পাড়ায় সুরঞ্জনের কাছ থেকে পেয়েছে সে শরীরী প্রেম, যা মহব্বতের সঙ্গে অনেকগুলো বছর দিনের পর দিনের একঘেয়ে সেই সব সঙ্গমে পায়নি।

কী করে তার সঙ্গে পরিচয় জুলেখার, এই প্রশ্নটি করলে সুরঞ্জন দ্রুত কোনও উত্তর দিতে পারে না। সম্পর্কটি কি অনেক বছরের, নাকি অল্প কদিনের? এই প্রশ্নের উত্তরও তার পক্ষে খুব সহজ নয় দেওয়া। সুরঞ্জনের সঙ্গে আমজাদ নামের একটি মুসলমান ছেলের পরিচয় ছিল, ছেলেটির পার্ক সার্কাসে বাস, এ পাড়ায় আমজাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতে আসতেই, চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে দিতেই যে আরেকটি লোকের সঙ্গে পরিচয় হয় সুরঞ্জনের, তারই আত্মীয় জুলেখা। কিন্তু জুলেখার সঙ্গে এ রকম সাদামাটা পরিচয়টি সুরঞ্জনের পছন্দ নয়। জুলেখার সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রথম দিন থেকে সুরঞ্জন অনেকটা ঘোরের মধ্যে একটি গল্প গড়ে উঠতে দেখে। মস্তিষ্কের কোষে কোষেই গল্পটির অঙ্কুর সে নিজেই বপন করেছে, নিজেই সেগুলোকে দেখছে চোখের সামনেই তরতর করে বড় হচ্ছে। গল্পটি বড় হয়ে হয়ে তাকে নিবিড় করে ডাল পাতা ফুল দিয়ে ঢেকে ফেলতে থাকে, তাকে আমূল আচ্ছন্ন করে রাখে এবং বেশিরভাগ সময়, জুলেখার সঙ্গে যখনই সে ঘনিষ্ঠ হতে যায়, গল্পটিকে আর গল্প মনে হয় না, মনে হয় এই তো কিছুদিন আগে সবে ঘটে গেল ঘটনাটি। একসময় গল্পকেই সত্যি বলে মনে হতে থাকে। অবচেতন একটি মন একে সত্যি মনে করছে। সুরঞ্জনের মাথার দোষ এখনও কোনও ডাক্তার বা বাড়ির লোকেরা বা বন্ধুরা বা জুলেখা ধরেনি। সুরঞ্জন জানেও না একটি মিথ্যে গল্প তার ভেতরে দৈত্যের মতো বড় হচ্ছে। জুলেখার সঙ্গে তার সত্যটি তার ভালো লাগে না, জুলেখার সঙ্গে তার মিথ্যেটি অসাধারণ। মিথ্যেটিতে সে হিরো। এ শহরে তাকে কেউ চেনে না, জানে না। কিন্তু মিথ্যেটি তাকে অহংকারী করে তোলে। এই মিথ্যেটি তার সম্পদ। আবার এই মিথ্যেটি তাকে লজ্জাও দেয় খুব। জীবনে তার গোপন একটি মিথ্যেই আছে, মোট তাকে একই সঙ্গে অহমিকায় এবং অপমানে ভোগায়। মিথ্যেটি অথবা সুরঞ্জনের অবচেতনের সত্যটির মধ্যে একটি খুনের পরিকল্পনা আছে। ফোন বেলঘরিয়ার কয়েকজন মিলে পরিকল্পনাটি করে, সুরঞ্জন আর অচিন্ত্য ছিল ওদের দলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অচিন্ত্যর সঙ্গে সুরঞ্জনের অনেক দিনের বন্ধুত্ব। বাকিদের সঙ্গে সম্প্রতি ওঠাবসা শুরু হয়েছে। খুন করতে হবে মহব্বতকে, কারণ দুটো ছেলেকে সে বেধড়ক পিটিয়েছে। খুন যদি সম্ভব না হয়, তবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছু ভেঙে কিছু কেটে কিছু থেঁতলে এমনভাবে ফেলে রাখতে হবে, যেন যত দিন বাঁচে, পঙ্গু হয়ে, যন্ত্রণায় ভোগে। নিউ মার্কেটে মহব্বত হোসেনের বাসন-কোসনের ব্যবসা। দোকান বাসনপত্র, দেশি-বিদেশি ডিনার সেট, টিসেট, গ্লাসসেট, চামচসেট, ইলেকট্রিক কেতলি, ননস্টিক কড়াই পাতিল এ রকম অনেক কিছুর। এই নিরীহ মহব্বতের আবার দোষ কী? দোষ হলো, আকণ্ঠ মদ্য পান করা দুটো ছেলে মহব্বতের কাছে এসে টাকা চেয়েছিল। কিসের টাকা? কিছুর না। এমনি। মহব্বত আর তার বন্ধুরা মিলে ছেলে দুটোকে আচ্ছামতো পিটিয়ে পুলিশে দিয়ে দিল। এ রকম ঘটনা অহরহ ঘটছে শহরে। এ এমনই তুচ্ছ ঘটনা যে, এর কোনও নিউজভ্যালুও নেই। কিন্তু তলিয়ে দেখলে এ নিতান্তই ভয়ংকর। ভয়ংকর না হলেও অন্তত ভয়ংকর বলেই ভয়ংকর লোকেরা ভেবে নেবে। কারণ, যারা মেরেছে তারা মুসলমান, আর যারা মার খেয়েছে তারা হিন্দু। এই দুঃসংবাদ আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়লো সুরঞ্জনের বন্ধু মহলে। কারণ হিন্দু যুবকেরা বেলঘরিয়ার ছেলে, সুরঞ্জন অচিন্ত্যদের বন্ধু। সবাই এক রকম পালিয়ে পালিয়ে রয়েছে। পুলিশ না আবার বেলঘরিয়ায় ঢুকে তাণ্ডব শুরু করে। তার আশঙ্কা যে একেবারে নেই, তা কেউ বলতে পারে না। সাবধানের মার নেই।

হঠাৎই এক বিকেলে অচিন্ত্য একটা সুমোয় কয়েকটা বন্ধু নিয়ে সুরঞ্জনের বাড়ি এসে তাকে তুলে নিয়ে সোজা পার্ক সার্কাসের গলির দিকে যাত্রা করে। সুমোয় লাঠিসোঁটা, রড কিরিচ, ছুরি ড্যাগার সব কালো কাপড়ের তলায় লুকোনো। গাড়িতে বসে মদ খাওয়া চলতে থাকে। সুরঞ্জন সানন্দে খাওয়ায় যোগ দেয়। সেদিন রোববার, মহব্বত বাড়ি থাকবে এ রকমই আন্দাজ করেছিলো ওরা। কিন্তু দলবল নিয়ে মহব্বতের বাড়িতে চড়াও হওয়ার পর দেখলো ব্যাটা নেই। স্ত্রী একা বসে আছে। ওই স্ত্রীকেই টেনে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে আসা হলো। অচিন্ত্যের পরামর্শে দ্রুত গড়িয়াহাট। পুরনো বন্ধু পিকে মজুমদারের যে রেস্তোরাঁ আছে গড়িয়াহাটে, তার ওপরতলায় ছোট একটা ঘরে, যে ঘরটা মূলত সিয়েস্তার ন্যাপ-এর, আর মাঝে সাঝে হিসাব পত্তরের কোনও জরুরি মিটিং-এর জন্য রাখা, উঠে এল অচিন্ত্য আর সুরঞ্জন। বাকিরা দশ মিনিটে আসছে বলে বেরিয়ে গেল। ঘরে একটা চৌকি, চৌকিতে পাতলা তোশক আর তেল চিটচিটে বালিশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা সাধারণ কাঠের টেবিল আর দুটো প্লাস্টিকের চেয়ার। টেবিলের ওপর পুরনো কিছু কাগজপত্র। ঘরটিতে আশ্চর্য যে, টেনে আনতে হলো না জুলেখাকে। নিজেই সে দিব্যি ওপরে হেঁটে এলো। অচিন্ত্য জলের বোতলে হুইস্কি আর জল মিশিয়ে এনেছে। বোতলটা বারবারই উপুড় করে গলায় ঢালছে।

— মহব্বত কোথায়? শালা কোথায়?

জুলেখা শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল— ও তো দোকান বন্ধ করে এখন ওর একটা বন্ধুর বাড়িতে গেছে।

— কী নাম বন্ধুর?

শান্ত কণ্ঠ জুলেখার।— তৌকির।

— তৌকিরের বাড়ি কোথায়?

— রায় বাহাদুর রোড।

— এটা কোথায়? সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে।

অচিন্ত্য বললো— চিনি। চণ্ডিকলা বাসস্ট্যান্ডের কাছে তো।

জুলেখা মাথা নাড়ে— হ্যাঁ।

সুরঞ্জন ঠিক বুঝতে পারছে না কেসটা একটা কিডন্যাপ কেস হয়ে উঠছে, নাকি এর কাছ থেকে মহব্বতের খবর নেওয়ার জন্যই একে ধরা। অচিন্ত্যকে বললো, তাহলে একে আর ধরে আনার দরকার কী ছিল? খবর নিয়ে আমরা রায় বাহাদুর রোডেই চলে যেতে পারতাম। অচিন্ত্য এবার গলায় হুইস্কি ঢেলে বললো— ফোন করে টাকা চা।

সুরঞ্জন বললো— বউ-এর জন্য কোনও শালা টাকা দেবে রে? তাও আবার নেড়ে বলে কথা। হতো নাদুস-নুদুস পুত্রধন। চাওয়া যেত।

অচিন্ত্য বললো— একে না এনে পুত্রধনকে আনলি না কেন?

সুরঞ্জন বললো— কোনও ধনই ও বাড়িতে ছিল না।

এখন এই মদ খাওয়ার আসরে মহব্বতের স্ত্রীকে ঠিক কী কাজে ব্যবহার করা হবে সুরঞ্জন জানে না। অচিন্ত্য প্যান্টের বেল্ট খুলে ফেলে আরাম করে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে। বেল্টটাকে হাতে নিয়ে অচিন্ত্য হাওয়ায় দোলাতে থাকে। চোখ বউ-এ। ঠোঁটের হাসিটির অনুবাদ এলোমেলো। সুরঞ্জন আশঙ্কা করে, ঘটনা অন্যদিকে গড়িয়ে যেতে পারে। মহব্বত টার্গেট নয় এই মুহূর্তে। টার্গেট মহব্বতের স্ত্রী, জুলেখা। অচিন্ত্য কি প্যান্টটা খুলবে, নাকি বেল্টকে চাবুক হিসেবে ব্যবহার করবে? সুরঞ্জন দুটির কোনও একটি দৃশ্য দেখার জন্য এই মুহূর্তে প্রস্তুত নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অচিন্ত্যর বোতলটা তুলে নিয়ে সুরঞ্জনও ঢালে গলায়। জলের মতো ঢালে। ছাতি ফেটে যাওয়া তৃষ্ণায় যেমন ঢালে। দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ে তখন বাকি তিনজন। সুব্রত, বিশ্ব আর গোপাল। সুব্রতর হাতে দুটো টিচারস মদের বোতল। গোপালের হাতে কয়েকটা প্লাস্টিকের গ্লাস, বিশ্বর আর তিনটে জলের বোতল। ঢুকেই ইয়াও হু বলে চাপা চিৎকার তিনজনের। সবার চোখ জুলেখার দিকে । জুলেখা একটা চেয়ারে পেছন ফিরে বসা। হঠাৎ বিশ্ব পেছন থেকে দাঁড়িয়ে জুলেখার স্তন খামচে ধরলো। সুরঞ্জন অনুমান করে, জুলেখা দাঁতে দাঁত পেতে বসে আছে। অচিন্ত্য জোরে হেসে উঠে বললো— আমার মালে আমার আগে হাত দিচ্ছিস যে বড়!

এরা সবাই সুরঞ্জনের বন্ধু। এত দিন এদের সঙ্গেই সে মিশেছে। মদ খেয়েছে। মাতাল হয়েছে। রাজনীতির গল্প করেছে। মুসলমানদের হাতের কাছে পেলে ঘাড় মটকে দিয়েছে। ল্যাং মেরেছে। অন্তত না মারতে পারলেও মারতে চেয়েছে। সত্যিকার বুকের পাটা যদি দলের মধ্যে কারও থাকে, সে সুরঞ্জনের। কিন্তু তার পরও আজ তার মনে হচ্ছে, জুলেখাকে এখন ভালোয় ভালোয় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসা উচিত। সব্বনাশ হয়ে যাবে কোনওভাবে যদি ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়। জেল-ফাঁসি হয়ে যেতে পারে। ক্ষমতায় কমিউনিস্ট। হিন্দুর যা কিছু হোক ক্ষতি নেই, মুসলমানদের গায়ে কেউ হাত তুললে তার চৌদ্দগুষ্টিকে আর আস্ত রাখা হবে না।

মাথা ঝিমঝিম করছে। মাথা উড়ে যাচ্ছে ধড় থেকে। মাথা গড়িয়ে গড়িয়ে গড়িয়াহাটের মোড়ে গোত্তা খাচ্ছে। প্যান্টের বেল্ট সুরঞ্জনেরও খোলা হয়ে গেছে। সে আগে, না অচিন্ত্য আগে? নাকি ওরা আগে? ওরা 'আগে গেলে বাঘে খায়' বলতে বলতে তড়িঘড়ি টিচারস ঢেলে গিলছে। সুরঞ্জন একবার চুমুক দেয় ওদের মদে. আরেকবার অচিন্ত্যের মদে। এত ভালো মদ তার আদপেই খাওয়া হয় না। বন্ধুরাও টিচারস খাওয়ার লোক নয়। আজ ভালো দিন। ভালো খাবার-দাবারের দিন। আজ উৎসব। সুরঞ্জন লক্ষ করে, চেয়ার থেকে একটানে জুলেখাকে বিছানায় ফেললো সুব্রত ময়লা তোশক-বালিশের মধ্যে। সুব্রতর মাথাও কোথাও গড়াচ্ছে। শরীর টলছে তার। টেনে খুলে নিল জুলেখার শাড়ি। সায়া-ব্লাউজও টেনে টেনে খুললো। উলঙ্গ একটা নারী পাঁচজন পুরুষের চোখের সামনে। সুরঞ্জন অপলক তাকিয়ে থাকে জুলেখার শরীরের দিকে। সুদেষ্ণার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সুরঞ্জন কোনও উলঙ্গ নারী দেখেনি। তরুণী একটা শরীর। ভরাট স্তন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাচ্চা জন্ম দেওয়া স্তন বলে মনে হয় না। তলপেটে কিছু মেদ। মেয়েদের ওই মেদটুকু সুরঞ্জনের ভালো লাগে। প্রাকৃতিক বলে মনে হয়। না খেয়ে খেয়ে দৌড়ে সাঁতরে মেদ ঝরিয়ে ফেললে বড় কৃত্রিম লাগে। সুরঞ্জনের কি তৃষ্ণা জাগে! জাগে। উরুসন্ধির অঙ্গ ফুঁসে বেরোতে চায়। চোখ ফেরায় সুরঞ্জন অন্যদিকে। অচিন্ত্য টিপ টিপ করে মদ ঢালছে জুলেখার গায়ে। ঢালছে আর হা হা করে হাসছে। মেয়েটি, আশ্চর্য, কাঁদছে না। শাড়ি দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে। চোখও ঢাকা পড়ে আছে। কিছু সে দেখাতে পাচ্ছে না। জুলেখা চিৎকার করতে পারে, এই আশঙ্কায় অচিন্ত্য তার মুখের ভেতর কাপড় গুঁজে দেয়। সে কাপড় মেয়েটি যেই না সরাতে নেয়, গালে কষে থাপ্পর খায়। কিন্তু সরায় শেষ পর্যন্ত, কোনও চিৎকার করে না। হাত-পা ছোড়ে না, শুধু নিজের চোখ দুটো ঢেকে রাখে। ঘৃণায়।

হঠাৎ তিড়িং তিড়িং নাচতে শুরু করে বিশ্ব। নাচতে নাচতে জুলেখার গায়ের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। বিশ্বকে টেনে সরিয়ে অচিন্ত্য 'আমি আগে' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অচিন্ত্যকে ধাক্কা দিয়ে সুব্রত।

কেউ খুব চিৎকার করছে না। মাতাল হলেও সাবধানতা আছে। কিন্তু কানপাতলে হুল্লোড়ের শব্দ ঠিকই শোনা যায়। ছেলেপুলেরা আড্ডা দিচ্ছে— লোকে এ রকমই জানবে বাইরে থেকে, যে রকম জানে। কে বুঝবে যে একটা মেয়েকে ধরে এনে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে বাজারের মধ্যে একটা ঘরে? শামিমার কথা মনে পড়ে সুরঞ্জনের। ঘটনা নাকি ঘুরে ফিরে আসে। ইতিহাসের নাকি পুনরাবৃত্তি হয়। তবে কি তাই হচ্ছে আজ? একই ঘটনা ঘটিয়েছিল সে অন্য দেশে। তবু সেই মেয়ে বেশ্যা ছিল। টাকা দিয়ে শরীর নেওয়াটা আইনত সিদ্ধ ছিল। আর আজ সে ধরে এনেছে একটা মুসলমান ঘরের বউকে। শামিমাকে ধর্ষণ করে সে কোনও শোধ সত্যিকার মেটাতে পারেনি। জুলেখাকে ধর্ষণ করলে মহব্বতকে শাস্তি দেওয়া যাবে। এ কথা বারবার ওরা বলছে। কথাগুলো তীরের মতো মগজে ঢুকছে সুরঞ্জনের। মহব্বতকে হাতের কাছে পেলে পেটে ছুরি বসাতে হবে। খুনোখুনিতে না গেলেও একটা বিরাট শাস্তি মহব্বত পেয়ে যাচ্ছে, তা হলো তার ঘরের বউটা নষ্ট হচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে যার-তার হাতে নয়, রীতিমতো হিন্দু ছেলেদের হাতে। এরপর আরেকটা হিন্দুর গায়ে হাত তুলেছিস কি তোর গলা কেটে নেবো, মহব্বতের বাচ্চা মহব্বত। এ রকমই ব্যাপারটা তা এখন আর বুঝতে অসুবিধে নেই সুরঞ্জনের। এর জন্য, যত সে মদ খাচ্ছে, তত সে প্রস্তুত হচ্ছে। যত তার মাথা হাওয়ায় উড়ছে, বা গড়িয়াহাটে গড়াচ্ছে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তত উবে যাচ্ছে তার দ্বিধা। কিন্তু বারবার মেয়েটির মুখের দিকে চোখ চলে যাচ্ছে। জুলেখার শাড়ি-চাপা মুখের ভেতর থেকে গোঙানোর শব্দ ভেসে আসছে। সুরঞ্জনের চোখ তার গোঙানো মুখটির দিকে। অচিন্ত্য উঠতেই বিশ্ব ঝাঁপিয়ে পড়ল। জুলেখাকে উপুড় করে সে হি হি হি শব্দে ডাক ছাড়ছে, আর ছিঁড়ে কামড়ে যা করার করছে। জিনিসটা সবার কাছে এত সহজ মনে হচ্ছে যেন নিজের শোবার ঘরে বৈধ বউ-এর সঙ্গে বৈধ সঙ্গমে ব্যস্ত একেকজন। যেন এটা চাইলেও কেউ মনে করতে পারছে না, যে, কারও শোবার ঘর নয় এটি, ঘরে আরও দর্শক উপস্থিত, মেয়েটি কারও বিয়ে করা বউ নয়, মেয়েটি অন্যের বউ, মেয়েটির জাত-গোত্র আলাদা। চাইলেও যেন কেউ মনে করতে পারছে না, যে, বাংলাদেশের মতো দেশ নয় এটি, ওখানে সংখ্যালঘুদের ওপর যা ইচ্ছে করা গেলেও ভারতে করা যায় না। কেউ যেন বুঝতে পারছে না, ঘটনা জানাজানি হলে সারাজীবনের জন্য সবারই ফেরার হয়ে যেতে হবে, অথবা জেলে পচে মরতে হবে। অথবা মুসলমান গুণ্ডাদের মার খেয়ে মরতে হবে। সবাই সব ভুলে গেছে, বাস্তবতা থেকে ছিটকে পাঁচশ মাইল দূরে এসে বসে আছে, যেন এই গ্রহে তারা নেই, যে গ্রহে তাদের বাস। এ তো ডাল-ভাতের মতো লাগছে, যেন সোনাগাছিতে বন্ধুরা মিলে কোনও বেশ্যার ঘরে ঢুকে সঙ্গম করছে আর হৈ চৈ করে ফুর্তি করছে। কেউ উচিত-অনুচিতের সামান্য প্রশ্ন তুলছে না। কেউ ভয় পাচ্ছে না। কেউ ভাবছে না, এর পরিণতি কী হতে পারে। শুধুই আনন্দের জন্য করে যাচ্ছে যা করছে, তার সব।

সুরঞ্জনের চোখ স্থির হচ্ছে। তার ঊর্ধ্বাঙ্গ, নিম্নাঙ্গ, পুরুষাঙ্গ ধীরে ধীরে নিস্তেজ হতে থাকে। একবার শুধু বলে সে, এনাফ। আস্তে। কেউ শুনতে পায় না। দ্বিতীয়বারের এনাফটি আরো একটু জোরে। নিস্তেজ শরীরটিতে আচমকা শক্তি ফিরে আসে। তৃতীয়বারেরটি চিৎকার করে। সুরঞ্জনের সজোরে বলা এনাফ শুনে হো হো করে হেসে ওঠে সুব্রত। সুরঞ্জন মুষ্ঠিবদ্ধ করতে থাকে। আর মদ খেতে থাকে। নিঃশব্দে। তার মনে হয় না তার চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটছে। যেন সে পত্রিকার পাতায় কোনও খবর পড়ছে। অথবা কোনও ডকুফিল্ম দেখছে। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছে সেও বুঝি উপস্থিত ছিল তখন। ঘুম ভাঙলে অথবা ঘোর কাটলে সে টের পাবে সে আসলে দর্শক অথবা শ্রোতা গোছের কিছু।

সুব্রত টেনে মেয়েটাকে উঠিয়ে টেবিলে শুইয়ে দিল চিত করে। উরু দুটো দুদিকে ছড়িয়ে। মেয়ে এবার জোর খাটাচ্ছে। উঠে পড়তে চাইছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সুব্রতর শক্ত শক্ত চড় তাকে নিথর করে দিল। সুব্রতর ধর্ষণ গায়ের চামড়া মুচড়ে মুচড়ে, স্তন কামড়ে কামড়ে। সুরঞ্জন ধাক্কা দিয়ে সরাতে চায় সুব্রতকে। সুব্রত বদলে এমন জোরে ধাক্কা দেয় সুরঞ্জনকে যে দেয়ালে গিয়ে উল্টে পড়ে। মাথায় আঘাত লাগে জোরে। এবার সুরঞ্জন ছুটে এসে সেই হাতটাকে শক্ত করে ধরে, যে হাতটা চামড়া মোচড়াচ্ছিল। রেপ করছো করো, বাড়তি কষ্ট দিচ্ছ কেন— সুরঞ্জন বোধহয় তা-ই বলতে চেয়েছিল। হাতটা ধরাই থাকে। সুব্রত এক ঝটকায় লিঙ্গ উঠিয়ে নিয়ে পতনটা ঘটালো সুরঞ্জনের শরীরে। সাদা বীর্য তার নীল জামাকাপড়ে তীরের মতো এসে বিঁধলো। এবার সুরঞ্জন লাগালো সুব্রতর নাক বরাবর এক ঘুষি। বললো— আর কেউ ওই মেয়েকে টাচ করবে না।

— মানে? গোপাল এগিয়ে এল।— আমার তো হয়নি।

— আর হওয়া হওয়ি না। খবরদার গোপাল, এক পাও এগোবি না।

— ও চান্দু। তোমার শখ হয়েছে তো তুমি আগে করে নাও। আমি পরে আসছি।

বলতে বলতে গোপাল বসে পড়লো মাটিতে। বসেই গ্লাসে চুমুক।

— আমি কিছু করবো না। সুরঞ্জন বললো।

— করবি না? অচিন্ত্য চোখ ছোট করে।

— উরেব্বাস। কেইসটা কী? গোপাল বলে।

— ও তো মানুষ, না? ও তো একটা মানুষ! নাকি না? সুরঞ্জন চেঁচায়।

হো হো খিল খিল। ফ্যাক ফ্যাক। ছ্যাক ছ্যাক।

— শালা তো বিগড়ে গেল দেখছি। কী রে সুরঞ্জন, তোর বোনকে তো আর করছি না।

অমনি ফ্যাকফ্যাক সবার। সুরঞ্জন এবার লাথি কষায় এলোপাতাড়ি সবার গায়ে। লাথি শেষ করে সুরঞ্জন নিজের গ্লাসটা তুলতে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লো। পেছন থেকে সুব্রতর ভীষণ এক লাথি।

— বানচোত কোথাকার!

একজন আরেক জনের ওপর। একজনের ওপর তিনজন। সুরঞ্জন চিত হয়ে পড়ে আছে। তার গায়ের ওপর বিশ্ব ছড়ছড় করে পেচ্ছাব করছে। আর গোপাল মেয়েকে ধাক্কা দিয়ে বিছানায় শুয়ে ধর্ষণে মন দিতে যেই না শুরু করেছে সুরঞ্জন শুয়ে থেকেই পা বাড়িয়ে নিজের পায়ে গোপালের পা পেঁচিয়ে হেঁচকা টান দেয়। গোপাল উল্টে পড়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরঞ্জন নিজেকে কোনওমতে তুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো বিশ্বর ওপর। কিন্তু শক্তিতে সে বিশ্বর সঙ্গে পারলেও সুব্রত আর অচিন্ত্য যখন বিশ্বর সঙ্গে হাত মেলায়, তখন পিঠে পেটে কোমরে লাথি খেয়ে তার পড়ে থাকতে হয় উপুড় হয়ে। হুঁশ আছে বলে নিজেরই মনে হয় না।

সব বেরিয়ে যায়। যাবার আগে শার্টের কলার ধরে সুরঞ্জনের মাথাটা ওপরের দিকে টেনে তুলে অচিন্ত্য বলে যায়,— ওটাকে করে ফেলে দিয়ে আয়। দেরি করিস না। কারো কাছে আমাদের কারও নাম উচ্চারণ করলে গলা কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব, বলে দিলাম।

অনেকক্ষণ ওভাবে পড়ে থাকে। দরজা হাট করে খোলা। যে কেউ ঘরে ঢুকলেই বুঝবে কী ঘটেছে এই ঘরে। মেঝেয় জলের বোতল, প্লাস্টিকের গ্লাস। আর ভুল করে ফেলে রাখা কারও কোমরের বেল্ট। সুরঞ্জন উঠে বসে জুলেখাকে বলে,— উঠুন, বাড়ি চলুন।

জুলেখা ধাতব কণ্ঠে বললো,— আপনি করবেন না কিছু?

সুরঞ্জন বলে— না।

মেয়েটি উঠতে চায় নিজে, পারে না। সুরঞ্জনকে উঠে মেয়েটাকে ধরে তুলতে হয়। তার সারা গায়ে ব্যথা। জায়গায় জায়গায় ক্ষত, কোনওটাতে রক্ত। ও নিয়েই সে জুলেখাকে সায়া ব্লাউজ পরিয়ে দেয়, শাড়ি পরিয়ে দেয়। মেয়েটার সম্ভবত মাথা ঘোরায়, দাঁড়াতে গেলেই পড়ে যেতে নেয়। সুরঞ্জন জড়িয়ে ধরে রাখে। ধীরে ধীরে মেয়েটাকে নিচে নামিয়ে সে ট্যাক্সিতে তোলে। রাস্তার লোকেরা হয়তো ভেবে নেয় যে অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে ভদ্রলোক। ভদ্রলোকই বটে আজ সুরঞ্জন।

পার্ক সার্কাসের গলিতে ঢুকে বাড়ির দরজার কাছে সিঁড়িতে জুলেখাকে রেখে সুরঞ্জন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। ভেতর থেকে কেউ নিশ্চয়ই দরজা খুলে দেবে। স্বামী বা কেউ। ট্যাক্সিতে জুলেখাকে উঠিয়ে দিলেই জুলেখা বাড়ি ফিরে যেতে পারত, সুরঞ্জনেরও কোনও ঝুঁকি নেওয়া হতো না। কিন্তু ঝুঁকি যে আছে নিজে পৌঁছে দেওয়ায়, ভাবেনি। তাকে পুলিশ ধরতে পারতো, পাড়ার লোকেরা ঘেরাও করতে পারতো, মুসলমান গুণ্ডারা মেরে হাড়গোড় ভেঙে দিতে পারতো। ভাবেনি বা ভাবতে ইচ্ছে করেনি।

সেই রাতে সুরঞ্জন পার্ক সার্কাস থেকে সোজা শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে শিলিগুড়ির একটা টিকিট করে রাতের ট্রেনে উঠে পড়েছিল। কোথায় যাবে তার কোনও ঠিক ছিল না। না, সুরঞ্জন পুলিশের ভয়ে পালায়নি। সে নিজের ভয়ে পালিয়েছিল। নিজেকে সে ভয় পেয়েছিল। প্রচণ্ড সেদিন। মায়ার মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা মেয়েকে সে তুলে নিয়ে গণধর্ষণ করালো। একবার শুধু তার শামিমার কথা মনে হয়েছিল। ওকে ধর্ষণ ছিল পুরোটাই তার মানসিক ব্যাপার। শারীরিক নয়। শামিমার সম্মতি নিয়েই সে উপগত হয়েছিল তার ওপর। একবার মনে হয় শামিমা এসেছে। বাকিটা সময় তার মনে হয়েছে, মায়াকে বোধহয় এভাবেই ধর্ষণ করেছিল ওরা ওখানে। না, ওদের ওপর রাগ করে সে জুলেখাকে পারেনি ধর্ষণ করতে। জুলেখাকে মনে হচ্ছিল মায়া। জুলেখাকে মনে হচ্ছিল মানুষ। মনে হচ্ছিল একটা নিরীহ সুন্দর মেয়ে। একটুও, একবারের জন্যও তারপর তাকে আর মুসলমান বলে মনে হয়নি। একবারও জুলেখার প্রতি ঘৃণা জাগেনি। নিজের প্রতি ঘৃণা জেগেছে। ওই চার চারটে ধর্ষকের প্রতি জন্মেছে ঘৃণা। অচিন্ত্যদের সঙ্গে সম্পর্ক সে মনে মনে জন্মের মতো চুকিয়ে ফেলেছে।

সম্পূর্ণ না ঘুমিয়ে জানালায় স্থির তাকিয়ে থেকে সুরঞ্জন শিলিগুড়ি পৌঁছোলো। পথে কারও সঙ্গে সে কথা বললো না। কিছু খেল না। পরদিন আবার ঠিক একইভাবে ফিরে এল। অচিন্ত্যর বন্ধু বিশ্বরূপ মিত্রের কি বিজেপি আর আরএসএসের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে? এই প্রশ্নটি হঠাৎ তার মনে উদয় হয়। শিলিগুড়ি থেকে এই খবরটা জানতে কলকাতায় নেমেই সে পার্টি অফিসে যায়। নথিপত্র ঘেঁটে বিশ্বর কোনও নাম পায় না। যে দু-একজনের সঙ্গে দেখা হয়, তারা বলে দেয়, বিশ্ব হিন্দুবাদী কোনও দলের সঙ্গে মোটেও জড়িত নয়।

অফিসে একটা বয়স্ক লোক বসা ছিল, সুরঞ্জনকে বার কয়েক লক্ষ করে ধীরে ধীরে বললো— কারও ওপর রাগ করে পার্টি থেকে সরে যেও না; ভুল করবে। পার্টি তোমার দুরবস্থার সময় কাছে ছিল। ভবিষ্যতেও কাছে থাকবে।

সুরঞ্জন জানে সেটা। কলেজের চাকরিটাও পার্টির সঙ্গে জড়িত থাকার কারণেই পেয়েছিল। কোনও কথা না বলে সে বেরিয়ে যায়।

জুলেখার বাড়িতে দুদিন পর সে যায়। দুপুরবেলা। বাড়িতে একটা কাজের মেয়ে। জ্বরে জুলেখা কাঁপছে। প্রায় অচেতন। সেই রাতে বাড়ি ফিরে মহব্বত তাকে হাতের কাছে যা পেয়েছে, তাই দিয়ে মেরেছে। চোখের নিচে কালসিটে দাগ। ঠোঁট কেটে গেছে। পিঠে বুকে বাহুতে উরুতে থরে থরে রক্ত জমে আছে। ঘরে কোনও ওষুধ নেই। কোনও ডাক্তার দেখেনি।

সুরঞ্জনকে, অদ্ভুত কাণ্ড, জুলেখা তাড়িয়ে দেয়নি বাড়ি থেকে। পাড়ার লোক ডাকেনি। পুলিশ ডাকেনি। তার ওই বিপদের দিনে সুরঞ্জনকেই সে সহায় ভেবেছিলো হয়তো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরঞ্জনকেই বলেছিলো সে রাতে কী ঘটেছিলো বাড়িতে।

— বাড়ি ফিরে দেখলো আমাকে। আমি কাতরাচ্ছিলাম যন্ত্রণায়।

পাশের বাড়ির একজন এসে শুধু বলে গেল, ওকে তো হিন্দুরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ব্যস।

— কী করে জানলো ওরা?

— মিথ্যে বলেছে। এ রকম কিছু একটা বললে জানে যে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধবে। তাই বলেছে। লোকে চায় মজা দেখতে। আমি যত বলি মুসলমানরা ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। যত বলি, কতগুলো গুণ্ডাপাণ্ডা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, আমার কোনও উপায় ছিল না নিজেকে বাঁচানোর। কিছুতে কিছু শোনে না। সুরঞ্জন যে গল্পটা জানে, জুলেখা সেটা জানে না। জুলেখা জানে তাকে কেউ ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। আমজাদ বা এ রকম নামের কেউ। এ পাড়ার কোথাও কোনও ঘরে ঘটেছে কিছু। সুরঞ্জন শুনেছিলো সব ঘটনা, জুলেখা বলেছিলো। বলেছিলো, সেই রাতে মহব্বত হোসেন চূড়ান্ত অসভ্যতা করেছে। শাড়িখানা প্রায় গা থেকে কেড়ে নিয়ে, প্রায় ন্যাংটো করে, ঘৃণা ছিটিয়ে ছিটিয়ে সারা গায়ে, জিজ্ঞেস করেছিলো, কী করেছে ওরা?

নিরুত্তর ছিল সে! মহব্বতের চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছিল। কপালের শিরাগুলো আরও নীল হয়ে, আরও ফুলে, আরও ফেটে বেরোচ্ছিল। অস্থির পায়চারি করতে করতে বলেছিলো— হারামজাদি এখনও বল, তোর ইজ্জত নিয়েছে নাকি ওরা।

জুলেখা চুপ করে থাকে। তারপর যখন বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে মারতে থাকে সামনে যা পাচ্ছে তা দিয়ে। ভাঙা চেয়ারের পায়া খুলে এনে। কাঁচের ফুলদানি দিয়ে। শক্ত শক্ত জুতো দিয়ে। জুলেখা বললো— হ্যাঁ, যা করার করেছে ওরা।

— কী বললি তুই?

— যা বলার তা তো বলেইছি।

— আবার বল।

— যা করতে পারে শুয়োরের বাচ্চারা, সব করেছে। এ কি আমার দোষ? জুলেখা চিৎকার করে,— এ কি আমার দোষ? কী দোষ করেছি যে মারছো?

জুলেখার কোনও প্রশ্নের উত্তর দেয়নি মহব্বত। সেই রাতের ঘটনা যখন সুরঞ্জন জুলেখার কাছে শুনছিল, প্রশ্নগুলো সুরঞ্জন নিজেকেই করছিল। মহব্বতের কাছে উত্তর নেই। উত্তর কি তার কাছে আছে? কী দোষ জুলেখা করেছিলো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্বরে পুড়ে যাওয়া জুলেখাকে প্রায় পাঁজাকোলা করে তুলে ট্যাক্সিতে বসিয়ে চার নম্বর ব্রিজের কাছে এম ডি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ কিনে রেখে যায় বাড়িতে।

কাজের মেয়ে পরিচয় জিজ্ঞেস করলে জুলেখা বলে— আমার দেশের লোক। বীরভূমের। সম্পর্কে ভাই হয়। নাম সফিকুল।

সফিকুল বেরিয়ে যায়। শহরময় ঘোরে। উদভ্রান্তের মতো। কোনও মাঠে বা কোনও পার্কের বেঞ্চে আকাশের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকে। আর ঘণ্টাখানিক পর পর ফোন করে জানতে চায় সুরঞ্জন কোনও প্রয়োজন আছে কিনা, জ্বর সারছে কিনা। গা ব্যথা কমেছে কি না। কোনও ডাক্তার ডাকা জরুরি কিনা। জুলেখার করুণ কাতর মুখটি সুরঞ্জনের সারাক্ষণ মনে পড়ে।

সুরঞ্জন পরে একদিন জানতে চেয়েছিল জুলেখা কেন চিৎকার করেনি ধর্ষণের দিন। কেন লোক ডাকার চেষ্টা করেনি। কেন কাউকে খামচে খামচে পালাবার চেষ্টা করেনি। জুলেখা ধীরে ধীরে বলেছিল কেন সে চিৎকার করেনি, সুরঞ্জনের কোলে মাথা রেখে একটু একটু করে। জুলেখার চোখ থেকে চোখের জল সুরঞ্জনের খোলা বুকে এসে টুপটুপ পড়ছিল। সুরঞ্জনের বাঁ হাত ছিল জুলেখাকে জড়িয়ে তার পিঠে। ডান বাহু ছিল নিজের চোখ দুটোর ওপরে।

সুরঞ্জন তখন ঘোরে, গল্পটি একটু একটু করে মাথাচাড়া দিচ্ছে। ঘোরে সুরঞ্জন, গল্পটি মাথাচাড়া দিচ্ছে। সুরঞ্জন চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছে কী করে ঘটনাটি ঘটলো। কী করে একপাল দুর্বৃত্ত জুলেখাকে বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। কী করে ওই ধর্ষকদের হাত থেকে সুরঞ্জন বাঁচালো জুলেখাকে। এই গল্পটি ধীরে ধীরে একটু একটু করে সুরঞ্জন জুলেখাকে বলে। জুলেখা বিশ্বাস করতে চায় না, কিন্তু বিশ্বাস করতে তার ভালো লাগে। তার ভালো লাগে বিশ্বাস করতে যে, সুরঞ্জন নামের হিন্দু ছেলেটির সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা নেহাত।

— আমার তো চোখ বাঁধা ছিল। কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না আমি। জুলেখা বলেছে।

— চোখ কে বেঁধেছিল? সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে।

জুলেখা কঠিন কণ্ঠে কলে— আমজাদ নামের লোক।

— কী করে জানো, আমজাদ?

— জানি।

— আমজাদ তো আমার বন্ধু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— আমজাদ নামে কি আর লোক নেই নাকি?

— পার্ক সার্কাসের আমজাদ তো আমারই বন্ধু।

— তাহলে কি তোমার বন্ধুরাই ঘটিয়েছে?

— হ্যাঁ, আমার বন্ধুরাই। তবে বন্ধু নামের কলঙ্ক ওরা। ওদের আমি ত্যাগ করেছি। তবে কী জানো?

— কী!

— আমজাদ নামের কেউ ওখানে ছিল না।

— ছিল। আমি শুনেছি। এই পাড়াতেই।

— না, এই পাড়াতেই না। অন্য পাড়ায়।

— ওরা মুসলমান ছিল।

— না, ওরা মুসলমান ছিল না। ওরা সবাই হিন্দু ছিল।

— না। হিন্দুদের অত সাহস হবে না। অত সাহস হিন্দুদের হয় না।

— আমি জানি আমজাদ ছিল দলের লিডার।

— ভুল জানো।

— চোখ বাঁধা ছিল আমার। জানি না কখন বাঁধন খুলেছে।

— তোমার চোখ খোলা ছিল জুলেখা। তুমি সব দেখেছো। দেখেছো আমাকে।

— তোমাকে দেখিনি আমি।

— আমি ছিলাম।

— কী করে তুমি থাকবে? তুমি কি ওদের মতো বাজে লোক নাকি? বাজে লোক নই বলেই বাজে কাজ করিনি। তোমাকে বাঁচিয়েছি ওদের হাত থেকে।

— তুমি কেন এসব বলছো সুরঞ্জন? আমজাদের সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই। ঘটনার সময় তুমি ছিলে না ওখানে।

— কী করে জানো? তুমিই তো বলছো তোমার চোখ বাঁধা ছিল।

— কিন্তু তুমি তো বলছো আমার চোখ খোলা ছিল। আমি তো তোমাকে দেখিনি।

— তুমি এখন অস্বীকার করছো।

— কী লাভ?

— আমাকে বাঁচাতে চাইছো।

— কেন, তুমি আমাকে বাঁচিয়েছো বলে?

— হয়তো বা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— হেঁয়ালি করছি না।

সিগারেটের শরীরে গাঁজা ভরে টান দেয় সুরঞ্জন। জুলেখাকেও টানতে বলে। বুঁদ হয়ে থাকে দুজন। দুজনের চোখ ঝাপসা হতে থাকে। শব্দগুলো জড়িয়ে ধরতে থাকে শব্দগুলোকে। সুরঞ্জনের গল্পগুলো পাক খেতে থাকে। জুলেখার ঘটনা কণ্ডুলী পাকিয়ে সেই পাকের মধ্যে হারিয়ে যেতে থাকে। সুরঞ্জন কি জুলেখাকে এই সেদিন থেকে চেনে। ঘটনা বা দুর্ঘটনার পর থেকে? জুলেখাকে চেনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। ওই মামাই স্বীকার করতে চায় না আমাকে কোনও মুসলমান ধরে নিয়ে গিয়েছিল, বলে হিন্দুরা, হিন্দুরা। কিন্তু আমি তো জানি হিন্দুরা নয়। আমজাদ ছিল। আমজাদ মুসলমান। কোনও হিন্দুর সাহস হবে না মুসলমান মেয়ের গায়ে হাত দেয়।

— আমজাদ বলে কেউ ছিল না ওখানে। আমজাদ আমার বন্ধু। সুরঞ্জন বলে।

— না, বললাম তো। এই আমজাদ তোমার বন্ধু আমজাদ নয়। এ অন্য আমজাদ। এর ডাকনাম বাদশাহ।

— না।

— কী না?

— তুমি তো আমার বন্ধু আমজাদকে চেনো। চেনো না?

— এটা দাড়িঅলা আমজাদ। তোমার বন্ধুর দাড়ি নেই।

— কী করে জানো?

— জানি।

— তোমার চোখ তো বাঁধা ছিল বললে।

— ছিল, তার পরও জানি।

— কেন তোমাকে তুলে নেবে ওরা?

— কারণ আছে।

— কারণ বলো।

— বলবো না।

— মহব্বত কোনও কারণ?

— না।

— মহব্বতের ওপর প্রতিশোধ?

— না।

— তাহলে?

— আমজাদ আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। রাজি হইনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— বাজে কথা।

— বলতো, মার্ডার করবো।

— কেইস করছো না কেন?

— ঝমেলায় কে যায়! এসব কি একা করা যায়? নাকি করলে আমার রক্ষে আছে? এই সমাজটাকে এখনও জানো না। আমি তো এই সমাজের জন্য সুইটেবল নই। নই বলেই তোমার সঙ্গে যা ইচ্ছে তাই করতে পারছি।

— যা ইচ্ছে তাই?

— হ্যাঁ, যা ইচ্ছে তাই।

— আমি একটা বাজে ছেলে ছিলাম জুলেখা। আমি ওই ধর্ষকদের দলে ছিলাম। তুমি জানো তো সব। ওই অচিন্ত্য। ওই বিশ্ব...

— তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি হিন্দু হয়ে হিন্দুদের দোষ দিচ্ছ।

— তুমি মুসলমান হয়ে মুসলমানদের দোষ দিচ্ছ।

— দোষ দিচ্ছি, কারণ ঘটনাটা ওরাই ঘটিয়েছে।

— না। আমি জানি কারা ঘটিয়েছে। আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি। তা তো অন্তত মনে আছে?

— না। আমার চোখ বাঁধা ছিল। আমি জানি না কে পৌঁছে দিয়েছে।

— আমি দিয়েছি।

— তুমি দাওনি। আমজাদ আমাকে বাড়ির সিঁড়িতে রেখে চলে গেছে।

— জুলেখা তুমি এখন ভালো আছো। কারও বিরুদ্ধে তোমার কোনও কেইস করার দরকার নেই। তুমি ভুলে যাও পেছনের কথা। শুধু আমার দিকে তাকাও, শুধু ভালো কথা বলো। ভালোবাসার কথা বলো। ওই সব রেইপ, কিডন্যাপ— শব্দগুলোকে হেইট করি।

জুলেখা বলছিল,— আমি তো প্রতিরাতেই ধর্ষিতা হতাম সুরঞ্জন। আমার বর কি আমাকে কোনও দিন ভালোবেসে ছুঁয়েছে? ওভাবেই, তোমার বন্ধুরা আমার ওপর যা করেছিল, প্রায় ওভাবেই তো আমার স্বামী আমার ওপর অত্যাচার করতো। অত্যাচারের ফসল ওই বাচ্চা। আমি তো কোনও দিন সুখ পাইনি মিলনে। কেবল তোমার সঙ্গেই পেয়েছি। তুমিই আমাকে প্রথম সুখের মুখ দেখালে। আমার জন্য এই সঙ্গম এই সব ধর্ষণ ছাড়া, অত্যাচার ছাড়া আর কিছু ছিল না।

একটু থেমে, বুকে পড়া জলগুলো মুছে দিয়ে আবার বলছিল— যখন ওরা আমাকে ধরে নিয়ে গেল, বুঝতে পাচ্ছিলাম যে সবাই মিলে ধর্ষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবে। সবাই মদ খেয়ে টাল হয়ে আছে। আমি চিৎকার করলে মুখ চেপে ধরে যদি কেউ, গলা টিপে ধরে যদি, যদি পকেট থেকে ছুরি বের করে গলাটা কেটে দেয়। যদি মেরে ফেলে। ধর্ষণ সে তো আমার কাছে নতুন নয়। আমি মরতে চাইছিলাম না। আমি তাই সহ্য করছিলাম, এমন কিছু করিনি, যা করলে ওরা কেউ রাগ করতে পারে। মেরে ফেলতে পারে।

— মিছিমিছি আমজাদের দোষ দিও না।

— কী লাভ আমার? ঠোঁট উল্টে বলে জুলেখা।

— শোধ নিচ্ছ।

— কিসের শোধ?

— তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। ওই চেয়েছিল পর্যন্তই। জোর করে তোমাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়েটা সত্যি সত্যি করেনি বলে।

জুলেখার বিস্মিত দু চোখ।

সুরঞ্জন বলে— যদি সত্যি আমজাদরা করতো, তোমার মতো ডেয়ারিং মেয়ে কেইস করতো না, এ আমি বিশ্বাস করি না।

জুলেখা সুরঞ্জনের অর্থহীন কথাবার্তার কোনও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। তার মনে পড়ে সেদিনের ঘটনার পর প্রায় প্রতিদিন বাড়ি ফিরে ঘেন্না ছড়াত মহব্বত। জুলেখা তার বাড়িতে একটা বাড়তি লোক। একটা নষ্ট মেয়েলোক। একে মহব্বত চায় না। চোখের সামনে থেকে এই মেয়েলোক দূরে চলে যাক। জুলেখার বাপের বাড়িতে খবর দিয়েও, মামাকে খবর দিয়েও কোনও হিল্লে হলো না। কেউ জুলেখাকে নিতে এলো না।

ঘাড় ধরে বেশ কয়েকবার ধাক্কা দিয়েছে মহব্বত। কিন্তু রুখে দাঁড়িয়েছে জুলেখা। প্রতিবারই সে বলেছে, পুলিশ ডাকবে। বেরোলে সোহাগকে নিয়েই জন্মের মতো বেরোবে বলে দিয়েছে। সোহাগের প্রতি টান মহব্বতের প্রচণ্ড। সোহাগকে ছেড়ে তার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। এভাবে ছ মাস কেটেছে। ছ মাস পর মহব্বত নিজে দেখেশুনে একটা বিয়ে করে নিয়েছে। গ্রামের মেয়ে। লেখাপড়া ছ-সাত ক্লাস। বউ নিয়ে স্বামী অন্য ঘরে শোয়। আর জুলেখা সোহাগকে বুকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় রাত কাটায় রাতের পরে রাত। মহব্বতের বাড়িতে ছেঁড়া পাপোশের মতো জীবন কাটাতো জুলেখা।

যেদিন দুপুরবেলা অবেলায় বাড়ি ফিরে সুরঞ্জনকে ধরে ফেলে, বাপের বাড়ির ভাইকে, সফিকুলকে সেদিনই তার সামনেই তিন তালাক বলে দিল মহব্বত। সুরঞ্জন জুলেখার বিছানায় বসে ছিল, সেই বসা বাপের বাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইয়ের মতো বসা নয়। জানালার পর্দাগুলো টেনে দেওয়া। অন্ধকার করে দেওয়া ঘর। সেখানে সুরঞ্জনের শার্টখানা খোলা, খালি গা। মহব্বত যখন ঘরে ঢুকেছে, জুলেখা কিংকর্তব্যবিমূঢ়, পেছনে মাত্র এসে দাঁড়িয়েছে, হাতের ট্রেতে দুটো মাংসের কাবাব আর দু কাপ চা। ট্রেটা টেবিলে রেখে জুলেখা যেই না দাঁড়ালো, শুনলো তালাক উচ্চারণ। তালাক তালাক। তালাক হয়ে গেল। তালাক হয়ে যাওয়া মানে জুলেখাকে বাড়ি ছাড়তে হবে। কিন্তু ছেলেকে নিতে গিয়ে বাধা পেলো মহব্বতের। ছেলে নাকি দেবে না।

সোহাগকে ফেলে জুলেখাই বা কোথায় কোন চুলোয় যাবে? বেনেপুকুর রোডে নিজের মামার বাড়িতে গিয়ে উঠলো। কাছেই মহব্বতের বাড়ি। ও বাড়িতে সোহাগ। মহব্বতের নতুন বউকে মা বলে ডাকতে হচ্ছে তার। জুলেখা বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া মেয়ে। কেঁদে বুক ভাসিয়ে আত্মহত্যা করে সে বাঁচতে চায় না। এত দিনে সে বুঝে গেছে বেঁচে থাকতে হলে মেয়েদের, বিশেষ করে মুসলমান মেয়েদের, জীবন বেরিয়ে যায় জীবন বাঁচাতে।

মহব্বত তাকে তালাক দেবার পর জুলেখা একফোঁটা চোখের জল ফেলেনি। শুধু সুরঞ্জনের দিকে পাথর চোখে তাকিয়েছিল। ভাবছিল, এবার কী করবে তুমি? ছেড়ে পালাবে তো! দায়িত্ব নেবার ভয় বুকে বাসা বাঁধছে তো! জুলেখা মনে মনে জানতো মহব্বত তাকে একদিন না একদিন তালাক দেবে। এত দিন সোহাগের মুখের দিকে তাকিয়ে দিচ্ছিল না। না হয় ধর্ষিতা হওয়ার দিনই তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিত।

মহব্বত কোনও থানা পুলিশ করেনি। যারা তার বউকে ধর্ষণ করেছে, তাদের খোঁজ যদি সে নেওয়ার চেষ্টা করতো। খোঁজ পেতো। লোক তো মহব্বতের কম নেই। কিছুই করেনি সে। কারণ দুএকজন বন্ধু বলেছে করে নাকি কোনও লাভ নেই, বরং, জীবনটা যাওয়ার ঝুঁকি আছে।

আমজাদের সঙ্গে ব্যবসাসূত্রে মহব্বতের দীর্ঘদিনের শত্রুতা। আমজাদ এবং তার লোকেরা যে জুলেখাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তা মহব্বতের কানে গিয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে ও বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে চায়নি। আমজাদ যদি জুলেখার সর্বনাশ করে মহব্বতের ওপর রাগ কমিয়ে ফেলে, তাহলে মহব্বতের জন্যও বরং এ শুভ সংবাদ।

মহব্বতের রাগ বরং এ ক্ষেত্রে পড়েছে জুলেখার ওপর। জুলেখার দোষ নেই সে জানে, তার পরও মহব্বতের মনে হয়, জুলেখারই দোষ। নিশ্চয়ই সে সুখ পেয়েছে ওসবে। নিশ্চয়ই তার আরাম হয়েছে। মহব্বতের মরলেও বিশ্বাস হবে না জুলেখা বাধা দিয়েছে ওই লোকদের। বরং সময় সুযোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেলে ঐ লোকদের কাছেই জুলেখা ছুটে ছুটে যাবে। জুলেখা সুখের সন্ধান পেয়ে গেছে। মহব্বতের ছোট গণ্ডি থেকে সে যে কোনও কারণেই হোক বেরিয়ে গেছে। সুখের সাগরে সে সাঁতরে এসেছে।

মহব্বতের আশঙ্কা হয় এই কিডন্যাপের পেছনে জুলেখারও হাত ছিলো। জুলেখা বলতে চেষ্টা করছে মুসলমান কিছু ছেলে এই কাণ্ড করেছে। কিন্তু মহব্বতের কানে হিন্দু ছেলেদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ এসেছে। যদিও অভিযোগটি ভিত্তিহীন, কিন্তু কিছু লোকের এসব অভিযোগ করে, দল পাকিয়ে শয়তানি করে বড্ড আনন্দ হয়। মহব্বত হিন্দু-মুসলমানে যায় না, এক দুপুরের ছোট্ট অপহরণ বা ধর্ষণের ধোঁয়াও তাকে একটুকু স্পর্শ করে না। ওই নষ্ট মেয়েমানুষটাকে চোখের সামনে থেকে দূর করতে পারলেই মহব্বত শান্তি পাবে।

বিয়ে করার পর থেকেই মহব্বতের সহ্য হতো না জুলেখার নড়নচড়ন। মনে মনে তাকে তালাক দিত সারা দিন। বরং জুলেখার দুর্ঘটনা তাকে বিরাট একটা সুযোগ দিয়ে দিল তালাক দেওয়ার। এমন সুযোগ জীবনে সে আর পাবে না। ভালো ভালোয় শুভ কাজটি সেরে ফেলতে পারলে মহব্বতের প্রাণ জুড়োবে।

জুলেখা জানতো যে সে অসহায় অবস্থায় পড়লে সুরঞ্জন কেটে পড়বে। পুরুষরা তো এটাই বেশ ভালো জানে, বিপদ বাঁধানো, আর বিপদ দেখলে কেটে পড়া। সুরঞ্জনের অমন ব্যাকুলতা, সব ফেলে তার কাছে ছুটে ছুটে আসা, জুলেখাকে আনন্দ দিয়েছে অনেক। এই অশান্তির সংসারে সুরঞ্জনই তার সবচেয়ে বড় আনন্দ। জুলেখার এই আশঙ্কটি সত্যি হয়নি। সুরঞ্জন পালায়নি। যেদিন মহব্বত তালাক বলে দিল, শুধু তালাকই বলে দিল, সুরঞ্জনের ওপর হাত তোলেনি, জুলেখাকেও স্পর্শ করেনি, জুলেখা কাঁদেনি। শুধু পাথরের মতো বসে ছিল। সুরঞ্জনকে সে বলেছে বেরিয়ে যেতে। এক পাও সুরঞ্জন নড়েনি। সোহাগকে নিয়ে সে সেদিনই বেরিয়ে যাবে কিনা, ভাবছিল। ভাবনাগুলো তালগোল পাকিয়ে তাকে শূন্যের মধ্যে পাক খাওয়াচ্ছিল সারাক্ষণ।

আশেপাশের বাড়ির লোকেরা কেউ জানলো না কী ঘটে গেছে এ বাড়িতে। বিয়ে হয়ে বাড়িটিতে আসার পর থেকে পাড়া-পড়শি থেকে দূরেই থেকেছে জুলেখা। কারও বাড়িতে তেমন যাওয়া আসা নেই। বাড়িটিতে একাই ছিল। মহব্বতের আত্মীয়স্বজন সব থাকে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে। মাঝে মাঝে জঙ্গিপুর থেকে লোক আসে। মহব্বত মাসান্তে যায়। বউ-বাচ্চা কখনও নেয়, কখনও একাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তালাক দিয়ে জুলেখাকে বাড়ি থেকে এক কাপড়ে বেরিয়ে যেতে আদেশ করেছে মহব্বত। বলে দিয়েছে সোহাগকে সে পাবে না। সোহাগের খোঁজ যেন সে না করে। এক কাপড়েই জুলেখা বেরিয়েছিল, সুরঞ্জন ছিল পাশে। তাকে নিয়ে বেরিয়েছিল ছ বছরের সংসার ছেড়ে।

জুলেখা সিউড়ি কলেজ থেকে পাস করা মেয়ে। অবশ্য তার এই পাসের মর্যাদা কেউই দেয়নি। নিজের চেষ্টাতেই সে পড়েছে। পাস করেছে। রবিউল ইসলাম নামের একজন শিক্ষক প্রেরণা দিতেন ভালো পড়াশোনা করে বড় হওয়ার জন্য। দেখা হলেই বলতেন,— মেয়েদের জীবনে পড়াশোনার দাম সবচেয়ে বেশি। তুমি যদি আজ শিক্ষিত হও, কোনও না কোনও কাজে তোমার শিক্ষাটাকে কাজে লাগাতে পারবে। জ্ঞান কখনও ওয়েস্ট হয় না। বলতেন, তোমার মাথাটা খুব ভালো। পড়াশোনা করলে তুমি অনেক বড় হবে।

বড় হওয়া জুলেখার হয়নি। মহব্বতের টাকা-পয়সা ছিল বলে সংসারে বাঁদিগিরি করতে হয়নি। কিন্তু ওই সংসারকে নিজের বলে কোনও দিন মনে হয়নি তার। মহব্বত তার বিএ পাস নিয়ে কোনও দিন কিছু জানতে চায়নি। জুলেখার অনেক গুণ আছে, কিন্তু মেয়ে হিসেবে তার সবচেয়ে বদগুণ ছিল ওই বিএ পাসটিই।

শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তার কলেজ পাস করার গুণকে কখনও ভালো চোখে দেখেনি। মহব্বত নিজে আইএ পর্যন্ত পড়েছে। বউ-এর বিএ তার কাছে কাঁটার মতো। নিজের টাকা রোজগারের নেশা, জঙ্গিপুরের বাপ-দাদার কাঠের ব্যবসা ছেড়ে এক বন্ধুর পরামর্শে কলকাতায় হুট করে বাসনপত্রের ব্যবসায় নামলো। কাঠের ব্যবসার ভার বড় ভাইয়ের কাঁধে দিয়েছে। মহব্বতের জীবনে এক টাকা করা ছাড়া তেমন কোনও সাধ-স্বপ্ন নেই। বিয়ে করে ঘরে বউ আনা মানে ঘরের কাজকম্ম করার দাসী আনা। ছেলেপুলে হলে বুড়ো বয়সে তারাই দেখবে। মহব্বত নামাজ-রোজা, ধর্ম-কর্মে মন কোনও দিন দেয়নি। মহব্বতকে মাসে সমাজের চাপে পড়ে উপোস থাকতে হয়, আর দুই ঈদে নিজের জন্য না হলেও অন্যের জন্য ঈদের নামাজটা পড়তে হয়। মদ-সিগারেট খায় না। নেশার মধ্যে এক পানের নেশা।

জুলেখা পাস করার পর সম্বন্ধ এলো, কলকাতায় ব্যবসা আছে, জঙ্গিপুরে বাড়ি আছে, স্বভাব-চরিত্র ভালো। দেরি না করে জুলেখাকে তার বাবা এবং আত্মীয়স্বজনরা বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। মা মরা মেয়ে বলে বাবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু আদর-যত্ন করতেন, কিন্তু নিজে পঙ্গু বলে মেয়েকে পার করার দুশ্চিন্তায় তিনি মগ্ন থাকতেন। পার হয়ে মেয়ে বাবার দুশ্চিন্তাকে নিজের ঘাড়ে নিয়ে বাবাকে অন্তত এ থেকে মুক্তি দিয়েছে। তার কি এ শহরে চাকরি একটা জুটবে না?

এখনও চাকরির একটা চেষ্টা করছে সে। চাকরির চেষ্টা ওদিকে সুরঞ্জনও করছে। তবে চাকরি পাক বা না পাক, বেলঘরিয়ার নন্দননগর ছেড়ে এই পার্ক সার্কাসে তো এসেছে। চাকরি পাওয়ার চেয়ে কিছু কম প্রাপ্তি এটা নয়। সুরঞ্জন বলেছে আপাতত দুজনই টিউশনি দিয়ে চালাক, পরে কিছু একটা নিশ্চয়ই জুটবে। সুরঞ্জনের মতো উদাসীন থাকতে চায় না জুলেখা। কিছু একটা, ছোট হলেও করতে চায়। টিউশনি তার পোষাবে না। কদিন ঘোরাঘুরি করে আইনক্সের শপার্স স্টপে সেলস গার্লের চাকরিটা পেল। কেউ বুঝলোই না জুলেখা এক বাচ্চার মা। ভাবলো বিয়েই বুঝি হয়নি। সুরঞ্জন পছন্দ করে না চাকরিটা। বলে— তোমাদের খাটিয়ে মারে। অথচ পয়সা দেয় না। এত কম পয়সায় কারও চলে। জুলেখা যা উপার্জন করে, বেশিরভাগই ঢেলে দেয় মামার সংসারে। দিতে হয়। হাতে সামান্য যা থাকে, তা দিয়ে বাচ্চার জন্য কিছু কেনাকাটা। আর সুরঞ্জনের কাছে যখন সে আসে, খালি হাতে। নিঃস্ব। সুরঞ্জন বলে,— এই ভালো। তোমারও কিছু নেই। আমারও নেই। আমাদের মধ্যে কেউ বড়, কেউ ছোট নয়। আমাদের মধ্যে তাই কোনও বৈষম্য নেই।

জুলেখার মামার বাড়িতে সুরঞ্জন পারতপক্ষে যায় না, যেতে চায় না। সে যখন এসে গেছে কাছে। জুলেখার জন্য আসা। জুলেখাই যেন যখন খুশি চলে আসে জাননগরের বাড়িতে। সুরঞ্জন না থাকলেও কিরণময়ী আছেন।

মামার বাড়ির গল্প জুলেখা খুব একটা করে না। খুব যে ওখানে সুখে আছে সে তা সুরঞ্জন মনে করে না। তার সুখ একটাই, সোহাগ তার বাবাকে ফাঁকি দিয়ে জুলেখার সঙ্গে দেখা করতে আসে। জুলেখা সোহাগের জন্য চকলেট, বিস্কুট, জুতো, জামা, খেলনা কিনে রাখে। এলেই দেয় হাতে। জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। স্কুল কেমন চলছে, বাবা আদর করছে কিনা, নতুন মা কেমন, দেখাশোনা করছে কিনা এসব জিজ্ঞেস করে। সোহাগ সব কিছুতেই মাথা নাড়ে। এই ছোটবেলাতেই সোহাগকে এই নিষ্ঠুর বাস্তবতা মেনে নিতে হচ্ছে যে সে তার নিজের মার সঙ্গে বাস করতে পারবে না।

জুলেখার নিজের জন্য নয়, কষ্ট যদি হয় কারও জন্য, সে সোহাগের জন্য। সোহাগের জন্য টানটা নাড়ির টান। আর সারা দেহে-মনে যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোহাগ চায় জুলেখা, সে সুরঞ্জনের। সুরঞ্জনকে তত দিন সফিকুল বলেই পাড়ার অতি কৌতূহলী পড়শিরা জানতো।

এমনকি মামার বাড়িতেও বীরভূমের তুতো ভাই বলে চালিয়েছিল কদিন। কিন্তু ও বাড়িতে জুলেখার জন্য আলাদা কোনও ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়নি যে ওখানে তুতো ভাইকে নিয়ে একটু সময় একা থাকবে। মাটিতে বিছানা করে সে মামি আর মামাতো বোনরা যে ঘরে থাকে, সেই ঘরে শোয়। ও বাড়িতে সুরঞ্জনকে ডাকলে মামার ঘরে বসিয়ে চা-বিস্কুট খাইয়ে বিদায় দেওয়া ছাড়া গতি নেই।

মামার মাংসের দোকান আছে ভবানীপুরে। অসচ্ছল নয় সংসার। কিন্তু খরচ করার তেমন অভ্যেস না থাকলে যা হয়, জীবনযাপনের মান খুব নিচুতে রয়ে যায়। জুলেখার বাপের বাড়িতে যে সচ্ছলতার ঢল নেমেছিল তা নয়, কিন্তু সে যে কোনও বিত্তেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে।

কলেজের ধনী মেয়েদের বাড়িতে সে গিয়েছে, থেকেছে। আড়ষ্টতা ধীরে ধীরে কেটে গেছে। শিক্ষক রবিউল ইসলামের ধর্ম আর কুসংস্কারহীন জীবন, তাঁর অত্যন্ত সভ্য আচার-আচরণ, তাঁর রুচি সংস্কৃতি জুলেখাকে প্রভাবিত করেছে কলেজ জীবনের দীর্ঘ চারটি বছর।

সুরঞ্জনকে তার মানুষ বলে মনে হয়। স্রেফ একটা হিন্দু ছেলে বলে মনে হয় না। আর বিশেষ করে সেদিন ওই ধর্ষণের ঘটনার দিন সুরঞ্জন কী করে যে বাধা দিতে চাইছিল, কী করে সে জুলেখাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে মার খেল, না, জুলেখার জীবনে এমন নাটকও কোনো দিন হয়নি, এমন অবিশ্বাস্য ঘটনাও ঘটেনি, যে, কোনও ধর্ষক পুরুষের চোখে জল জমেছে তারই হাতের মুঠোয় তারই শিকারের জন্য মায়ায়। এই মায়া, এই চোখের জল, জুলেখার বিশ্বাস, না মুসলিম না হিন্দু কোনও সম্প্রদায়ে পাবে না সে। এই সম্প্রদায় আলাদা সম্প্রদায়, তারা জাত ধর্মের অনেক ওপরে।

নিষ্ঠুরতা দেখে দেখে অভ্যস্ত জুলেখা। ছ বছর ধরে মহব্বতের কঠোর কঠিন মুখ দেখছে সে। কোনও দিন দু'জনে একসঙ্গে বেড়াতে যায়নি। গেছে যদি সে কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে হঠাৎ কোনও প্রয়োজনে। নয়তো জঙ্গিপুরে। বাড়িতে কোনও বন্ধুবান্ধবের আড্ডা, কোনও আত্মীয় স্বজনের ভিড় কিছু হয়নি। মহব্বতের ইচ্ছে কলকাতায় খেটে ব্যবসা করে টাকা কামিয়ে বউ-বাচ্চা নিয়ে একসময় জঙ্গিপুরে চলে যাবে। পুরনো কাঠের ব্যবসায় নামবে, নয়তো আসবাবপত্রের দোকান দেবে। বরং ভালোবাসারই কাঙাল ছিল সে। সে সন্ধ্যেয় জুলেখার সাতাশ বছরের আগুনকে সুরঞ্জন তার সাঁইত্রিশ বছরের জলে নিভিয়ে বলে,— কে এসেছিল জানো তো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কে?

— ওই ভদ্রমহিলাকে চেনো না?

— না তো।

— নিশ্চয়ই চেনো।

— উহু! জুলেখা মাথা নাড়ে। সে মনে করতে পারছে না।

— তসলিমা নাসরিন।

সুরঞ্জন একটা সিগারেট ধরিয়ে মাথাটা খাটের রেলিংয়ে রেখে বলে। জুলেখা সুরঞ্জনের হাতের সিগারেটের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয়। তার সহ্য হয় না সিগারেটের গন্ধ।

— পড়োনি তার বই?

— অনেক আগে পড়েছিলাম। স্কুলে থাকাকালীন। নির্বাচিত কলাম।

— 'লজ্জা' পড়োনি?

— নাহ।

— বলো কী?

— কেন?

— 'লজ্জা' তো প্রায় সবাই পড়েছে বোধহয়। তুমি ছাড়া।

জুলেখা জোরে হেসে ওঠে।

— তো ওই লেখিকা তোমার বাড়িতে কেন?

— দেশেই চেনা ছিল।

— দেশতুতো।

- হ্যাঁ। জুলেখার গালে একটা চুমু খেয়ে বলে, তুমি যেমন পাড়াতুতো।

— হুম।

জুলেখা কখনও বলে না যে মামার বাড়িতে থাকার বদলে সুরঞ্জনের বাড়ি এসে থাকতে সে পারে। সুরঞ্জনও বলে না জুলেখাকে একসঙ্গে বাস করার কথা। ভেতরে প্রত্যাশা ছিল অনেক দিন। সে ভেবেছে, সুরঞ্জন নিজেই একদিন বলবে যে, এত জ্বালা কী করে সইছো, এ বাড়ি ছেড়ে আমার বাড়ি চলে এসো, চলো দুজন এক বাড়িতে একসঙ্গে থাকি। মনে যদি মেলে, শরীরে যদি মেলে, তবে দুজন একসঙ্গে না থেকে আলাদা থাকার কী অর্থ জুলেখা জানে না। কোথায় সুরঞ্জনের অসুবিধে। জুলেখা জিজ্ঞেসও করে না অসুবিধেটি কোথায়। জুলেখা একটা জিনিস এখন আর করে না, সে হলো প্রত্যাশা। প্রত্যাশা না থাকলে যা কিছুই সে পেয়ে যায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচণ্ড ভালো লাগা থাকে তাতে। সুরঞ্জন যেদিন বলবে চলে এসো, সেদিন সে চলে আসবে, এক মুহূর্ত দেরি করবে না।

সুরঞ্জন কেন বলছে না জুলেখাকে চলে আসতে! সুরঞ্জন কি নিজে জানে! বেলঘরিয়া ছেড়ে এসে এই পার্ক সার্কাসে সে কি থাকছে শুধু প্রেম করার জন্য! ভেতরে কোনও স্বপ্ন নেই? ভেতরটা কেমন ফাঁকা লাগে তার। জুলেখার জন্য তার মায়া হয়, করুণা হয়, ভালোওবাসে মেয়েটাকে। কী নিরীহ নিষ্পাপ, কী সৎ আর শক্ত মেয়েটি। সুদেষ্ণা যদি এমন হতো।

সুদেষ্ণার সঙ্গে তো প্রেম করেই বিয়ে হয়েছিল। জুলেখার প্রতি মূলত একটা অপরাধবোধ কাজ করেছে তার। ভয়াবহ একটা অপরাধবোধ। সেই অপরাধবোধ থেকে করুণা। করুণা থেকে কী রকম একটা মায়া পড়ে যাওয়া। মায়ার জন্য যেমন একটা মায়া সুরঞ্জনের সব সময় আছে, সে রকম। জুলেখার সঙ্গে শরীর বিনিময় করে সে। না, কেবল শরীরের জন্যই নয়। মন থাকে ওতে। কিন্তু জুলেখাকে হঠাৎ বিয়ে করে ঘরে তোলা, ওই এক চিলতে ঘরে, এ ঠিক সুরঞ্জন ভেতর থেকে মেনে নিতে পারে না।

পাড়ায় তার মুসলমান বন্ধুদের একটা দল আছে, দলটা ভারী হচ্ছে, সেখানে জুলেখাকে বিয়ে করতে চাইলে ঠিক কী অবস্থায় পড়তে হবে, সুরঞ্জন জানে না, তার ভয় হয়। হ্যাঁ, সুরঞ্জনের ভয় হয়। তার আগের সেই সাহস, সে লক্ষ করে, নেই আর। সাহসের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তার ভেতরে, তা ওই সেদিনই সে দেখিয়েছে। অচিন্ত্যদের হাত থেকে একটা মেয়েকে বাঁচিয়েছে। অবশ্য বাঁচানোই বা কি একে বলে? চার চারটি পুরুষ তো ধর্ষণ করেইছে, ওদের তো বাধা সুরঞ্জন দেয়নি। প্রথম থেকে তো বাধা সে দিতে চেষ্টা করেনি। বরং প্রথম ধর্ষণটা সে নিজেই করবে বলে আশা করেছিল।

জুলেখার পরিণতির জন্য সুরঞ্জন একশ ভাগ দায়ী। অপহরণ। তালাক। মামার মেঝের জীবন। দিন-রাত্তির অপেক্ষা আর অবজ্ঞার জীবন। মহব্বতের বাড়িতে অন্তত একটা অধিকার ছিল, স্ত্রীর অধিকার। স্বামীর অধিকারের তুলনায় তা অনেক কম যদিও। আর সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা যেটা ছিল, সেটা সোহাগ। সোহাগকে তার পাওয়া হতো। সুরঞ্জনের কারণে ধর্ষিতা হওয়া আর তালাক পাওয়ার চেয়ে সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি জুলেখার হয়েছে, সে হলো সোহাগকে হারানো।

সুরঞ্জন হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে জামাকাপড় পরতে পরতে জুলেখাকে বলে— তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— কোথায় যাবে?

— তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাবো এক বন্ধুর বাড়িতে। খুব দরকার।

— কোন বন্ধু?

— তুমি চিনবে না।

— না, বলো, দেখি চিনি কিনা।

— তুমি তো বলেছিল আজ আর কারও বাড়িতে যাবে না।

— যাব না বলেছিলাম, কিন্তু যেতে হবেই।

— কার বাড়িতে? আমজাদের?

সুরঞ্জন কথা বলে না। জুলেখার মুখখানা খুব বিষণ্ন দেখায়। তার ধারণা সুরঞ্জন কোনও বন্ধুর বাড়ি যাবে না। অন্য কোথাও যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরঞ্জনের জীবন রহস্যময়। কিরণময়ী নয়। সাধারণত রহস্য বোধহয় পুরুষেরই বেশি, নারীর জীবন আরেক নারী বেশ পড়ে নিতে পারে। আমার জীবনভর তাই হয়েছে, পুরুষ চেনা আমার কোনও দিন সম্ভব হয়নি। সুরঞ্জনকে যত আমি জানতে চাই, তত ধাক্কা খেয়ে ফেরত আসি।

কিরণময়ী যত্ন করে আমাকে খাইয়েছেন। চোখের জল ফেলেছেন। কী রকম মায়ের মতো মা মা ডেকে কথা বলেছেন। মা হওয়ার সাধ্য তো কারও নেই। কিন্তু ওই যে মা ডাকটা, তাই বা কজন ডাকে? ওই ডাকটির জন্য এবং যেহেতু সুধাময়ের মৃত্যুর পর অভাব এসে বসেছে ঘরে, তাই তরুণকে দিয়ে একটি খাম পাঠাই কিরণময়ীকে উপহার হিসেবে দিয়ে আসার জন্য, খামের ভেতর দশ হাজার টাকা। তরুণ দিয়ে আসে। সেই খামটি সুরঞ্জন রাত এগারোটায় আমার বাড়িতে ফেরত নিয়ে আসে। দরজা খুললেই সে আমার হাতের দিকে খামটি এগিয়ে দিয়ে বলে,— এটা আপনি ভুল করে পাঠিয়েছিলেন।

তাকে ডাকি ভেতরে আসার জন্য। ভেতরে সে ঢোকে এক মুখ মদের গন্ধ নিয়ে। খামটি হাতে দিয়ে বলে— নিজেকে ছোট করবেন না।

আমার কণ্ঠে বিরক্তি।

— নিজেকে ছোট? নিজেকে ছোট আবার কী করে করলাম? একটা গিফট দিতে পারি না?

— না। এত টাকা আপনি গিফট দিতে পারেন না। আমাদের চলছে সংসার। আপনার সংসারের মতো এত ভালোভাবে না চললেও চলছে। আমরা বানের জলে ভেসে যাচ্ছি না। মাথা গোঁজার ঠাঁই আছে।

তা ঠিক। সুরঞ্জনরা যেভাবে বেঁচে আছে, ভারতবর্ষে লক্ষ পরিবার এভাবেই বেঁচে থাকে। শুধু তাই নয়, এর চেয়ে অনেক খারাপ অবস্থায় মানুষ থাকছে। টাকাটা ফেরত দেওয়ার অর্থ আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, এসবের কাঙাল তারা নয়। গোপনে একটি শ্রদ্ধা জাগে কিরণময়ী এবং সুরঞ্জনের জন্য। টাকাটা নিলে যে অশ্রদ্ধা জাগতো তা নয়, নিলে মনে হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারতো আমাকে আপন ভেবেই নিয়েছে, কখনও যদি অবস্থার পরিবর্তন হয়, হয়তো শোধ দিয়ে দেবে। আমি ফেরত চাই না টাকা। কী জানি, কাউকে ঋণী করে রাখতে বোধহয় ভালো লাগে। আমি দেখেছি, কারও কাছে কিছুর জন্য ঋণী হলে আমার অসম্ভব অস্বস্তি হয়। যতক্ষণ না তাকে ঋণী করছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। বোধহয় আমার মাথা উঁচু করে চলার পক্ষে অন্যকে আমার কাছে ঋণী করে রাখা এবং নিজে কারও কাছে ঋণী না হওয়াটা একটা কৌশল। অবচেতন মনে এই কৌশল কি আমি খাটিয়ে যাচ্ছি? হয়তো। অথবা হয়তো নয়। নিজেকে আমি চাক চাক করে ধারালো ছুরিতে কাটি। আবার নিজের ওপরই মায়া করে ছুরিটা সরিয়ে নিই। ছুরি সরিয়ে নিয়েই সুরঞ্জনকে বললাম—

— বোসো।

— না। সুরঞ্জনের উত্তর।

— আরে বোসোই না কিছুক্ষণ।

অগত্যা সে বসে।

— শুধু মদই, নাকি খাবারও কিছু খেয়েছো?

— খাইনি।

— খেয়ে যাও।

— না।

— কেন?

— বাড়ি গিয়ে খাবো।

— এত রাতে তোমার মাকে উঠে তো ভাত দিতে হবে।

— প্রতিরাতেই তো হয়।

— চমৎকার কাজটা করো একজন বয়স্ক মানুষকে খাটিয়ে মেরে।

— এ করে তিনি যদি আনন্দ পান।

— আনন্দের বেশি কিছু না থাকলে অবশ্য এসবেই আনন্দ পায় মানুষ। এখানে খেয়ে যাও।

— মার কথা বলছেন কেন? নিজেও কি কম যান নাকি? আমাকে খাইয়ে মনে হচ্ছে আপনি প্রভূত আনন্দ লাভ করবেন।

আমি জোরে হেসে উঠি। সুরঞ্জনও হাসে। হাসতে হাসতে বলে— ভাত খাবো না, হুইস্কি থাকলে খেতে পারি।

আমি নিজে হুইস্কি খাই না। বন্ধুদের কেউ কেউ খায় বলে রাখতে হয়। ব্ল্যাক লেবেলের একটা বোতল সুরঞ্জনের হাতে দিয়ে বলি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— নিজে ঢেলে নাও।

সুজাতা গ্লাস-জল সব দিয়ে যায়। সুরঞ্জন বলে— এর চেয়ে কম দামি কিছু নেই? এসব খেয়ে আমি অভ্যস্ত নই।

— ভালো জিনিস খেতে ইচ্ছে করে না? অত বিপ্লবীর ভান করো না, বুঝলে! খারাপ জিনিস খাবো, খারাপ পোশাক পরবো, বস্তিতে থাকবো, চাকরি করবো না, প্রতিষ্ঠানবিরোধী হব, অ্যানার্কিস্ট হব, তাহলেই বেশ একটা আদর্শবাদী বিপ্লবী হয়ে যাওয়া যায়। অত সহজ!

— খারাপ জিনিস খাওয়া, খারাপ জায়গায় থাকা আপনি যত সহজ ভাবছেন, তত সহজ নয় কিন্তু। এই গরমে ফ্যান ছাড়া এসি ছাড়া থাকতে পারবেন, হাজার হাজার মানুষ যেভাবে থাকছে? খেতে পারবেন দুবেলা শুধু শাক-ভাত!

— শাক আমি খুব পছন্দ করি। শাক কে বলেছে খারাপ খাবার?

— মাছ-মাংস খান বলে শাক ভালো লাগে। নিউট্রিশন ভিটামিন আছে বলে এসব তো এখন বড়লোকের খাবার। ছোট মাছের দিকে ঝুঁকে ছোট মাছের দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন। আচ্ছা, খাবারের মধ্যে কী পছন্দ করেন না, বলুন তো?

— মানে?

— মানে কোন খাবারটা পছন্দ করেন না?

— করল্লা।

— খেতে পারবেন এভরিডে করল্লা দিয়ে ভাত?

— শোনো, আমি ভালো খাবার খাই, ভালো জায়গায় থাকি বলে কিন্তু এটা মানে নয় যে যারা খেতে পায় না, অথবা স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং যাদের লো, তাদের আমি অপমান করছি। আমি চাই সবার স্ট্যান্ডার্ডটা বাড়ুক। সবাই সচ্ছল হোক।

— সে তো চমৎকার আরামে-আয়েশে থেকে বলাই যায়। বলার মতো সহজ কিছু নেই। সবাই যদি আপনার মতো অবস্থায় চলে আসে, আপনার ভালো লাগবে না। কারণ আরামটা আপনার হবে না। আপনার ঘরের কাজ করার জন্য দাসী পাবেন না। আপনার গাছে জল দেওয়ার মালি পাবেন না। গাড়ি চালানোর ড্রাইভার পাবেন না।

— পেলেই তো অভ্যেস খারাপ হয়। না পাওয়ার ব্যবস্থা করো। এসব তো তোমার কমিউনিজমের কথা। তুমি তো এসবে বিশ্বাস করতে। এ দেশের কমিউনিস্ট দলে নাম লেখাওনি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— নাহ্।

— কেন?

— কমিউনিজম পৃথিবীর কোথাও নেই। এরা পুঁজিবাদীর চেয়েও বড় পুঁজিবাদী।

— এভুলুশন তো সবকিছুরই আছে।

সুরঞ্জন হেসে বলে,— এটা তো একটা এক্সকিউজ। যুগের সাথে তাল মেলানোর নাম করে বড়লোকের স্বার্থ দেখা।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে পরিবেশ। হঠাৎ প্রশ্ন করি,— সুরঞ্জন, তুমি কি প্রায়শ্চিত্ত করছো?

— না।

— তবে কী করছো?

— প্রায়শ্চিত্ত করছি না।

— জুলেখার সঙ্গে কী করছো তুমি?

সুরঞ্জন চুপ।

— ওকে তো ভালোবাসো না। ভালো তো ওকে তুমি বাসো না। শুধু শুধু মেয়েটার জীবনটা নষ্ট করছো কেন?

— বাসি না, কে বললো?

— বাসো না।

সুরঞ্জন দাঁতে দাঁত চেপে ক্রুদ্ধ চোখে তাকালো আমার দিকে।— বাসি না কে বললো?

— জুলেখাকে তুমি ভালোবাসো, সুরঞ্জন? আমি জোরে হেসে উঠি।

সুরঞ্জনের কপালে অনেকগুলো ভাঁজ।

— একটা মুসলমান মেয়েকে তুমি ভালোবাসো?

— বাসি।

— বিশ্বাস হচ্ছে না।

— বিশ্বাস কেন হচ্ছে না?

— কারণ...

— কারণ তুমি তো মুসলমানদের ঘৃণা করো। এই তো!

— হ্যাঁ।

— জীবনটা এত ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট নয়, তসলিমা।

কখনও আমাকে তসলিমা বলে সম্বোধন করেনি সুরঞ্জন। এই প্রথম। আগে তো তসলিমাদি বলে ডাকতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— তসলিমা, আপনি হঠাৎ মুসলমানদের প্রতি এত দরদি হয়ে উঠলেন কেন? কোনও দিন তো দরদি ছিলেন না। 'লজ্জা'র পাতা ভরে বর্ণনা করেছেন হিন্দুর ওপর মুসলমানের অত্যাচার।

— যা সত্য তাই বলেছি।

— হ্যাঁ বলেছেন। এখানকার সত্য চোখে দেখেন না কেন? নাকি দেখেও দেখতে চান না?

— কী বোঝাতে চাইছো?

— যা বোঝাতে চাইছি, তা খুব ভালো বুঝতে পারছেন।

— না। আরও একটু বুঝিয়ে বলো। তুমি কি বলতে চাইছো এখানকার সত্য হলো বাংলাদেশের উল্টো? মুসলমানের ওপর হিন্দুর অত্যাচার? নাহ, আমি এ রকম কিছু নিজের চোখে দেখিনি। মুসলমানের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করে না বলে এখানকার হিন্দুরা মুসলমান এবং ইসলাম সম্পর্কে ততটা জানে না। হ্যাঁ, গুজরাটে মুসলমানের ওপর অত্যাচার হয়েছে। হিন্দুরাই তো প্রতিবাদ করেছে সবচেয়ে বেশি। আমিও করেছি।

— সে তো না করলে ইন্টেলেকচুয়াল হওয়া যায় না বলে করেছেন।

— বাজে কথা বলো না সুরঞ্জন। কেউ হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রিস্টান হোক— আমার কাছে সে মানুষ। মানুষ, এই পরিচয়টিই আমি জানি। অন্য পরিচয় না। মানুষের মধ্যে মন্দ-ভালো থাকে। কেউ রক্ষণশীল, কেউ নয়। কেউ মৌলবাদী মন মানসিকতার, কেউ সেক্যুলার। কেউ...

আমার কথা শেষ হতে দেয় না সুরঞ্জন। বলে,— বাড়ি থেকে একটু বেরিয়েছেন ওই সব বস্তির দিকে। কীভাবে জীবন যাপন করে ওরা?

— কারা?

— মুসলমানরা।

— বস্তিতে হিন্দুরা নেই? দারিদ্র্য ভোগ হিন্দুরা করছে না? কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র। ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে বিস্তর ফারাক। এগুলো রাজনৈতিক চক্রান্ত। হিন্দু-মুসলমানের ব্যাপার নয়। মুসলমানরা ধনী হয় না? ভারতবর্ষে কত ধনী মুসলমান আছে, জানো? বলতে পারো, মুসলমানরা তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে এখন তারা যদি ধর্মকে আইন বানিয়ে বসে থাকে, মাদ্রাসা বানিয়ে ওতে পড়তে যায়, যদি সত্যিকার বিজ্ঞান শিক্ষাটা না নেয়, মেয়েদের বোরখার মধ্যে পুরে রাখে, স্বনির্ভর হতে বাধা দেয় তবে সমাজটার উন্নতি কী করে হবে বলো? অর্থনৈতিক, মানসিক কিছুরই উন্নতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়া সম্ভব নয়। আমি তো একটা দলও করেছি, ধর্মমুক্ত মানববাদী মঞ্চ। এই মঞ্চে মুসলমান পরিবারে জন্ম, কিন্তু নাস্তিক, তাদের জড়ো করা হয়েছে ধর্মীয় আইনের বিলুপ্তি করে সমানাধিকারের ভিত্তিতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, ধর্মমুক্ত সমাজ, ধর্মমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা, মানবাধিকার, নারীর অধিকার এসব বিষয়ে লড়াই করার জন্য। পিছিয়ে থাকা মানুষের প্রতি যদি সত্যিই সহানুভূতি থাকে, তবে এগুলো করা উচিত। দারিদ্র্য দেখে চোখের জল ফেলে ওদের জন্য সত্যিকার কিছু করা হয় না। ফালতু।

সুরঞ্জন দেখি মন দিয়ে শুনছে যা বলছি। একটি সিগারেটও ধরিয়েছে। আমার ফ্ল্যাটে সিগারেট খাওয়া বারণ, সুতরাং খেলে বারান্দায় যাও, ওখানে ব্যাঙের মুখ আছে ছাইদানি, ওতে ছাই ফেলো। এ রকম বলে দিই।

বারান্দা ভাসছে হাস্নাহেনা ফুলের ঘ্রাণে। সুরঞ্জন হুইস্কি খেয়ে যাচ্ছে। আমি না হুইস্কি, না সিগারেট। সিগারেটের কবল থেকে বেরিয়েছি বলে মুক্তির স্বাদ পাই।

— আচ্ছা, সুরঞ্জন, তুমি না একটা হিন্দু মৌলবাদী ছিলে?

— ছিলাম। ভীষণভাবে ছিলাম। তা-ই থাকিতে চেয়েছিলাম।

— তারপর কী হলো?

— জানি না কী হলো?

— নিশ্চয়ই জানো। কেউ কি জানে না তার ভেতরে কী হয়?

— হ্যাঁ, এ রকম হতে পারে যে, জানে না।

— তুমি কি মৌলবাদী নও?

— জানি না।

— বাজে কথা বলো না। হ্যাঁ কি না, ঠিক করে বলো।

— আমি তো বলছিই, যে, জানি না।

— না, এ রকম হতে পারে না। মানুষ আর কারও সম্পর্কে না জানুক, নিজের সম্পর্কে জানে।

— আমি তো জানি না।

— তুমি কনফিউজড?

— হয়তো।

— কলকাতায় এত এলাকা থাকতে তোমার পার্ক সার্কাসে থাকার কী কারণ, বলো তো।

সুরঞ্জন ওই আলো-আঁধার বারান্দায় আমার চোখে স্থির চোখ রেখে বললো— জুলেখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— জুলেখা?

— হ্যাঁ, জুলেখা।

সুরঞ্জন তার হাতের সিগারেটটা শেষ হলে চলে যায়। আমাকে ওখানেই স্তম্ভিত করে রেখে সে দরজা খুলে বেরোয়। আমি অনেকক্ষণ বসে থাকি, যেখানে বসেছিলাম। সামনে খাম, খামের ভেতর ফিরিয়ে দেওয়া দশ হাজার টাকা। আমার কেমন যেন একা লাগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতই সে মামার বাড়িতে মাথা গুঁজে লুকিয়ে থাকুক না কেন, ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে আত্মীয়রা ছিল দেশে, যারা বিয়েতেও আসেনি, বিয়ের পর খবরও নেয়নি একদিন, সব একেবারে আচমকা উদয় হয়ে ছিছিকারে মেতে উঠলো। জুলেখার আত্মীয় তারা, কাকা-কাকি, মামা-মামি, খালা-খালু, ফুপু-ফুপা কেউ বাদ যাচ্ছে না, এমনকি তাদের ছেলেমেয়েরাও ছিছি, এ কী করলো জুলেখা। বংশের মুখে চুনকালি দিল। জুলেখা এর আগে বংশ গৌরবের এত কথা শোনেনি। তার বংশ নিয়ে যে গৌরব করার কিছু আছে, সে জানতো না। আশ্চর্য, কেউ মহব্বতের নিন্দা করছে না, সবাই জুলেখার নিন্দা করছে। জুলেখাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ইজ্জত নষ্ট করেছে, তার পরও মহব্বতের মহব্বত কত বেশি থাকলে তালাক দেয়নি, তারপর কিনা বাড়িতে এক হিন্দু ছেলে এনে রেষ্টিনষ্টি করছে। মামা জায়গা দিয়েছে বটে, তবে দিন-রাতই বলছে, অসম্ভব, পাড়ায় আমার থাকা যাবে না। এ মেয়ের নাহয় লজ্জা শরম নেই। আমার তো আছে! পাড়ায় কসাই মামার এত যে সুনাম তাও জুলেখা জানতো না।

জুলেখার জ্বালা ওই বিএ পাসটা। এটা তাকে আশা দেয় যে, সে দুনিয়া তাকে দূর দূর করে তাড়ালেও বাঁচতে পারবে একা। জুলেখার ওই ওটাও জ্বালা, মনটা, যে মনটা মনে করে আমি যদি কোথাও এ শহরে একটা ঘর ভাড়া নিতে চাই আমার জন্য, পারবো না কেন? জুলেখার শিক্ষাটা আর মনটা না থাকলে সে যে কোনও আত্মীয়র বাড়িতে, যে কোনও স্বামীর বাড়িতে, যে কোনও বেশ্যাবাড়িতে নিশ্চিন্তে বাস করতে পারবে। অথবা ময়লা তোলার, মাটি কাটার, রাজমিস্ত্রির জোগালির, আয়ার কাজ সবই করতে পারতো। বিএ পাসটা তাকে বলে, ওসবে যাস না, তুই আরও ভালো কাজ পাবি। বলে বটে, পাওয়াটা তো যায় না। তার ইচ্ছে করে মামার বাড়ির ভর্ৎসনা ত্যাগ করে সে যদি চলে যেতে পারতো, কিন্তু যাবে কোথায়? যাওয়ার কোনও জায়গা থাকলে সে কসাইয়ের বাড়িতে প্রতিদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকে জবাই হতে দিত না, প্রতিদিন ফালি ফালি করে কারও জিভের ছুরিতে নিজের সম্মান কাটতে দিত না কাউকে।

এত সহজে নিজেকে সে মরতে দিতে চায় না। চায় না বলেই গণধর্ষণ সওয়ার সময়ও প্রতিবাদ করেনি। নিজের কোনও দাঁড়াবার কিছু ছিল না বলে, স্বামীর ঠাণ্ডা শীতল অধিকারের ধর্ষণ সে সয়ে গেছে বছরের পর বছর। রুখে ওঠেনি। তাহলে যাবে কোথায়? এই প্রশ্নটা সব সময় তাকে ভয় দেখিয়েছে। যাওয়ার জায়গা উদ্বাস্তু না হলে কেউ খুঁজে বের করে না। রাস্তা হারালেই রাস্তা খুঁজে বের করার তাগিদ মানুষ অনুভব করে। তাই স্বামী ত্যাগ করার পর একটা যেনতেন হলেও আশ্রয় আর চাকরি সে তো জোগাড় করে ফেলতে পেরেছে। তার বাবা পঙ্গু এবং আত্মীয়রা কেউ তেমন তার পরিবারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ নয়। নয় বলেই কেউ আগ বাড়িয়ে সাহায্য করতে অথবা ফেলে দিতে আসেনি। নিরাপদ দূরত্ব থেকেই যা বলার বলেছে।

বড় বোনের শ্বশুরবাড়িতেও সারাদিন ছি ছি হচ্ছে। সুলেখাকে সে ফোন করেছিল, ফোনেই জানায় সুলেখা যে, জুলেখার খবর আর কিছুই চাপা থাকেনি। লোকে ঘেন্না দিচ্ছে তাদের সবে আত্মীয়দের। মুসলমান স্বামীর বাড়িতে বসে কোনও মুসলমান মেয়ের হিন্দু ছেলের সঙ্গে প্রেম করার ইতিহাস গোটা ভারতবর্ষে নেই। মহব্বত নেহাত ভালো লোক বলে কেবল তালাক দিয়েছে, অন্য লোক হলে কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিত।

সুলেখার স্বামী সুলেখাকে উঠতে-বসতে গালাগাল করছে। বলছে, এমন বাজে মেয়ের বোন হয়েছো, তুমিই বা আর কী ভালো হবে। শ্বশুরবাড়ির কলঙ্কের জন্য লোকের কাছে নাকি মুখ দেখাতে পারছে না।

জুলেখা বলে দিয়েছে, আমি আর ফিরব না সিউড়িতে। তোরা বাবার খবরাখবর নিস। ভাবিস যে আমি হারিয়ে গেছি। যায় না মেয়েরা? কত কত মেয়েরা তো গ্রামগঞ্জ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে! অচেনা জায়গায় বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। জুলেখা বুথ থেকে ফোন করছিল আর হাতের পিঠে চোখ মুছছিল।

জুলেখা সুরঞ্জনকে কিছু বলে না দুর্নামের কথা। বলা মানেই ওর ওপর কিছু একটা করার চাপ দেওয়া। পরিবার-আত্মীয়স্বজন-সমাজ— এসব রক্ষা করার একটা উপায়ই এখন আছে, সে হলো সুরঞ্জন যদি মুসলমান হয় এবং দুজন বিয়ে করে। কিন্তু বিয়ে, এই শব্দটাই কখনও সুরঞ্জনের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়নি। যে যে কাজটা করতে আগ্রহী নয়, তাকে সেই কাজ করতে বাধ্য করিয়ে সুখ নিতে জুলেখা পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরঞ্জনকে জুলেখা চেনে একটি সন্ত্রাসী হিসেবে। যে সন্ত্রাসী একটি নিরপরাধ মেয়েকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে কোনও লোকের ওপর শোধ নেয়। এই সুরঞ্জনকে বিয়ের কথা জুলেখাই বা কী করে ভাবতে পারে? আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সুরঞ্জন তার প্রতি আকৃষ্ট। এই আকর্ষণ কি সত্যিই প্রেমে পড়েছে বলে, নাকি অপরাধবোধের কারণে? যদি সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় এভাবে যে তোমাকে আমার কারণে অসহ্য প্রেমহীন সঙ্গম সইতে হয়েছে, সেগুলোর আমি শোধ দেব অসংখ্য প্রেমপূর্ণ সঙ্গমে। তাহলে মধুর একটা প্রায়শ্চিত্ত হয় বৈকি, কিন্তু দুজনের মধ্যে সত্যিকার কোনও সম্পর্ক তৈরি হয় না– না প্রেমের, না বন্ধুত্বের। এমনকি সত্যিকার শত্রুতারও কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠে না।

জুলেখা নিজেকেও মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে, সুরঞ্জনকে সে সত্যিই ভালোবাসে কিনা। সে টের পায় ভালো সে বাসে, কিন্তু তাকে নিয়ে সংশয় তার আছেই, সুরঞ্জনকে সে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস না থাকলে কাউকে ভালোবাসা যায় কি? না বিশ্বাস করেও তো সে ভালোবাসছে। তাহলে যায়। এই ভালোবাসাটি কি কেবলই শরীরের জন্য? জুলেখা তা মনে করে না। কারণ শরীরের হলে মহব্বতের সঙ্গে কখনও সে শীৎকারসুখ পায়নি কেন! যেহেতু মহব্বতকে কোনও দিন মহব্বত করেনি সে। দুজনের মধ্যে একটুখানিও আবেগের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি প্রথম দিন থেকেই।

মহব্বত প্রথম দিন থেকেই জুলেখার কাছে একটা যন্ত্রের মতো। স্বরে কোনও ওঠানামা নেই, মুখে কোনও হাসি নেই। ডাকবে এভাবে, যেন যন্ত্রের মুখের ফুটো দিয়ে কিছু শুধু শব্দ বেরোচ্ছে। এই এদিকে এসো তো বলছি। ডাকছি তো, শুনছো না? শুয়ে পড়ো। শুয়ে পড়লে, মহব্বত শাড়ি পরা জড়সড় জুলেখার শরীরটা কতক্ষণ তাকিয়ে দেখতো, তারপর শাড়ি পরা অবস্থাতেই শাড়িটা ওপরের দিকে তুলে, নিজের লুঙ্গিটা ওপরের দিকে তুলে জিভ লম্বা করে ডান হাতের তেলোয় জিভের লালাটা নিয়ে লালা নিজের শিশ্নের মাথায় লাগিয়ে দিয়ে জোরে ঢুকিয়ে দিত। জুলেখা প্রতি রাতেই কঁকিয়ে উঠেছে। এক-দু-মিনিট ওভাবেই মহব্বত নিজের মনে বাচ্চাদের খেলনাগাড়ি চালাবার মতো ভেতরে নিজের অঙ্গ চালিয়ে গায়ের ওপর থেকে নেমে যেত।

জুলেখা তার মেয়ে হওয়ার প্রায়শ্চিত্ত এভাবেই করতো। সইতো। মেয়ে হলেই ধরে বেঁধে বিয়ে দেওয়া হয় যার তার সঙ্গে, আর যার তার শরীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার ওপর যা ইচ্ছে তাই করে গেলেও মুখে রা টি করা যাবে না। জুলেখা তো এর বাইরে কিছু করতো না।

বিপ্লবী হওয়ার কোনও সাধ যদি তার থাকতো, তাহলে একটা বাসনকোসনের ব্যবসায়ীকে বিয়ে করতে রাজি হতো না। বাবার কাছে প্রস্তাব এসেছে, বাবা তাই নিয়ে জোর করছিলেন। অন্যান্য আত্মীয়রা তখন তো কেউ এসে বলেনি যে, না এই ছেলে যোগ্য নয়। তারা তো পেশায় শিক্ষক, বা ডাক্তার, বা ইঞ্জিনিয়ার এমন কোনও ছেলের প্রস্তাব আনেনি, যদি এতই ওদের যোগ্য পাত্র বলেই মনে করে।

জুলেখা কলেজে কাউকে এমন পায়নি, যার সঙ্গে প্রেম করতে পারে। জুলেখার কলেজে পড়াও হয়তো বন্ধ হয়ে যেত যদি না নলহাটি স্কুলের শিক্ষিকা সুলতানা কবীর তাকে দিনের পর দিন না বোঝাতেন যে, মেয়েদের লেখাপড়া করাটা খুব দরকার, বিশেষ করে মুসলমান মেয়েদের। লেখাপড়া না শিখলে স্কুল-কলেজ না পাস করলে দাসী-বাঁদির জীবনই মেনে নিতে হবে। জুলেখার বাবা মেয়েদের অত লেখাপড়া করার দরকার নেই, 'ভালো ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাওয়াই ভালো' নীতিতে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু নিজের মেয়ে দাসীবাঁদির জীবন কাটাবে তাও তিনি চাইতেন না। সুলতানা কবীরের সঙ্গে তার পরিচয় রবিউল ইসলামের মাধ্যমে।

মাথা উঁচু করে বাঁচার প্রেরণা জুলেখা পেয়েছিল বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। বিয়ে দিয়ে দেওয়া হলো। বিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না মনিরুদ্দিনের। পাড়ার লোকে কথা বলছিল। মেয়ে আইবুড়ো হচ্ছে, বিয়ে দেবে না নাকি? অপেক্ষা তো অনেক করা হলো। আর কত? কোনও ঘটকচূড়ামণির দেখা নেই। কোনও শুভাকাঙ্খীর খোঁজ নেই। তাই মহব্বতের প্রস্তাব এলে বড় বোনের স্বামী মাথা নাড়লো– বর ঠিক আছে। দু-একজন কাকা মাথা নাড়লো। ব্যস কাজি ডেকে কবুল বলানো হয়ে গেল।

জুলেখার কাছে জীবন খুব অদ্ভুত লাগে। সোহাগ দেখতে মহব্বতের মতো হবে। এই যে মা চলে গেল বাড়ি থেকে, হাত-পা মুড়ে একদিনও কাঁদেনি। মায়ের সঙ্গে যাবে বলে চিৎকার করেনি। মহব্বতের বুকের ধন সে। মায়ের চেয়ে বাবার দিকে টান বেশি। বাবার প্রতাপ আছে, ক্ষমতা আছে। ক্ষমতার দিকেই তো বাচ্চা বয়স থেকেই মানুষ আকৃষ্ট হয়। কেউ কি চায় দুর্বল হতে? ম্রিয়মান, জবুথবু, অন্ধকার জীবন কে চায়! বাচ্চারা বুঝে যায় কার মতো হলে বেশ সুযোগ সুবিধে ভোগ করা যায়। তার প্রতি টানটা তারা ছোটবেলা থেকেই অনুভব করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোহাগকে জিজ্ঞেস করেছিল জুলেখা— তোমার আব্বার বউকে কী বলে ডাকো বাবু?

— আম্মা বলে।

— ওকে আম্মা বলো কেন? ও তো তোমার আম্মা না। আম্মা তো আমি।

— আব্বা বলেছে আম্মা বলে ডাকতে। তাই ডাকি।

সোহাগ যুক্তি দেয়।

— এই যে আমি বললাম আম্মা বলে ডাকবে না। আমার কথা মানবে না?

সোহাগ চুপ করে থাকে। জুলেখা বোঝে যে সে মানবে না। তার আব্বুর আদেশই সে পালন করবে।

— আমার কথা তোমার মনে পড়ে?

সোহাগ মাথা নাড়ে। মনে পড়ে।

— আমার সঙ্গে থাকবে? চল তুমি-আমি একসঙ্গে থাকি।

সোহাগ চুপ করে থাকে।

— আব্বুকে ছাড়া থাকবে না?

মাথা নাড়ে সোহাগ। না।

হঠাৎ জুলেখার বন্ধন সরিয়ে সোহাগ দৌড়ে মামার বাড়ির চৌকাঠ পেরিয়ে ভোঁ দৌড়। মহব্বতের বাড়ির কাজের মেয়েটি সোহাগের হাত ধরে হেঁটে যায়। যতক্ষণ না ছেলেটি অদৃশ্য হয়, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে জুলেখা। তার মনে হতে থাকে ধীরে ধীরে সোহাগ আর তার সঙ্গে হয়তো দেখাও করতে আসবে না। হয়তো কাজের মেয়ে মরিয়মের কাছেই সে শুনেছে তার মার চরিত্র খারাপ, হিন্দু ছেলের সঙ্গে ভেগে গেছে এই সব কথা। নিশ্চয়ই মহব্বত আর তার নতুন বউ তার কাছে জুলেখার বদনাম গেয়েছে। বাচ্চা ছেলের মাথায় ঢুকে যাচ্ছে সব। এই ছেলে যত বড় হবে. তত ঘৃণা করবে নিজের মাকে।

জুলেখার খুব একা লাগে। বুকের ভেতর চিনচিন করে কষ্ট হতে থাকে। মামার বাড়ির দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে। বিশাল একটা আকাশ। থই থই করছে শূন্যতা। সময়টা বোধহয় এই সময়ই যখন মেয়েরা আত্মহত্যা করে। জুলেখা আত্মহত্যা করতে চায় না। বাঁচতে চায়। বাঁচতে সে বরাবরই চেয়েছিল। তার মতো করে। কিন্তু পারেনি। তার পরও এই সমাজ এই পরিবার তাকে যেভাবে রাখে, যতটুকু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুযোগ দেয় বাঁচার সেভাবেই ততটুকুই সে থাকতে চেয়েছিল। ওর মধ্যেই যদি সে তার রুচিমতো জীবন সামান্যও যাপন করতে পারে। না, বেশি কিছু জুলেখা কখনও চায়নি। বড় বড় স্বপ্নও সে দেখেনি কোনদিন। সুরঞ্জন তার অপহরণকারী থেকে প্রতিশোধপরায়ণ শত্রু থেকে প্রেমিকে উত্তরণ ঘটা একজন। সুরঞ্জনের সঙ্গে সম্পর্কে কোনও স্বপ্ন তৈরি হয় না। আজ মন কেমন করছে, আজ শরীরে বান ডেকেছে, আজ হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যেতে চাইছে, তখন সুরঞ্জন। ততক্ষণই সে, যতক্ষণই সে আছে। এ রকম কত হয়েছে যে সে আসবে বলে আসেনি, ভুলে গেছে। বাড়িতে থাকবে বলেও থাকেনি। জুলেখা বাড়িতে এসে দেখে যার জন্য এসেছে, সে নেই। অগত্যা কিরণময়ীর সঙ্গে বসে বসে গল্প করেছে জুলেখা। কিরণময়ী জুলেখাকে স্নেহ করেন, তার কষ্টে তিনি আহা আহা করেন। কিন্তু সুরঞ্জনের সঙ্গে প্রেমটা জুলেখার আরও বেশি গভীর হোক, তিনি যে চান না, জুলেখা বোঝে। একদিন কিরণময়ী জিজ্ঞেস করলেন— দেখো, সময়টা তোমার খারাপ যাচ্ছে। এই সময় ডাক্তার-টাক্তার ভালোভাবে দেখিও। শরীর যেন খারাপ না করে।

— শরীর তো আমার ভালোই আছে, জুলেখা বলেছিল।

কিরণময়ী বলেছিলেন— দেখো আবার যেন পেটে বাচ্চাটাচ্চা না চলে আসে। ঝামেলা যেন না হয়।

জুলেখা শরমে মুখ নত করেছে। একটা কথাও বলতে পারেনি। জুলেখা জানে, সুরঞ্জনের সঙ্গে সম্পর্কের কোনও পরিণতি নেই। সম্পর্কটা এ রকমই থেকে যাবে যতদিন না দুজনের দুজন থেকে মন ওঠে, শরীরের আকর্ষণ ওঠে। একত্রবাস তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিয়ে না হলেও যদি একত্রবাস হতো, মামার বাড়ি যন্ত্রণা থেকে সে যদি মুক্তি পেতে পারতো, যদি সুরঞ্জনের ঘরে এসে উঠতে পারতো, হয়তো এই কলকাতা শহরে চেষ্টা চরিত্রির করে ভালো একটা চাকরি সে পেতে পারতো। কারণ কোথাও তার ফিরে যাওয়ার নেই। সিউড়ি ফিরে যাওয়ার কোনও কারণ তার নেই। ওখানের দুর্বিষহ জীবন জুলেখা বেশ কল্পনা করতে পারে। ওই জীবনের মধ্যে গেলে লোকে তাকে ছিঁড়ে খাবে, বাঁচতে চাইলে আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনও পথ থাকবে না।

আত্মহত্যা করলে লোকে খুশি হবে সে জানে। এমনকি তার বাবাও খুশি হবে। কিন্তু কাউকে খুশি সে করতে চাইছে না। তার জীবনটা অন্য কারও নয়, সম্পূর্ণই তার। তার জীবন। এই জীবনটাকে সুযোগ পেলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকে কেবল পায়ে মাড়িয়ে যেতে চাইবে, তা সে কেন হতে দেবে? কোনও অন্যায় সে করেনি। তার স্বামীর অন্যায়ের প্রতিশোধ লোকে তার ওপর নিয়েছে। তার প্রতি আরও বেশি আদর, আরও বেশি আবেগ না ঢেলে উল্টো তার গায়ে হাত তুলেছে। কোনও আত্মীয় কোনও বাবা তো তখন কাছে আসেনি। বাবাকে সে ফোন করে বলেছিল, এক বাবাকেই কেঁদে কেঁদে জানিয়েছিল যে স্বামীর কৃতকর্মের প্রতিশোধ নিতে তাকে ধরে নিয়ে কিছু ছেলে ধর্ষণ করেছে, বাড়িতে ফেলে গেছে। শুশ্রূষা করার বদলে স্বামী তাকে জঘন্যভাবে মেরেছে। এ সময় বাবা বললেন— স্বামীর পায়ে ধরে মাফ চা জুলেখা।

— মাফ চাইবো কেন বাবা। কী অন্যায় আমি করেছি?

— মাফ চা। ও তোর স্বামী। ও তোকে মারতেই পারে।

— মাফ কেন চাইবো বাবা? কী দোষ তার কাছে আমি করেছি, বলে দাও। কিছু লোক আমাকে কিডন্যাপ করেছিল। এটা আমার দোষ? আমার জন্য তোমার কষ্ট হচ্ছে না? আমাকে একটু আদর করে কথা না বলে তুমিও চিৎকার করছো?

বাবা আগুন হয়ে আছেন ওদিকে রেগে। মাফ না চাইলে তিনি মেয়েকেও মাফ করছেন না এমন। মাফ জুলেখা চায়নি। কারণ কী অন্যায়ের জন্য সে মাফ চাইবে, সে জানে না। কারণ সে মনে করে না কোনও অন্যায় সে করেছে, অন্যায় করেছে সুরঞ্জন আর তার বন্ধুরা, করেছে মহব্বত।

জুলেখার কী উচিত জুলেখা তখন জানে না। তখন সে বিভ্রান্তির ঘোরে গিয়ে পৌঁছেছিল সিউড়িতে। প্রথম সে তার বড় বোনের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। সুলেখা ফোনে বলে দিয়েছে, শ্বশুরবাড়িতে জুলেখার ঢোকা তো অসম্ভব। বাইরে? ঠিক এই সময়টার বোনের সঙ্গে দেখা করলে খবরটা জানাজানি হয়ে গেলে তার শ্বশুরবাড়ির অশান্তি হবে। তার চেয়ে জুলেখা যদি মাসখানিক পর আসে, পরিস্থিতির উন্নতি হলে সুলেখার দেখা করায় কোনও অসুবিধে হবে না।

এরপর রবিউল ইসলাম আর সুলতানা কবীরের সঙ্গে দেখা করেছে তাদের সিউড়ির বাড়িতে। দুপুরবেলায় চা-বিস্কুট জুটেছে। এবং কেউ চায়নি জুলেখা অনেকক্ষণ সময় ব্যয় করুক বাড়িতে। গিয়েছিল তাদের সমর্থন পেতো, তাদের পাশে পেতে না, কারও কাছে তার কোনও আশ্রয় মেলেনি। দুজনই উপদেশ দিয়েছেন তাকে বাপের বাড়ি চলে যেতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাপের বাড়িতে গিয়ে কী করবে জুলেখা? সকলে ঘেন্না দেবে। আর তখন একটাই পথ খোলা থাকবে, আত্মহত্যা করা। অথবা নতুন কোনও বদমাশকে বিয়ে করা। কোনও ভদ্র-শিক্ষিত লোক তো বিয়ে করতে চাইবে না জুলেখাকে। তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যে অন্যায় সে করেছে, তার চেয়ে অন্যায় করেছে হিন্দু দ্বারা অপহৃত হয়ে, ধর্ষিতা হয়ে এবং তার চেয়েও বেশি অন্যায় সে করেছে হিন্দুর সঙ্গে প্রেম করে।

বাবাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে হয় জুলেখার। পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবা। বাড়িতে কাজের লোক, আর একটি দূরসম্পর্কের ভাইপো। এই নিয়ে বাবার সংসার। বাবার আগের পক্ষের একটি ছেলে, জুলেখার সৎ ভাই, সতেরো-আঠারো বছর আগে, যখন ছোট জুলেখা, রহমান চলে গিয়েছিল কাশ্মীরে। প্রথম প্রথম চিঠি পাঠাতো, তারপর আর পাঠায়নি, তার খোঁজও পাওয়া যায়নি। রহমানের একটি ছবি ফ্রেমে ঝোলানো বাড়ির দেয়ালে। কাশ্মীরে চলে যাওয়ার পর থেকেই ঝোলানো আছে ছবিটা। জুলেখা কোনও দিন জানতে পারেনি কেন সে কাশ্মীর গিয়েছিল, কেনই সে কোনও দিন আর ফেরেনি। তার বাবা হেন দিন নেই, ছবিটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেননি।

বাবার প্রথম পক্ষও অকালে মারা গেছেন। দ্বিতীয় পক্ষও। দুটো কন্যা ছাড়া আর কিছু জন্ম দিতে পারেনি বলে দ্বিতীয় পক্ষকে কম গঞ্জনা সইতে হয়নি। জুলেখা ট্রেন স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল আর সেই গঞ্জনাগুলো তার মনে পড়ছিল। দিনভর গালি, থুতু, খোঁটা পেত আর গভীর নিস্তব্ধ রাতে মিহি সুরে যা কাঁদতো। সুলেখা-জুলেখা কোনও দিনই মার দুঃখ এতটুকু দূর করতে পারেনি। কী অসুখে ভুগে মা মারা গেল, তা কেউ জানে না। চিকিৎসা হলে তো জানতে পারতো। মায়ের তার কোনও চিকিৎসা হয়নি। পেটে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল। বাবা বলতো, খাওয়াটা বেশি হয়ে গেছে বোধহয়, তাই ব্যথা। পুরো এগারো বছর বাবা তাই বলেছে, মার খাওয়াটা বেশি হয়ে গেছে। হাতের কাছে যা পায় মা নাকি তাই খায়। কোনও নাকি বাছবিচার নেই।

জুলেখা দ্রুত হাঁটে স্টেশনের দিকে। পেছনে তার বাড়ি, যে বাড়িতে সে জন্মেছে, বড় হয়েছে। বিয়ে হওয়ার আগ অবধি যে বাড়িটি ছিল তার ঠিকানা। তার স্কুল মাস্টার বাবা শুয়ে আছে উঠোনের চৌকিতে। ঘরের দেয়ালে ঝুলে আছে রহমানের ছবি। কাজের ছেলেটি বাবা যা চাইছে তাই দিচ্ছে, কোনও বন্ধু বা আত্মীয় এলে তার সঙ্গে কথা বলছেন, আর জুলেখাকে ত্যাজ্য কন্যা করে দেবেন, এ রকম সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। মনে মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামনা করছেন, জুলেখা মরুক। জুলেখা হাঁটে। কুলকুল করে ঘামছে সে। তার মনে হতে থাকে এ তার নতুন জীবন, যে জীবনের দিকে সে যাচ্ছে। এ জীবনে সে নিজে ছাড়া তার আর কেউ নেই। জুলেখাকে কবর দিয়ে দিয়েছে তার সমাজ। নতুন কোনও সমাজের দিকে সে এগোচ্ছে, যে সমাজটা তাকে গ্রহণ করবে। কারণ কিছুতেই সে সমাজের বাইরে এলাকায় যেতে পারবে না। সমাজের সবুজ বাতির লোকদের শরীর শান্ত করতে লালবাতি এলাকায় সে জীবন উৎসর্গ করতে পারবে না। যেদিন ওখানে যাওয়ার তার সময় হয়, সেদিন সে নিজেকে নিজে কথা দেয়, আত্মহত্যা করবে।

জুলেখা সিউড়ির অভিজ্ঞতা সুরঞ্জনকে বর্ণনা করেনি। সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করেছিল— কী করলে বলো।

— কত কিছু।

— কত কিছু কী? পুরনো প্রেমিকদের সঙ্গে দেখা করলে?

জুলেখা হাসতে হাসতে বলেছে— হ্যাঁ। হ্যাঁ ওদের সঙ্গে পালাবো। তোমার চেয়েও হ্যান্ডসাম ওরা।

— তো, চলে এলে যে!

— এলাম, দেখতে এলাম!

— কাকে?

— কাকে আবার? তোমাকে।

— কী দেখতে এলে, তোমার বিরহে কান্নাকাটি করছি?

— না না না, সে দেখার সৌভাগ্য কি আমার হবে?

— কোনও অঘটন ঘটাওনি তো সিউড়িতে?

— অঘটন ঘটানোর শক্তি কি আমার আছে? অঘটন তো অন্যরা ঘটায়, আমি তার সাক্ষী হই বা শিকার হই।

কথাটা তীক্ষ্ণ। জুলেখা জানে না কথাটা বেঁধে সিউড়ি সম্পর্কে আর কোনও কিছু সুরঞ্জন জানতে চায় না। জুলেখারও আগ বাড়িয়ে বলার কিছু ছিল না। তার দিদি আর গুরুজনদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছে, তা আর সবাইকেই সে বলতে পারে, কিন্তু সুরঞ্জনকে সে পারে না। তাকে সে যদি নিজ মুখে বলে যে আমাকে আসলে দূর দূর করে তাড়িয়েছে ওরা, সুরঞ্জনের মনে হতে পারে, এখন তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছে, তার সাহায্য চাইছে সে। জুলেখা বরং এমন ভাব দেখায় যে কিছুই হয়নি মন্দ। যেন জুলেখা যা করছে, তাতে সবারই মত আছে, সমর্থন আছে। আত্মীয়-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধু সবাই আশ্বাস দিয়েছে সহযোগিতা করার। তার মতো করে জীবন তাকে যাপন করতে বলা হয়েছে। সবারই শুভকামনা, তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তার জন্য ছিল এবং আছে। পরিবার থেকে, গোত্র থেকে, সম্প্রদায় থেকে, সমাজ থেকে সকলেই জুলেখাকে বাহবা দিচ্ছে।

কেন বলবে সে সুরঞ্জনকে সব কথা? আত্মসম্মান বলে কিছু তো এখনও তার অবশিষ্ট আছে। সত্যিকার আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে সে থাকতে চায়। কোথাও কোনও কাজ সে করতে চায়। কোনও স্কুলে সে মাস্টারির চাকরি যদি সে পেতে পারতো। সুরঞ্জনের তো জানাশোনা আছে কলকাতা শহরে। নিজেও সুরঞ্জন অনেকদিন শিক্ষক হিসেবে চাকরি করেছে। যদি সে ইচ্ছে করতো, হয়তো জুলেখাকে এই সাহায্যটুকু করত। জুলেখা কারও কাছে কিছু প্রত্যাশা করে না, করতে চায় না, তার পরও মনের গভীর কোনও কোণে লুকিয়েই থাকে কিছু প্রত্যাশা। যেমন খুব গোপনে সুরঞ্জনের কাছে ছিল, ছিল তার বড় বোনটির কাছে যে সুলেখা হয়তো ফেরাবে না, হয়তো রবিউল আর সুলতানার কাছে ছিল। ভরসা করার জন্য জুলেখার তো আর কয়েক শ লোক ছিল না, হাতে গোনা কজন মাত্র। প্রত্যাশার সঙ্গে আবার সে একা একা লড়তে থাকে। একে সে জীবন থেকে পুরোপুরি ছুটি দিয়ে দিতে পারলে সত্যিকার মুক্তি পাবে।

যাদের কেউ নেই, কিছু নেই, যাদের কোনও স্বপ্ন নেই, তারা কি এই শহরে বেঁচে নেই, যারা শুধু বেঁচে আছে বলে নিশ্বাস নেয়, যারা শূন্য চোখে শূন্য বুকে বসে থাকে অসীম শূন্যতার দিকে তাকিয়ে, তাদের মতোও তো হতে পারে জুলেখা।

মামাবাড়ির তেল চিটচিটে বালিশ আর পেচ্ছাবের গন্ধে ভরা বিছানার চাদরটি গায়ে জড়িয়ে জুলেখাকে শুতে হয়, তাও আবার পেচ্ছাব-পায়খানার হাঁ হয়ে থাকা দরজার দিকে মুখ করে। সুরঞ্জন যদি দেখতো কোথায় ঘুমোয় জুলেখা, কীভাবে এই বাড়িতে সে থাকে, কীভাবে প্রতিদিন! জুলেখার সন্দেহ হয়, তার দুর্ভোগ দেখে সুরঞ্জনের কোনও মমতার উদ্রেক আদৌ হবে কিনা, হয়তো চুক চুক করে কিছু দুঃখ করবে— এর বেশি কিছু নয়। জুলেখা নিজেকে সান্ত্বনা দেয় এই বলে যে, ওরই বা কী ক্ষমতা। ও নিজেই তো দুরবস্থার মধ্যে আছে। ওর অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড তো কবেই ভেঙে বসে আছে। দৃশ্য দেখলে বরং সুরঞ্জনের ওপর চাপ বাড়বে। তার চেয়ে ও যদি না দেখে, তাহলে জুলেখার মনে হবে, দেখলে হয়তো সে এখান থেকে জুলেখাকে বের করে নিয়ে যেত। আর দেখলে যদি বের করে নিয়ে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়! এই ভয়ে জুলেখা চায় না সুরঞ্জন দেখুক কিছু। কারণ সে যে করেই হোক চায় পরস্পরের প্রতি তাদের উত্তাপ এবং আকর্ষণটা থাকুক, বেঁচে থাকুক। এটা জুলেখার কাছে এখন সব দুঃখ মোচনের জায়গা হয়ে গেছে। সুরঞ্জন না থাকলে, জুলেখার জগৎ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। অন্তত একটি লোককে জুলেখা পেয়েছে, যে শরীরের সম্পর্কে গিয়েছে, কিন্তু তাকে কোনও দিনই ধর্ষণ করেনি। জুলেখা না চাইলে সুরঞ্জন তাকে কোনও দিন স্পর্শও করে না। সুরঞ্জন ধীরে ধীরে তার নিজের অজান্তেই জুলেখার জীবনের একমাত্র সুখ হয়ে উঠেছে। ওকে কোনও রকম দায়িত্ব আর কর্তব্যবোধের ধারে-কাছেও জুলেখা যেতে দিতে চায় না। সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখতে হলে মুক্তির দরকার, বন্ধন নয়। আসলে, সম্পর্ক যদি মুক্তি না দেয়, বন্ধন দেয়, তবে সম্পর্কে আনন্দ রইলো কই! সম্পর্ক যদি জগদ্দল পাথরের মতো হয়, তবে সেই সম্পর্ক কোনও স্বস্তি দেবে না।

সুরঞ্জনের থাকুক না জানা সব। সুরঞ্জন জানুক, মামাবাড়িতে খুব একটা কিছু অসুবিধে হচ্ছে না। জানুক যে, চাকরিটাও বেশ চলছে, শপার্স স্টপে মাইনে তার পাঁচ হাজার, বছর বছর মাইনে বাড়বে। জানুক যে সোহাগ দিনরাত মায়ের জন্য কাঁদছে। কিছু ভালো জিনিস জুলেখাকে নিয়ে জানুক সে। এটুকুও যদি না জানে সে, তবে তো জুলেখা তার কাছে গণধর্ষণের শিকার, স্বামীর মার খাওয়া, তালাক পাওয়া অসহায় নারী ছাড়া আর কিছু নয়। এবং দ্বিতীয়বার সে চায় না তার জন্য সুরঞ্জনের করুণায় উদ্রেক হোক। করুণার জায়গায় ভালোবাসা ঢুকেছে। আবার সে চায় না ভালোবাসার জায়গায় করুণা ঢুকে গিয়ে সর্বনাশ করুক তার।

মাঝে মাঝে অবশ্য এ নিয়ে সংশয় হয় জুলেখার, আসলেই কি সুরঞ্জনের মনে তার জন্য কোনও ভালোবাসা আছে? নাকি তাকে বিনা পয়সায় বিনা দায়িত্বে ভোগ করার একটা চমৎকার সুযোগ সে পেয়ে গেছে মাত্র, আর কিছু নয়। এ শহরের কোনও মেয়ের সঙ্গে তার এই সম্পর্ক হতে পারতো না। যে কোনও মেয়েই দাবি করতো অনেক কিছু, অথবা বলতো বিয়ে করবে। আর তা যদি না হয়, তবে তো সোনাগাছি আছে। ওখানেও ঝুঁকি আছে, পয়সা খরচা আছে। জুলেখা সুরঞ্জনের অর্থনৈতিক-সামাজিক-পারিবারিক অবস্থায় কোনও অসুবিধে সৃষ্টি করছে না। বরং দিচ্ছে কেবল অকাতরে তাকে। হৃদয় এবং শরীর এই দুটোই নিঃশর্তভাবে দিচ্ছে। মানুষ কি কেবল দিয়েই যেতে পারে ক্রমাগত? জুলেখার খুব একা লাগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একা লাগাটির প্রয়োজন আছে খুব। চোখ ফেটে যখন জল চলে আসতে চায় জুলেখা আটকে রাখে। তার চোখের জল ফেললে চলবে না। প্রতিদিন কয়েকটা খবরের কাগজ কিনে এতে চাকরির সুযোগের দিকে ঝুঁকে থাকে। যে চাকরিটি সে করছে, অনুভব করে, ইউনিফর্ম পরে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকার কাজের চেয়ে আরও ভালো কাজ করার যোগ্যতা তার আছে। যদি পেয়ে যায়, সে চলে যাবে এই এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও। সোহাগ ভালো আছে। সে যদি মাকে ভালোবাসে, মাকে খুঁজে নেবে সে। সুরঞ্জনও যাবে, যদি ভালোবাসে। পার্ক সার্কাসে সুরঞ্জনের থাকা, বেলঘরিয়ার এত দিনের বাস ছেড়ে চলে আসা, জুলেখার মনে হয় না, যতই সুরঞ্জন দাবি করুক যে তার জন্য, আসলে তার জন্য। এর পেছনে অন্য কোনও কারণ নিশ্চয়ই সুরঞ্জনের আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলেখার সঙ্গে সুরঞ্জনের সম্পর্কের কথা জানার পর ভীষণ রকম ক্ষিপ্ত মায়া। সুরঞ্জনকে সে বলে দিয়েছে, ওই সম্পর্ক থাকলে আমার সঙ্গে তোর কোনও সম্পর্ক থাকবে না। যে কোনও একটা তোর বেছে নিতে হবে দাদা।

মায়ার এই দাদা ডাকটি সে কখনও শুনবে না, এ সুরঞ্জন কল্পনা করতে পারবে না। পৃথিবী ভেসে যাক, মায়ার জন্য সর্বস্ব সে বিসর্জন দেবে। কিরণময়ীও চান না সুরঞ্জন জুলেখাকে বিয়ে করুক। জুলেখা বাড়ি আসে। মেয়েটি স্বভাব-চরিত্রে ভালো, অমায়িক ভদ্র, ওর সঙ্গে কথা বলে তাঁরও ভালো সময় কাটে। সবচেয়ে বড় কথা, সুরঞ্জন খুশি থাকে। চোখের সামনে দরজা বন্ধ করে দুই বন্ধুতে সময় কাটায়, প্রেমের সম্পর্ক আছে বলেই কাটায়। কিরণময়ীর বরং মনে হয় বাজে ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে মেশার চেয়ে ঘরে বসে প্রেম করা ভালো। বউ ডিভোর্স দিয়ে চলে গেছে, একা পুরুষ মানুষ, সঙ্গী-সাথি না থাকলে কি আর মন ভালো থাকে? কিরণময়ী এভাবে নিজেকে বোঝায়। মায়াকে বোঝায়। কিন্তু মায়ার সাফ কথা, বিয়ের তো প্রশ্ন ওঠে না, এই মেয়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখা চলবে না।

মায়া কি খামোখা বলে? মায়ার কি মনে নেই দাঙ্গার সময় ঢাকার সেই সব দুঃস্বপ্নের কথা! মায়াকে ছিঁড়ে খায়নি ওই মুসলমানের বাচ্চাগুলো। মায়া পৃথিবীর সবাইকে ক্ষমা করে দিতে পারে, মুসলমানকে করবে না। যে মায়ার জন্য সুদেষ্ণার সঙ্গে তার বিবাহিত জীবনের ইতি ঘটে গেল, সেই মায়াই কিনা বলছে সুরঞ্জন যদি অন্য কোনও মেয়ের দেখা না পায়, তাহলে ওই সুদেষ্ণার কাছেই ফিরে যাক, সুদেষ্ণার সঙ্গে সম্পর্কটা নতুন করে জোড়া লাগিয়ে নিক সুরঞ্জন। সুদেষ্ণা বিয়ে থা করেনি আর। সুতরাং সম্ভাবনা তো আছেই। ওই মুসলমান মেয়ের সঙ্গে আজই এই মুহূর্তে সব সম্পর্ক ছিন্ন করুক সে।

কিরণময়ীর ঘরে বিছানায় বসে মায়া কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে এসব।

কিরণময়ী চেয়ারে বসা। দরজায় দাঁড়ানো সুরঞ্জন। জানালার ওপাশে কলের তলে জল নেওয়ার হুল্লোড়। হু হু করে জানালার পর্দা উড়ছে। আশেপাশের কয়েকটি বাড়ি এখানে হিন্দু। কান্না যদি কেউ শুনতে চায়, কান পাতলেই শুনতে পাবে।

কিরণময়ী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আমার জীবনে সুখ আর হলো না। মায়া তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় কিরণময়ীর দিকে, আমি না হয় দিইনি, তোমার নয়নের মণি পুত্র তোমাকে সুখ দিচ্ছে না কেন! এত জায়গা থাকতে এখানে এসে উঠেছো কেন! যত সব সন্ত্রাসীদের জায়গা। দুদুটো বাড়ি পেরোলেই তো লাইন ধরে মুসলমানদের বাড়ি। এখানে কে দেবে নিরাপত্তা তোমাকে?

মায়া ফুঁপিয়ে কাঁদে। ওই কান্নার দিকে তাকিয়ে সুরঞ্জনের খুব মায়া হয়। সে কী করবে বুঝতে পারে না। মায়া তার একটিই বোন, আদরের বোন। একসঙ্গে তাঁতিবাজারের বাড়িতে বড় হয়েছে। দাদা ছাড়া মেয়েটা কিছুই বুঝতো না। সেই বোনটা বুকে কী যন্ত্রণা পুষে যে কাঁদছে, সুরঞ্জন বোঝে। মায়ার প্রতিটি কথা, না-কথা, প্রতিটি দীর্ঘশ্বাস, হাসি, সব জানে সে, কেন। যদি পারতো সুরঞ্জন জুলেখার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে, আজই করতো। না জুলেখা মুসলমান বলে নয়, শুধু মায়ার জন্য, মায়া চায় বলে। আর অন্য কোনও কারণ নেই। সুদেষ্ণার সঙ্গে হবে না তার। যে সম্পর্ক ভেঙে যায় ওভাবে, সামান্য টোকায়, ওই সম্পর্ক জোড়া লাগানোর কোনও অর্থ হয় না, ওটি যে কোনও সময়ই ভেঙে যাবে, সামান্য টোকায়। তার চেয়ে একা থাকা ভালো।

যখনই সে ভাবছে সুদেষ্ণার থাকার চেয়ে একা থাকা ভালো, এ কথা। তখনই মায়া বললো, তার চেয়ে দাদার একা থাকাই ভালো। থাকছে না লোকে! আমি যে থাকছি, ওই থাকা তো অনেকটা একা থাকার মতোই। বলে কেঁদে উঠলো মায়া। অনেকক্ষণ কাঁদে। কিরণময়ীর কাঁধে মাথা রেখে কাঁদে। মায়ার কান্না ছাড়া ঘরে আর কোনও শব্দ নেই। কেউ তাকে থামতে বলে না। কারণ কারও অনুরোধ মায়াকে থামাতে পারবে না। মায়ার প্রয়োজন এখানে মায়ের বাড়িতে এসে তার জীবনের সব অতৃপ্তি আর অশান্তির জন্য প্রাণ খুলে কাঁদা। এই কান্নাটুকু না কাঁদলে তার পক্ষে সম্ভব হবে না সপ্তাহের বাকি কটা দিন না কেঁদে বাঁচা। বুকে অনেক কষ্ট সে পাথরের মতো জমিয়ে রাখে। মা আর দাদার সান্নিধ্যেই পাথর গলে নদী হয়। সুরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার আজ যদি অঢেল টাকা থাকতো, একটা ভালো এলাকায় বড় একটা বাড়ি ভাড়া নিত, মায়া আর দু বাচ্চাকে সে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে আসতো নিজের কাছে। সুরঞ্জন নিজের জন্য নয়, কিরণময়ীর জন্য নয়, এমনকি জুলেখার জন্যও নয়, কেবল মায়াকে দেখলেই নিজের দারিদ্র্যের জন্য আফসোস করে। মায়াকে আগে একদিন সে বলেছে, ভালো একটা চাকরি পেতে পারতাম যদি, অথবা অনেক টাকা হয় এমন কোনও কাজ, তাহলে তোর আর কোনও কষ্ট হতো না, তোকে আর থাকতে হতো না ওই শয়তানের সঙ্গে।

মায়া শুনে দাদাকে জড়িয়ে ধরেছে। সুরঞ্জন চোখের উপচে ওঠা জল সামলে বলেছে, যত দিন না পারি, তোর এই অক্ষম দাদাকে তুই ক্ষমা করিস না।

মায়া এভাবে আর সপ্তাহে একগাদা অভিযোগ নিয়ে আসছে না, কাঁদছে না, এ রকম যদি হতো। যদি মায়ার সুখ হতো! সুখ আমার ভাগ্যে নেই দাদা...

সুরঞ্জন ভাগ্যে বিশ্বাস করে না। সে জানে ভাগ্য বলতে কিছু নেই। কিছুই আগে থেকে লেখা থাকে না। মায়া যেমন চায়, তেমনভাবে বেঁচে থাকতে পারতো যদি টাকা থাকতো অনেক। টাকাই যে সব সুখ দেয়, তাও বিশ্বাস করে না সে। টাকাওয়ালা অনেক লোককে সে দেখেছে, স্বস্তি নেই। এখনকার চেয়ে অনেক বেশি টাকা যখন ছিল সুরঞ্জনের, তার চেয়ে সে যে ভালো আছে এখন, এটা তো নিশ্চিত। সুদেষ্ণার সঙ্গে বাড়ি ফিরেই যখন ঝগড়া হতো, মদের বোতল নিয়ে সে বসতো নন্দননগরের বাড়িতে। সুদেষ্ণা এক ঘরে। অন্য ঘরে সুরঞ্জন। কিরণময়ী রাতে রাতে এসে বোতল কেড়ে নিয়ে বলতো, কার অসুবিধে করছিস নিজের ছাড়া? কারও ওপর শোধ নিচ্ছিস বলে মনে হচ্ছে? না। না। তোর মদ খাওয়ায় কারও কিছু হবে না। মরলে তুই মরবি। অন্য কেউ মরবে না। এসব বলে কোনও লাভ হতো না সত্যিকারের। সুরঞ্জন খেতই। ওখানেই ওই বেতের চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়তো ঠ্যাং ছড়িয়ে। এসবে সুদেষ্ণার কিছু যেত আসত না। সুদেষ্ণা বিয়ে করেছিল ঠিকই কিন্তু বিয়ের পরই বুঝেছে, এ ছেলের ভেতরে বাইরে গাদা গাদা আক্রোশ ছাড়া কিছু নেই। যা আছে তাকে ব্যক্তিত্ব বলে অনেকের ভুল হতে পারে, কিন্তু সে প্রচণ্ড স্বার্থপর, একই সঙ্গে উদাসীন। সে ঠাণ্ডা মাথায় মানুষকে খুন করতে পারে, আবার ইচ্ছে হলে কাউকে জলে ঝাঁটিয়ে বাঁচাতেও পারে। দুটো চরিত্র পাশাপাশি। এর সঙ্গে, সুদেষ্ণা বুঝে যায়, কোনও সুস্থ মানুষের বাস করা সম্ভব নয়।

সুরঞ্জন বাঁচাতে পারেনি মায়াকে। মায়াকে বাঁচানোর স্বপ্ন ছিল তার। মায়াকে মুসলমানদের ওই ধরে নিয়ে যাওয়া তাকে উন্মাদ করে তুলেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের জীবন দিয়ে হলেও সে চেয়েছিল মায়াকে ওদের কবল থেকে উদ্ধার করতে। পারেনি। ব্যর্থ ছেলেটি যখন দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যে দেশে হিন্দু বলে কারও নিরাপত্তা নেই, যে দেশে তার আদরের ছোট বোনটি নিরাপদ নয়, সে দেশ ছাড়বে বলেই সিদ্ধান্ত নিয়ে শেষ বাঁধাছাঁদা করেছে, ভোরবেলা দরজা খুলে দেখে সিঁড়ির কাছে পড়ে রয়েছে মায়ার শরীর। সুরঞ্জন আর্তচিৎকার করে ওঠে মায়াকে ওই অবস্থায় দেখে। মৃত মায়া। মৃতই ভেবেছিল সে। কোলে করে ভেতরে আনতেই সুধাময় নাড়ি দেখছেন, স্টোথোসকোপ বুকে লাগিয়ে থরথর করে কাঁপছেন। আর কিরণময়ী মায়ার ঠাণ্ডা শরীরে হাত বুলোচ্ছেন। সুধাময় অস্ফুট স্বরে শুধু বললেন, শিগগির হাসপাতালে নিয়ে যা। বেঁচে আছে। শুনে কিরণময়ী কেবল হাউমাউ করে কাঁদলেন। ওই অবস্থাতেই সুরঞ্জন বেরিয়ে পড়লো মায়াকে কোলে তুলে। পেছনে কিরণময়ী। সাধ্য থাকলে সুধাময় যেতেন। রিকশায় তুলে সোজা পিজি হাসপাতাল। স্যালাইন চলেছে, রক্ত চলেছে। কড়া কড়া ইনজেকশন। মায়া চোখ মেললো, কথা বললো দুদিন পর। না, সিদ্ধান্ত কেউ বদলায়নি। মায়া হাসপাতাল থেকে ছুটি পাবার পরই এক আত্মীয়ের হাতে বাড়ি-ঘরের ভার দিয়ে ভারত পাড়ি দিয়েছিল সুরঞ্জন। মায়াকে কোনও দিন জিজ্ঞেস করেনি কী হয়েছিল, কী করেছিল ওরা। মায়া তার পর থেকে হঠাৎ হঠাৎ কেঁদে উঠতো। কেন কাঁদছে কিছু বলতো না। সুরঞ্জন বা কিরণময়ী তখন মায়ার মাথাটা নিজের কাঁধে নিত, কাঁধটা দিত কাঁদতে, বা পিঠে হাত বুলিয়ে দিত, বা জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গনের উষ্ণতা দিয়ে বোঝাতে চাইতো আমরা আছি তোমার পাশে।

যে দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে তাদের উঠতে হয়েছিল, সেখানে মায়ার হারিয়ে যাওয়া আর তাকে ফিরে পাওয়ার গল্প পুরোপুরি গোপন রাখা হয়। কারণ শত হলেও, পরিবারের সকলে ভেবেছে, এটা এমন কোনও সুখকর সংবাদ নয়, যে বলে বেড়াতে হবে। তাদের বাড়িতে মুসলমানদের হামলার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলেও মায়ার ওপর হামলাটি সম্পর্কে কোনও বাক্য উচ্চারণ কেউ করেনি। সংখ্যাগুরু হিন্দুর ভারত, ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা প্রফুল্লনগর, আত্মীয়ের বাড়ি, নিরাপদ স্থান, ও বাড়িতে কাউকেই আর মুসলমানের ভয় করতে হয়নি। আত্মীয়দের আন্তরিকতার অভাব থাকলেও নিরাপত্তা আছে, এটুকুই সুরঞ্জন জানতো। তার বাবা-মা জানতেন। চার লাখ টাকা চুরি হয়ে যাওয়ার পর আকাশ ধসে পড়েছিল সুধাময়ের মাথায়। মাথা গোঁজার ওই ঠাঁইটুকুর কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভীষণ প্রয়োজন তখন! ওই আশ্রয়কে অস্বীকার করার কারও উপায় ছিল না। উঠোনের বাড়তি ঘরটিতে যেখানে সবাইকে আশ্রয় দিয়েছিল, হঠাৎই একদিন সবাইকে নিজের তিন কামরার বাড়ির ভেতর পুরে দিল শংকর ঘোষ। হঠাৎ তাকে উদারতায় পেয়েছে, এমনই যে কেউ মনে করবে। কিন্তু কেউ তখনও জানতো না যে রাতে রাতে মায়ার শরীরে হাত দিত ওই শংকর ঘোষ। মায়ার মুখটা চেপে ধরে রাখতো এক হাতে। এর পর থেকে আর চেপেও রাখতে হয়নি মুখ। মায়া নিজেই কোনও টুঁ শব্দ করতো না। শব্দ করলে যদি ওই রাতেই, বা পরদিন সকাল হওয়ার আগেই তাদের তাড়িয়ে দেয়! তাড়িয়ে দিলে যদি রেললাইন ছাড়া আর কোনও জায়গা না থাকে তাদের থাকার! রেললাইনের কথা মনে হলেই মায়ার কেবল মনে হয় গায়ের ওপর দিয়ে ভয়ংকর দানবের মতো একটা অন্ধ রেলগাড়ি চলে যাচ্ছে। তার শরীর থেঁতলে যাচ্ছে, মাংস-রক্ত ছিটকে ছিটকে পড়ছে তার বাবা-মা, তার দাদার শরীরে। ভয়ে নীল হয়ে থাকতো মায়া। শরীরটাকে মুসলমান শয়তানগুলো খাবলে খেয়েছে। সে তো মরেই গিয়েছিল। দুর্ঘটনাক্রমে বেঁচেছে। এখন কোনও এক হিন্দুর যদি এই শরীরটার দরকার হয় তার পরিবারটাকে মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই দিতে আর দুবেলা ভাত দিতে, তবে কী এমন হীরের টুকরো কুমারী শরীর এটি যে মায়া আগলে রাখবে? সে বাধা দেয়নি। সুরঞ্জন আশঙ্কা করতো কিছু একটা হচ্ছে, কিছু একটা হচ্ছে মায়ার ওপর এবং মায়া বাধা দিচ্ছে না। কিরণময়ীও সম্ভবত বুঝতেন। মায়া যখন কথা বলতো মা আর দাদার সঙ্গে, চোখের দিকে তাকাতো না। অস্বাভাবিক দেখাতো তার আচরণ। কখনও কখনও মায়ার চোখের কোল কালো হয়ে থাকতো, কখনও ঠোঁট ফুলে থাকতো, কখনও গলায় লাল দাগ, আঁচড়ের দাগ গলায় নিচে। জিজ্ঞেস করলে বলতো, তা জেনে তোমাদের কাজ কী। সেই বলায় একটা অভিমান বা রাগ কিছু একটা থাকতো। কার জন্য, কেন, তা কেউ সঠিক করে বুঝতো না। বুঝতো না, নাকি বুঝতে চাইতো না? আসলে অস্তিত্বের ওই সংকটকালে পাওয়ার মতো যেমন কিছু ছিল না তাদের, চাওয়ার মতোও কিছু ছিল না। তখন সুধাময়ের কী করে নতুন জায়গায় ডাক্তারি হবে, কী করে সুরঞ্জনের একটা চাকরি হবে, কেউ জানে না। সাহায্য করার কোনও প্রাণী ছিল না। সুরঞ্জনের সেই শক্তি ছিল না যে মায়াকে জিজ্ঞেস করে এবং উত্তরটা শোনে। উত্তর শুনলে একটা দায়িত্ব থাকে। এই নরক থেকে সবাইকে বের করার দায়িত্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়া বলতো, দাদা তোমার একটা চাকরি হবে না? পেতে কি পারো না একটা চাকরি? যদি না পারো তাহলে বলো আমি বেরোই, পথে পথে কিছু খুঁজি। আমার চেয়ে বেশি তো তোমার চাকরি পাওয়ার ক্ষমতা। আমার জন্য কিছু টিউশনির ব্যবস্থা করে দাও অন্তত। নিজেদের জন্য একটা বাসা ভাড়া কি করতে পারছো না?

বেরোচ্ছি তো প্রতিদিন। কিন্তু তো পাচ্ছি না।

মিথ্যে কথা। যে রকম করে খুঁজলে পাওয়া যায়, তেমন করে খুঁজছ না।

মায়ার চোখে সুরঞ্জনের প্রতি কাতর কোন অনুনয় ছিল না, ছিল ঘৃণা। চোখ থেকে বাবা-মার দিকেও ঠিকরে বেরোতো ঘৃণা। অসহায়তা যে কোনও পরিবারকে এমন বীভৎসভাবে গিলে খেতে পারে, পরিবারের কেউ জানতো না। সবাই যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল। সুরঞ্জন, অপদার্থ দাদা, কিছুই করতে পারেনি। সুধাময়কেই দিন-রাত পাঁচ-ছ টাকার ডাক্তারি করতে হয়েছে। মায়াকেই বেরিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে টিউশনি জোগাড় করতে হয়েছে। একেবারে বাচ্চাদের পড়ানোর কাজ। পড়ার বইপত্র, পড়ানোর কায়দা, সবই তো আলাদা। বাংলাদেশ থেকে সবে এসেই এখানে একটা কাজ, বিশেষ করে টিউশনির কাজ নেওয়া সম্ভব না। গেছে পড়ানোর কাজ পেতে, পেল বাচ্চাদের গায়ে তেল মালিশ করে স্নান করিয়ে দেওয়া আর বাচ্চার কাপড়চোপড় ধুয়ে দেওয়ার কাজ। বাড়িতে সে বলতো বাচ্চা পড়ানোর কাজ। অত করে মাসে তিনশ টাকা পেত। মায়া যখন বাড়ি ফিরতো সন্ধ্যেয়, দেখতো মেয়েরা সেজেগুঁজে রাস্তায় দাঁড়ায়। প্রথমে না বুঝলেও পরে বুঝতে পেরেছে, টাকা দিয়ে ওদের শরীর কেনে পুরুষেরা। একটা মেয়ের কাছে থেমে মায়া একবার জিজ্ঞেস করেছিল, কত পাও তোমরা?

মেয়েটি হেসে হাতের আঙুলগুলো মেলে ধরেছিলে। এর ঠিক কী উত্তর হয়, সে জানে না, পাঁচ টাকা নাকি পঞ্চাশ টাকা, নাকি পাঁচশ টাকা। ওই বাড়ি থেকে বেরোবার জন্য মায়ার ইচ্ছে হয়েছিল সেও দাঁড়ায়। মাস গেলে তিনশ টাকা আয় হওয়ার চেয়ে এ-ই তো ভালো। শরীর একবার ব্যবহার করে পঞ্চাশ টাকা যদি আয় হয়, ছ বার ব্যবহার করলেই তো তিনশ টাকা। পুরো মাস খাটাখাটনির দরকার কী! মায়ার মাথায় ভাবনাটি ঘুরপাক খেতে থাকে। আর এই শরীরের পবিত্রতা রক্ষার যখন আর দায় নেই, তখন প্রয়োজনে শরীর ব্যবহার করেই নরক থেকে বের হওয়াটাই তো একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অপদার্থ বাপ-দাদার আশায় থেকে তো কোনও লাভ সত্যিকারের নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকা সাহায্য পায়নি বলে সুরঞ্জন পার্টি থেকে পদত্যাগ করেছে। ইমোশনাল ছেলে। বাস্তব বুদ্ধি নেই। মায়াও জানে সেটা। জানে যে দাদার ওপর ভরসা করে লাভ নেই, তার পরও সে ভরসা করে। সুরঞ্জনকে খুব অসহায় লাগে তার। ও যে দাদা, ওর চেয়ে কয়েক বছরের বড়, মনে হয় না। যেন ওর আদরের ছোট ভাই। মায়া চোখের দিকে তাকায় না বটে, কিন্তু টের পায় এক একটি চোখে অনিশ্চয়তা আর আশঙ্কা তিরতির করে কাঁপছে। ওসব চোখ সে দেখতে চায় না।

শংকর ঘোষকে মায়া কোনও একদিন খুন করবে, যেদিন তার পায়ের নিচের মাটিটা শক্ত হবে, এই কথাটা মনে মনে সে নিজেকে অনেকবার বলে। প্রতিদিন বলে। ওই শংকর ঘোষের বাড়ি থেকে শেষ পর্যন্ত যেদিন তারা বেরোয়, সেদিন ভেবেছিল কথাটা বলবে তাকে, বলেনি। কারণ যে বাসাটি ওরা ভাড়া নিয়েছে, তা শংকরের বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়। প্রফুল্লনগর থেকে নন্দননগর। ভয়ে সে বলেনি, যদি আবার আক্রমণ করে বসে তাদের ওপর। মন্দ লোকের মনে হাজার রকম মন্দ জিনিস থাকে, এ কথা মায়ার কি বোধবুদ্ধি নেই যে জানবে না? কখন ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, কে জানে? কখন সবাইকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে। কখন নিজেই চুরি করে চুরির মামলায় ফাঁসিয়ে দেয় সবাইকে। সুরঞ্জন যে করেই হোক চার লাখ টাকা আদায় করতে চেয়েছিল শংকর ঘোষের কাছ থেকে, বলেছিল, ওকে খুন করে ওর রক্ত দিয়ে চান করবো আমি, তবে বাড়ি থেকে বেরোবো। মায়া বলেছিল, খবরদার, ভুলে যা সব। বাঁচতে হলে ভুলে যা দাদা। ভুলে যাওয়ার কথা বলার অর্থ ক্ষমা করা নয়। শংকরকে ক্ষমা করেনি মায়া। সবচেয়ে বেশি ক্ষমা করেনি ঢাকার ওই পাষণ্ডদের। আরেকজনকে মায়া ক্ষমা করেনি, সে তসলিমা নাসরিন। 'লজ্জা' লিখে সর্বনাশ করেছে মায়ার। বিয়ের জন্য যেই আসতো, খবর পেয়ে যেতো যে এই পরিবারের কথাই 'লজ্জা'য় লেখা। মায়াকে তো ধরে নিয়ে গিয়েছিল, মায়াকে তো ওরা ধর্ষণ করেছে। সুতরাং বিয়ে হবে না। মায়ার সঙ্গে কিছু যুবকের আলাপ হয়েছিল, তারা আগ্রহী ছিল প্রেম করতে, বিয়ে করতে, কিন্তু পিছু হটেছিল ওই কানাঘুষায় যে, মেয়ের কুমারীত্ব তো নষ্ট হয়েছে। মেয়েকে মুসলমান ছেলেরা ধর্ষণ করেছে। হিন্দুরা ধর্ষণ করেছে, এটা যত না দুঃসংবাদ, তার চেয়ে বড় দুঃসংবাদ মুসলমানরা ধর্ষণ করেছে। মায়ার বিয়ে হয় না। সে বুঝে যায়, বিয়ে তার হবে না। ওই 'লজ্জা' বইটা যদি না বেরোতো, হত। মায়া চিৎকার করে কাঁদে। বাড়িতে যত 'লজ্জা'র কপি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল, আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। প্রায় কি উন্মাদের মতো সে হয়ে যায়নি? বিদেশবিভূঁই-এ নতুন করে জীবন শুরু করার মতো অভিশাপ আর কী আছে? হাতে কোনও টাকা-পয়সা না নিয়ে, কারও কোনও সহযোগিতা ছাড়া জীবন শুরু করা যায় না। জীবন বরং শেষ করা যায়। মায়া অনেকবার আত্মহত্যা করতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত করেনি। সংসারে হু হু করে অভাব বাড়ে। আর মায়া ছটফট করে। মায়া শেষ পর্যন্ত বিয়ে করলো তপন মণ্ডলকে। মাতাল। বেকার। কেউ কেউ বলে ছোট জাত। জাত নিয়ে কিছু যায় আসে না মায়ার। যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে, সে মুসলমান নয়, সে হিন্দু, এটাই সবচেয়ে বড় খবর। মায়া লুফে নিয়েছিল তপনের প্রস্তাব। বিয়ের ঘোমটা মাথায় শ্বশুরবাড়ি উঠেছে। শ্বশুরবাড়ির কুড়ি-পঁচিশজনের জন্য রান্না করা, তাদের খাওয়ানো, তাদের ঢেঁকুর তোলানো। দুপুরে ভাত, রাতে রুটি। রাতে নিজের হাতে প্রতিদিন পঞ্চাশটা রুটি বানাতে হয়। বাড়ির কাজে তিন জার সঙ্গে ভাগ হয়েছে বটে, কিন্তু নিজের ভাগে পাহাড় সমান কাজ। মায়া কখনও রান্নাঘরের কাজ করেনি। জানে না সে কী করে করতে হয়। এখন শ্বশুরবাড়িতে, রান্না করতে জানি না, সংসারের কাজকর্ম করিনি আগে, বলে রেহাই পাওয়া যাবে না। মাতাল কখনও বাড়ি ফেরে, কখনও ফেরে না। তাকে আদর-আহ্লাদ দিয়ে পোষে যাদবপুরের এক বয়স্ক মহিলা। টাকা-পয়সার অভাব নেই, সেই টাকায় শুয়ে-বসে খায় তপন। মহিলার স্বামী নেই, দুটো ছেলেমেয়ের বিদেশে বাস। কলকাতায় একা, সঙ্গী তপন। তপনের মতো মাতাল বেকারই তার দরকার। মদ খাওয়ালেই কুকুরছানার মতো লেজ নেড়ে পায়ের কাছে ঘুরঘুর করে। বিয়ের পর পরই জা-দের কাছ থেকে সব জেনে গেছে মায়া। অনেক ফেরাতে চেয়েছে তপনকে। মদ ছাড়াতে চেয়েছে, মহিলা ছাড়াতে চেয়েছে, পারেনি। ছাড়াতে চেষ্টা করার সময়ই নিজের শরীর বারবার সে পেতে দিয়েছে, পেতে দেওয়া শরীরের ওপর তপন খেলাচ্ছলে যা করেছে, তাতে দুটো ছেলেমেয়ের জন্মের বীজই রোপণ করা হয়েছে, সত্যিকার কাজের কাজ কিছু হয়নি। তপন ফেরেনি। বিয়ে করতে হয় বলে তাকে করতে হয়েছে। শুতে তার ভালে লাগে বলে শুয়েছে বউ-এর সঙ্গে। কিন্তু বউ-বাচ্চার জন্য কোনও আকর্ষণ জন্মায়নি। বড় পরিবারে বাচ্চারা অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে তরতর করে বড় হয়ে যেতে থাকে। বাবা করে না, বাচ্চাদের খোঁজখবর করে ঠাকুরদা-জ্যাঠামশাইরা। দায়িত্ব মায়ার। একটা ওষুধ কোম্পানিতে সে ঢুকেছিল দেড় হাজার টাকা বেতনে, সাড়ে ছ হাজার টাকা হয়েছে বেড়ে। সংসারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাবারের টাকা দিতে হয় আটশ। বাকিটা ছেলেমেয়ে এবং নিজের কাপড়চোপড়, বিস্কুট-চানাচুর, বাসভাড়া, মেট্রোভাড়া, স্কুল খরচ ইত্যাদিতে চলে যায়। এক পয়সাও কখনও হাতে থাকে না। প্রয়োজনে নিজের মা-দাদার কাছে যে হাত পাতবে, সে জো নেই। মায়া তার পরও শ্বশুরবাড়িতে থাকে, সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর পরে, হাতে পলা শাঁখা, লোহা। ঘরে ঠাকুর-দেবতা। ভীষণ সে কালীভক্ত। সুযোগ পেলেই কালীঘাটে পুজো দেবে, সম্ভব হলে চলে যাবে দক্ষিণেশ্বর। এ ছাড়া তেমন তার নেই সিনেমা থিয়েটার দেখা বা গানের মেলায় যোগ দেওয়া, বা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার শখ। দেশে যা শখ ছিল, বিদেশে এসে সবই ঝেঁটিয়ে বিদেয় করেছে অথবা করতে হয়েছে। সত্যি বলতে, মায়ার কোনও বন্ধু নেই। জীবনে স্বামী নামক প্রাণীর অস্তিত্ব নেই, তার পরও সিঁদুর পরে মায়া। কেন পরে। নিজেকে প্রশ্ন করে নিজেই সে উত্তর দিয়েছে, কারণ আর যেন তাকে সহজলভ্য মেয়ে বলে কেউ না মনে করে। ঘরে-বাইরে-রাস্তাঘাটে। স্বামী-সংসার, শ্বশুরবাড়ি, সিঁদুর, সন্তান— এগুলো থাকলে সম্ভ্রম থাকে। না থাকলে লোকে ছিঁড়ে খায়। মায়ার কাছে শ্বশুরবাড়ি নরক নয়, বরং বেঁচে থাকার জায়গা। স্বামী কখনও দু সপ্তাহ, কখনও মাস গেলে বাড়ি ফেরে। বাড়ির কাছে কয়েক দিন ফুটপাতে মদ খেয়ে পড়ে থাকাকে টেনে বাড়ি ঢুকিয়েছে মায়া। বমি করে ভাসিয়ে দিয়েছে তার শাড়ি-কাপড়। তার পরও মায়া ভাবেনি শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে স্বামী ছেড়ে সে চলে যাবে। কোথায় যাবে, তার তো জায়গা নেই কোথাও। কোথাও গিয়ে আর সে দুর্নাম কামাতে চায় না। আর ঝড়ঝঞ্ঝা চায় না। একটা দশ বাই দশ ফুট ঘরে ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, ওদেরই নিজের দুপাশে নিয়ে মায়া ঘুমোয়। বিছানাতেই খাওয়া, বিছানাতেই লেখাপড়া। বড় খাট পাতলে ঘরে আর তেমন জায়গা কই অন্য জিনিস পাতার? দুটো ছেলেমেয়ে যদি বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ায়, তবে যদি এ বাড়ি থেকে বেরোয়, মায়ের দেখাশোনা করে, মাকে শান্তি দেয়, তার ভরসায় মায়া থাকে।

কয়েক মাস পর পর সুরঞ্জনকে একটা শার্ট কিনে দেয় মায়া, কিরণময়ীকে শাড়ি। একটা নতুন শার্ট বোনের কাছ থেকে পেলে তার আনন্দ হয়, কিন্তু বোনকে সে কী দিতে পারে? কিছুই তো না। মায়া কাঁদে, অভিযোগ করে, চিৎকার করে, ক্রোধে ফেটে পড়ে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাকে ভীষণ ভালোবাসে সুরঞ্জন জানে। যে ভালোবাসে সে যতটা জানে তার চেয়েও বেশি জানে যাকে কেউ ভালোবাসে, সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিরণময়ী মাঝে মাঝে যখন দেশের কথা মনে করে চোখের জল ফেলেন মায়ার সহ্য হয় না। ওই দেশের কথা উচ্চারণ করবে না একবারও। ওই দেশই আমাদের সর্বনাশ করেছে। ওই দেশ আমার জীবনের যত স্বপ্ন, যত সম্ভাবনা সব নাশ করে দিয়েছে। কিরণময়ী বরং দেশের কথা সুরঞ্জনকে বলে শান্তি পান, ছেলে চুপ করে শোনে। বাজার থেকে একটু দেশের এটা, একটু দেশের ওটা কিনে এনে সুরঞ্জনকে রেঁধে খাওয়ান। বেলঘরিয়ায় ভর্তি ছিল দেশের লোক। পার্ক সার্কাসে এসে অবধি কিরণময়ী কোনও দেশের লোকের সন্ধান পায় না। সবই এদেশি, ঘটি। শ-কে স বলে, স-কে শ বলে। উত্তর কলকাতার কিছু ছেলে সুরঞ্জনের কাছে আসে। ওদেরও ওই একই অবস্থা। বাসে চড়া যায় না, সশাংকর শাসন চলছে। কিরণময়ী মায়াকে যে দেশের সুখের স্মৃতি নিয়ে দুটো কথা বলবে, সেই সবাই মিলে সুধাময়ের বন্ধুর বাড়িতে চলে গেল পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙামাটি ঘুরে এলো, মায়া তো ফিরতেই চায়নি, নৌকো করে সবার সুন্দরবন চলে যাওয়া, সেই হাসিখুশির দিন, বৃষ্টি হলেই বাড়িতে খিচুরি আর ইলিশ খাওয়ার ধুম, মায়ার সেই পাড়াজুড়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে খেলার সেই সব দিন। দিন তো ওগুলোই মনে করার, সুখ পাওয়ার। দিন কি আর কিছু আছে, যে দিন নিয়ে গোল হয়ে বসে গল্প করবে, মন ভালো হবে। কষ্টের যন্ত্রণার দিনগুলো কিরণময়ী যত পারেন স্মৃতি থেকে সরিয়ে রাখতে চান। মায়া ঠিক উল্টো, মায়া বাংলাদেশের কোনও স্মৃতিই আর মনে করতে পারে না, তার ওই অপহরণ আর ভাষার যা বর্ণনা করা যায় না তাকে ছিঁড়ে কামড়ে একপাল মুসলমানের ধর্ষণ করা। কলকাতার বৃষ্টি কিরণময়ী জানালায় বসে উদাস চোখে দেখেন, মায়া নেই ভেজার, সুধাময় নেই পদ্মার ইলিশ কিনে আনার। ইলিশের মতো দামি মাছে কারও হাত দেওয়ার জো নেই। দাম কমলে হয়তো কিরণময়ী কিনে আনেন ছোট দেখে ইলিশ। মায়াকে ডেকে খাওয়ান, মায়া সেই ইলিশ এমনভাবে খায়, যেন শুক্তো খাচ্ছে। ইলিশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পদ্মার নাম, পদ্মার সঙ্গে বাংলাদেশের নাম। মায়ার সয় না এত সব। মায়ার আবদারে অনুরোধে খান বটে তিনি, খেয়ে কোনও সুখ পান না। তবু ইলিশ যে খেতে পাচ্ছেন, এ দেখেই সুখে চোখের জল মোছেন কিরণময়ী। সুধাময় থাকলে আজ পরিবারের এমন অবস্থা হতো না। ছেলেমেয়েদের মুখে কখনও একটুখানি হাসি ফুটলে কিরণময়ী সুধাময়ের কথা ভেবে চোখের জল ফেলেন। সুধাময় চলে গেছেন আজ অনেকগুলো বছর হয়ে গেল, তবু চোখের কিছু জল তাঁর জন্য তোলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে কিরণময়ীর। এত অভাব যায়, তিনি সামলে নেন। যুদ্ধ করার দরকার হলে করেন। একাকীত্বে ভোগেন। অনিশ্চয়তা জোঁকের মতো কামড়ে ধরে রাখে। কিছুতেই চোখের জল ফেলেন না কিরণময়ী। কিন্তু সুরঞ্জন যেদিন জড়িয়ে ধরে বলে, মা তোমাকে দেখো গঙ্গার ধারে একটা বাড়ি বানিয়ে দেব। তোমাকে নিয়ে পূর্ণিমায় গঙ্গাবক্ষে নৌকো নিয়ে ঘুরে বেড়াবো। বা মায়া যেদিন একটা শাড়ি এনে পরিয়ে দিয়ে বলে, কী সুন্দর লাগছে মাকে, কী সুন্দর আমার মা। তখন সুধাময়ের কথা মনে করে চোখ ভিজে ওঠে কিরণময়ীর। এই সুখের সময়গুলো তিনি দেখে যেতে পারলেন না।

মাঝে মাঝে যখন খুব খাঁ খাঁ লাগে, সুরঞ্জনকে ডেকে কাছে বসিয়ে চুলে আঙুল বুলিয়ে বলেন কিরণময়ী, চল দেশে ফিরে যাই। শুনে সুরঞ্জন কিছু বলে না। নিঃশব্দে উঠে যায়। পেছনে কিরণময়ী মিহি সুরে কাঁদতে থাকেন। পার্ক সার্কাসে আসার পর থেকে মাঝে মাঝে বলছেন কিরণময়ী, যেখানে ছিলাম, সেখানেই চল চলে যাই, এখানে তো ঘর ভাড়াও বেশি। সুরঞ্জন রাজি হয় না। বলে, ওখানে বন্ধুবান্ধবরা সব শত্রু হয়ে গেছে, ও পাড়া না ছাড়লে মুশকিল হতো। সুরঞ্জন মিথ্যে বলার ছেলে নয়। কিরণময়ী ছেলেকে বিশ্বাস করেন।

কেন, শত্রু হবে কেন? কেন শত্রু বানিয়েছিস তুই? এ পাড়ায় শত্রু যদি বানাস? এ রকম কি এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় দৌড়োবো তোর কারণে?

সুরঞ্জনের সঙ্গে যত সহজে তিনি মনের কথা বলতে পারেন, মায়ার সঙ্গে পারেন না। ভয়ে ভয়েই মায়াকে বলেছিলেন, তসলিমা তোর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে খুব।

কোন তসলিমা? তসলিমা কে? মায়া চোখ কুঁচকে তাকায় কিরণময়ীর দিকে।

তসলিমা নাসরিন।

কী চায় সে? ওই রাক্ষুসী কী চায়? আরও ক্ষতি করতে চায় আমার? যথেষ্ট হয়নি? হয়নি যথেষ্ট? ওই ডাইনির কথা কী করে জানো তুমি? কী করে জানো ডাইনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়?

কিরণময়ী মুখ খোলেন না। সুরঞ্জনের সামনে গিয়ে কোমরে আঁচল গুঁজে দাঁড়ায় মায়া। ওই তসলিমা রাক্ষুসীটার সঙ্গে তোমাদের কারও কথা হয়েছে? দেখা হয়েছে?

সুরঞ্জন বই-এর পাতা উল্টাচ্ছিল। ওভাবে উল্টাতে উল্টাতেই বললো, হ্যাঁ, দেখা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায়?

আমি গিয়েছিলাম ওর বাড়িতে।

আর মা? মার সঙ্গে কী করে দেখা হলো?

সুরঞ্জন এবার ধমকে উঠলো, এত জানার কী দরকার তোর? তুই দেখা করবি না, ব্যস, মিটে গেল।

না, মিটে গেল না। আমি চাই না তোমরা কেউ ওর সঙ্গে কোনওদিন আর কোনও রকম যোগাযোগ রাখো। যদি রাখো... মায়া ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

যদি রাখো... তবে বুঝবো, আমার ওপর যা ঘটেছে বাংলাদেশে, আমার জীবনটা এই যে নষ্ট হয়ে গেল, সব ... সব তোমরা অ্যাকসেপ্ট করছো। তসলিমাকে অ্যাকসেপ্ট করা মানে আমার দুরবস্থা, আমার হিউমিলিয়েশন, দিনের পর দিন রেইপ, একটা ড্রাংক মাংকি, একটা রাস্কেল ইডিয়টের সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা, আমার মুখে, আমার ডেথকে অ্যাকসেপ্ট করা। আর কিছু না।

মায়া মুখে আঁচল চেপে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। পেছনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিরণময়ী, সুরঞ্জন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরঞ্জন পুরুষ মানুষ। নিজের খেয়ালে চলে। যা ইচ্ছে তা করার সুযোগ আছে তার। আজ চাকরি করলো, কাল ছেড়ে দিল। আজ কিছু করতে ইচ্ছে করছে না, করবে না। মা আছেন তার নিরাপত্তায়, শাড়ি-কাপড় বিক্রি করে সংসার চালিয়ে নিতে পারেন। মা দেখাশোনা করেন শার্ট-প্যান্টটা কাচা পায়, বালিশ-বিছানা পরিষ্কার পায়, ক্ষিধে লাগলে খাবার পায়, তার আর অসুবিধে কী! কিরণময়ীও এক রকম ভালো আছেন। স্বামী নেই। সচ্ছলতা আগের চেয়ে কম। কিন্তু ছেলে তো সঙ্গে আছে। বুকের ধন তো আছে পাশে। বউ নেই। ছেলের মনোযোগ বউ-এর সঙ্গে ভাগাভাগি করতে হয় না কিরণময়ীর। যখন সুদেষ্ণা ছিল, সুরঞ্জন সুদেষ্ণাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতো, মার কাছে একটু বসার, মার কিসে ভালো লাগবে না-লাগবে, তা খোঁজ করার সময়ও তার ছিল না। বউকে নিয়ে বেরিয়ে যেত কলেজে, ফিরত একসঙ্গে। সন্ধ্যেয় বাইরেও বেরোতো দুজন। কিরণময়ীর খুব একা লাগতো। ছেলের সংসার হলো না তা ঠিক, বাচ্চাকাচ্চা থাকলে ঘর ভরে থাকতো আনন্দে, কিন্তু তা না থেকেই বা কী এমন খারাপ! এখন সুরঞ্জন সম্পূর্ণই তার। তার কথা ভেবেই সুরঞ্জন ঘরে ফেরে। ঘরে ঢুকেই মা মা বলে ডাকে। কিরণময়ীর মন ভরে যায়। ছেলে কখনও তাকে দুঃখ দিয়ে কথা বলেনি। অসুখ হলে দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে ডাক্তার নিয়ে আসে। জ্বর হলে সারা রাত পাশে বসে থাকে। অসুখ হলেও কিরণময়ীর আনন্দ হয়। ছেলেকে আরও বেশি কাছে পাওয়া যায়। ছেলেকে কাছে পাওয়ার ভাগ্য কজনের থাকে এই বয়সে? আজকাল তো বিয়ে করে ছেলেরা আলাদা থাকে, বিদেশে চলে যায়, নয়তো বউ এমন আগলে রাখে যে ছেলের সাহস হয় না কাছে আসার। সুরঞ্জন হাতে করে আম, আপেল, কলা, কমলা মাঝে মাঝে নিয়ে আসে মার জন্য। মা এসব খাও তো। শরীর ভালো থাকবে। কিরণময়ীর ওতেই শান্তি হয়, ছেলে যে এনেছে। ছেলে যে বলেছে। নিজে সেই ফলফলান্তি ছেলেকেই কেটে কেটে খাওয়ান। টিউশনি করে সামান্য কিছু নিজের কাছে রেখে বাকিটা কিরণময়ীর হাতে দেয়, সংসার চালানোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য। টাকার অংক বিরাট নয়, কিন্তু কিরণময়ীর শাস্তিটা অনেক। ছেলের ভালোবাসা পেতে পেতেই যেন তার মৃত্যু হয়।

সুরঞ্জন বা কিরণময়ীকে নিয়ে নয়, আমার ভাবনা মায়াকে নিয়ে। মেয়েরা তো ভালো থাকে না। মেয়েদের তো এই সমাজটা ভালো থাকতে দেয় না। মায়া নিশ্চয়ই ভালো নেই। মায়ার জন্য ভেতর আমার রক্তাক্ত হতে থাকে। একদিন ফোনে সুরঞ্জন আর কিরণময়ী দুজনের সঙ্গেই কথা বলি। জিজ্ঞেস করি, মায়া কেমন আছে, মায়ার সঙ্গে দেখা করতে চাই। হয় মায়া সুরঞ্জনের বাড়িতে আসুক, গিয়ে দেখা করবো, নয়তো আমার বাড়ি চলে আসুক। আর তা যদি না হয়, আমি ওর শ্বশুরবাড়িতে যাবো।

কিরণময়ী আমার ইচ্ছের উত্তরে কিছু না জানালেও সুরঞ্জন বললো, সে পরে আমাকে ফোন করবে, আমার সঙ্গে মায়ার বিষয়ে কথা বলবে। সারা দিন অপেক্ষা করি, সুরঞ্জনের কোনও সাড়া-শব্দ নেই। পরদিনও একই অবস্থা। আশ্চর্য, কী নিয়ে ব্যস্ত সে, কিছুই আমি অনুমান করতে পারি না। এরপর একটা এসএমএস করলাম, তোমার তো জানানোর কথা ছিল। এরও কোনও উত্তর নেই।

নাহ, পুরুষ মানুষে বিশ্বাস নেই। কিরণময়ীর তো ফোন নেই, থাকলে তার সঙ্গেই কথা বলতে পারতাম। সুরঞ্জনকে ফোনটা কিরণময়ীই কিনে দিয়েছেন, নিজের একটা ফোনের প্রয়োজন অনুভব করেননি। মায়ার জন্য, মায়ায় নাকি পুরো পরিবারটার জন্য? গড়িয়াহাটের ট্রেজার আইল্যান্ড থেকে কিরণময়ীর জন্য দুটো, মায়ার জন্য চারটে শাড়ি আর সুরঞ্জনের জন্য একটা পাঞ্জাবি। সব মিলিয়ে সাত হাজার টাকার উপহার কেনা হলো। এবার গাড়িতে ওঠা, তরুণকে বলা পার্ক সার্কাসের সেই বাড়িতে যাও। গেলে সোজা সুরঞ্জনের বাড়িতে ওঠা। সুরঞ্জন ছিল না, কিরণময়ী ছিলেন। তার হাতে উপহারগুলো দিয়ে চলে আসব, কিরণময়ী হাত ধরে বাধা দিলেন। কিছু না কিছু খেয়ে যেতেই হবে। কবে আমি ও বাড়িতে ভাত খাবো তার জন্য পীড়াপীড়ি। খাওয়া মাত্র শেষ করেছেন কিরণময়ী, না হলে তার সঙ্গে খেতে পারতাম। অবশ্য ওসব দিয়ে আমি বোধহয় খেতেই পারবো না। আমার জন্য একদিন ভালো মাছটাছ কিনে রান্না করবেন, এই তার আশা। খুব আশা।

মায়ার কথা যখন আমি জিজ্ঞেস করি, কিরণময়ী কেঁদে উঠে বলেন, ওর কথা আর বোলো না মা, ওর মাথার ঠিক নেই ওর মাথাটাই শেষ হয়ে গেছে। কী আর দেখবে ওকে? ওকে দেখে তোমার ভালো লাগবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, আপনাদের এই অবস্থা দেখেও কি আমার ভালো লাগছে? মায়া ভালো নেই, আমার মন বলছে, তাই তো মায়াকে দেখতে চাইছি।

কিরণময়ী বলতে থাকেন, ওকে আমি বুঝিয়ে বলবো। বলবো তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে। ওর কোনও বন্ধু নেই। ও কোনও স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে না। বাংলাদেশের ছেলেরা ওকে যে অত্যাচার করেছে, ওর তো বাঁচারই কথা ছিল না। ওসব কী করে যাবে ওর মাথা থেকে, এখনও ওসব ওর কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। ও জোর করে একটা নরমাল লাইফ পেতে চেয়েছে। পেতে চাইলেই কি পাওয়া যায়! তবে মন্দের ভালো একটা চাকরি এখনও করতে পারছে। ভয় হয়, কখন ওর চাকরিটা চলে যায়। চাকরির জায়গায়ও নাকি চিৎকার করে। বাংলাদেশের প্রসঙ্গ এলেই করে। ও দেশের কাউকে দেখলেই অনাস্থা করে। গোটা একটা দেশের ওপর ওর রাগ। ওকে অনেক বুঝিয়েছি, বলেছি, কিছু ভালো লোকও তো ছিল ওই দেশে। মায়া কিছুতেই মানতে চায় না।

আমি চুপ হয়ে শুনি। মায়ার ক্রোধের কারণ বুঝতে চেষ্টা করি। মায়ার জন্য আগের চেয়ে বেশি আমার মায়া হতে থাকে।

আমি তো তারপরও ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই, মাসিমা। কণ্ঠে আমার আবেগ। কিন্তু বুঝি আমার আবেগ আর মায়ার আবেগ দুটো দুরকম। কিরণময়ী বলেন না, কিন্তু বেশ বুঝতে পারি, আমার ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ মায়া। সম্ভবত 'লজ্জা'য় ওকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কথা লিখেছিলাম বলে। আমি তো জানতাম, মায়াকে ওরা মেরে ফেলেছে। কিন্তু মায়া শেষ অবধি বেঁচে আছে। বেঁচে আছে বলেই হয়তো ওকে মৃত্যুর যন্ত্রণা সইতে হয়েছে। সত্যিকার বেঁচে যেত, ও যদি মরে যেত। মেয়েদের তো না মরে মুক্তি নেই। মায়ার জন্য আমার চোখ ভিজে ওঠে জলে।

চা পড়ে থাকে। কিরণময়ী বসে থাকেন। আমি দ্রুত বেরিয়ে যাই। সিদ্ধান্ত নিই, যারা আমাকে ভুল বুঝে আমার মুখদর্শন করতে চায় না, তাদের দ্বারে বারবার কড়া নাড়ার আমার দরকার নেই। আমার মতো আমি থাকবো। নিজের জীবন নিয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তা আমার আছে। কলকাতায় থাকতে এসেছি, পুরো একটা সংসার সাজিয়ে ফেলেছি। এখনও জানি না আমার এখানে বাস করা সম্ভব হবে কিনা। যে কোনও সময় আমাকে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যেতে হবে। কোথায় যাবো, তার কিছু জানি না। কলকাতায় থাকা শুরু করার পর অনেকে বেশ বন্ধু হয়েছে। কিন্তু তাদের বেশিরভাগই সত্যিকার বন্ধু নয়। বুঝি। টের পাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলাম নিজের কাজ নিয়ে। অভিমান কিছুটা ছিল সুরঞ্জনের ওপর। সেই যে ফোন করবে বলেও করলো না, এসএমএস-এর উত্তর দিল না। এত ভালো একটা পাঞ্জাবি উপহার দিলাম, একটা ধন্যবাদ জানালো না পর্যন্ত। আর পনেরো দিন কেটে যাওয়ার পর কিনা একটা ফোন। কী, দেখা করবো? আহ্ মামার বাড়ির আবদার। ভেবেছিলাম বলবো যে আমি ব্যস্ত আছি, দেখা হবে না। পরে কখনো ফোন করো। না। পারিনি বলতে। এই এক জিনিস। কৃত্রিমতা একদমই পারি না রপ্ত করতে। যা ইচ্ছে করে, তা করি। অভিমান যত দিন থাকে, তত দিন আবেগের রশি টেনে রাখি। কিন্তু অভিমানই বা আমার কদিন থাকে?

সুরঞ্জন যে আসতে চাইলো। আমার মনে হয়, ও বোধহয় চারটে শাড়ি আর পাঞ্জাবির যে প্যাকেটটা দিয়ে এসেছিলাম, ওগুলো ফেরত দিতে আসবে। ফেরতের জন্য প্রস্তুত হয়েও ছিলাম। ভেবে নিই, তাহলে নিজের বন্ধুদের মধ্যে বিলি করে দেব ওগুলো। আর কীইবা করার আছে?

কিন্তু সুরঞ্জন যখন আসে, প্যাকেট হাতে নেই। হাতে টিফিন ক্যারিয়ার। কী এতে, খাবার, কিরণময়ী আজই সব নিজের হাতে রান্না করে পাঠিয়েছেন।

এসব আবার কী দিয়েছে, খাবারের আবার কী দরকার, আমার ফ্রিজ ভর্তি খাবার, খেয়ে শেষ করা যায় না, সব ফেলতে হয়। এর মধ্যে আবার খাবার। উফ! এসব বলতে বলতে রান্নাঘরে নিয়ে টিফিন ক্যারিয়ান খুলে মিনতিকে বলি, এগুলো খালি করে বাটিগুলো ধুয়ে দিয়ে দাও। বলি এবং কী রান্না করে দিয়েছেন, দেখতে গিয়ে দেখি ওগুলো। পাঁচফোড়ন দেওয়া মসুরির ডাল, মাছের মাথা দিয়ে কচুর লতি, মুড়িঘন্ট, লটে মাছের শুঁটকি, কুমড়ো পাতা পেঁচিয়ে মাছ ভাজা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকি খাবারগুলোর দিকে। চোখে জল উপচে উঠতে থাকে। চোখ ভেসে যায় জলে।

একটা ছোট্ট চিরকুট টিফিন ক্যারিয়ারের বাটির ওপর আটকে দেওয়া। চিরকুটটি পড়ি।

মা তসলিমা, আমার ভালোবাসা নিও। খাবারগুলো খেও। নিজের হাতে সামান্য কিছু রান্না করেছি তোমার জন্য। এই খাবারগুলো কে তোমাকে রান্না করে খাওয়াবে? তোমার কথা ভেবে একা একা চোখের জল ফেলি আমি। সাবধানে থেকো মা। সাহস রেখো।

কাগজটা আমার হাতে ধরা থাকে। লেখাগুলোর ওপর টুপটুপ করে জল পড়ে ঝাপসা হয়ে যায় লেখা। আমি ঠিক তক্ষুনি ড্রইংরুমে সুরঞ্জনের সামনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে পারি না। আমাকে আরও কিছুক্ষণ ওখানে থাকতে হয় চোখের জল মোছার জন্য, আরও কিছুক্ষণ গলার স্বর শুকনো করার জন্য।

সুরঞ্জন তার সঙ্গে যে মেয়েটাকে নিয়ে এসেছে, একে প্রথম দিন যেদিন ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম, দেখেছিলাম ঢুকেছে। সেই মেয়েই তো। চুল পেছনে বেণী করে বাঁধা। হলুদ ব্লাউজ আর হালকা সবুজ শাড়ি। মেয়েটার মুখে স্নিগ্ধ একটা হাসি আছে। বড় বড় চোখ। মুখশ্রী মিষ্টি। খুব ছিপছিপে নয়, মেদ জমতে চাওয়া শরীর। এখনও জমে উঠতে পারেনি খুব। সুরঞ্জন পাশে দাঁড়ানো। কোঁকড়া চুল। প্রশস্ত কপাল। গভীর চোখ। নাক অত টিকোলো নয়, কিন্তু মুখে মানিয়ে যায় অদ্ভুত। সবচেয়ে সুন্দর ওর ঠোঁট আর চিবুক। কিরণময়ীর ঠোঁট চিবুক যেন বসিয়ে দেওয়া। আর গালে সেই তিল। একটা তিলই মুখটাকে কী রকম যেন বদলে দিয়েছে। সুরঞ্জন আজ পাঞ্জাবিটা পরতে পারতো, পরেনি। পরেছে শাদা সার্ট আর কালো প্যান্ট। সাদা শার্ট পরলে ছেলেদের, লক্ষ করেছি, অদ্ভুত সুন্দর লাগে। ডাঃ সুব্রত মালাকার যখন তার নানা রঙের শার্ট রেখে সাদা শার্ট পরে, সবচেয়ে ভালো লাগে দেখতে। মালাকার আমার শ্বেতির ডাক্তার। কিছুদিন হলো, হঠাৎ হাতে আমার সাদা দাগ দেখা দিচ্ছে। হাতের পিঠেই আছে এখনও দাগগুলো। ছড়ায়নি। মালাকারের চিকিৎসায় আছি, সারার লক্ষণ নেই। কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে বন্ধুত্ব খুব বেশ দ্রুতই হয়। অবশ্য খারাপের সঙ্গেও হয়। খারাপ কী ভালো তা বুঝতে বুঝতে অনেক সময় বছর কেটে যায়।

জুলেখার সঙ্গে তো পরিচয় হয়েছে আপনার। সুরঞ্জন বলে।

বলি, হ্যাঁ হয়েছে।

বসুন। জুলেখার উদ্দেশ্যে বলি।

ওকে তুমি বলুন। ও আপনার থেকে অনেক ছোট।

বয়সে ছোট হলেই আমি তুমি বলতে পারি না সুরঞ্জন। হঠাৎ করে কোনও অচেনা কাউকে আমি তুমি ডাকতে পারি না। ভীষণ অস্বস্তি হয়, তা ছাড়া।

কণ্ঠটি রুক্ষ শোনায়।

পাঞ্জাবি পছন্দ হয়েছে? সুরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা।

হ্যাঁ। ছোট উত্তর।

পরলে না যে!

অত দামি পাঞ্জাবি পরে আমার অভ্যেস নেই। ভাবছি, ওটা পাল্টে কিছু কম দামের নিয়ে নেব কিন্নরি থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন? যেটা দিয়েছি সেটাই থাকুক। মাঝে মাঝে পরো।

তাহলে বিয়ের দিন পরতে হয়।

বলে সুরঞ্জন জুলেখার দিকে তাকিয়ে হাসলো। জুলেখাও ঠোঁট টিপে হাসলো। সুরঞ্জনের এই ব্যবহারের আমি অনুবাদ জানি না। সে কি বলতে চাইছে যে জুলেখাকে সে ভালোবাসে, বিয়ে করবে! নিজের চোখকে আমার বিশ্বাস হয় না। সুরঞ্জন আর যাই করুক জীবনে, মুসলমান কোনও মেয়ের প্রেমে সে পড়বে না, মুসলমান কাউকে বিয়ে করবে না, এর চেয়ে কঠিন সত্য তো আর কিছু ছিল না। হঠাৎ সব পাল্টে গেল কেন? আমি ঠিক বুঝতে পারি না কী বলা উচিত আমার। জুলেখাকে সুরঞ্জন কোনও ফাঁদে ফেলছে, নাকি এ সত্যিই কোনও ভালোবাসার সম্পর্ক! এসব নিয়ে ভাবলে আমার মাথা ভনভন করে। চা করতে চলে যাই। চা মিনতিকে করতে বললেই হয়। কিন্তু আমি কেন নিজেই করতে যাই? ভালো লাগছে না বলে ওদের সামনে বসতে! কেন ভালো লাগছে না? ওরা যদি পরস্পরকে ভালোবাসে, তবে তো আমারই সবচেয়ে খুশি হওয়ার কথা। তার মানে সুরঞ্জন এখন আর কট্টরপন্থি নয়, এখন সে উদার, যাকে সে ভালোবাসে তার ধর্ম দেখে না সে।

চা করতে অনেকটাই সময় নিতে থাকি। হঠাৎ রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায় সুরঞ্জন।

আপনার কী হয়েছে? সোজা প্রশ্ন।

কেন, কিছু হয়নি তো!

চলে এলেন যে!

চা করছি।

চা করতে হবে না। আসুন। কিছুক্ষণ কথা বলে চলে যাই।

চা খেয়ে যাও।

সুরঞ্জন খুব গভীর চোখে আমার দিকে তাকায়। যেন আমার অন্তরাত্মা ভেদ করে যাবে সে। যেন কোনও ভাবনাই আর আমার থাকতে দেবে না ও। ভাবনাগুলো তার যে করেই হোক দেখা চাই।

ওর সঙ্গে কী সম্পর্ক তোমার?

কার সঙ্গে?

মেয়েটা, যাকে এনেছো।

ওহ্, জুলেখার সঙ্গে? কী বলবো?

বলে ফেলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধুত্ব।

শুধু বন্ধুত্ব?

আসলে বন্ধুত্বের চেয়েও বেশি।

প্রেম?

হ্যাঁ প্রেম...। তা বলা যায়।

ও।

গল্প লিখবেন?

না না।

আপনার তো আবার যা দেখেন, যা শোনেন লিখে ফেলার অভ্যেস।

কেন, তোমাদের কথা লিখে কি ভুল করেছি?

কী লাভ হয়েছে আমাদের?

লাভ-এর জন্য লেখা? ইনফরমেশনটা দিচ্ছি, এটা যথেষ্ট নয়?

ইনফরমেশন দিয়ে কী দরকার, যদি লাভ না হয়? যদি কিছুরই পরিবর্তন না হয়।

তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।

ধরুন আমার পা ভেঙে গেছে, আপনি সেটা বিস্তারিত লিখে মানুষকে জানিয়ে দিলেন। মানুষ গুনেটুনে চলে গেল। আমি পা ভাঙা অবস্থায় যেমন আছি, তেমনই রয়ে গেলাম। সেইজন্যই বলছি, জানিয়ে কী লাভ? যদি আমার ভাঙা পায়ের কোনও ট্রিটমেন্ট না হয়, তবে জানিয়ে তো কোনও লাভ নেই।

ক্ষতি তো নেই? রাগ ফুটে ওঠে আমার চাপা স্বরে।

ততোধিক রাগত গলায় সুরঞ্জন বলে, হ্যাঁ ক্ষতি আছে।

কী ক্ষতি?

আমাকে কেউ খেলায় নেবে না। আমাকে কেউ গোনায় ধরবে না। ভাববে আমি পঙ্গু। আমি আউটকাস্ট। আমার পা ভালো হয়ে গেলেও আমি আর শক্ত সমর্থ বলে ট্রিটেড হব না।

আমি থামিয়ে দিয়ে বলি, এটা কোনও কথা না...

আমাকে থামিয়ে সুরঞ্জন বলে, হ্যাঁ কথা।

সুরঞ্জনের চোখে স্থির চোখে তাকিয়ে বলি, এ নিয়ে পরে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলবো...

আমি চা নিয়ে ড্রইংরুমে এলাম। জুলেখা জুলজুল চোখে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। আপনি কোথায় থাকেন, কী পড়েছেন, কী করেন, আদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ি কোথায়, ভাই-বোন কজন ইত্যাদি জিজ্ঞেস করি, কিন্তু জিজ্ঞেস করি না আসল কথাটা, যেটা মন কামড়ে বসে আছে, সুরঞ্জনের সঙ্গে আপনি কি প্রেম করেন? জুলেখা ধীরে ধীরে উত্তর দেয়। মফস্বলের একটা সাধারণ মেয়ে বলে তাকে মনে হয়। নিরীহ গোছের কিছু। এর সঙ্গে সুরঞ্জনকে ঠিক মানায় না। কেন মানায় না ভাবতে থাকি। আমি তো বাহির দেখতে কেমন, তা নিয়ে ভাবার মানুষ নই। মানুষের ভেতরটা কেমন, তা দেখি। যদি না মেলে মনে, তবে তো সম্পর্কের পাথর বয়ে বেড়াবার কিছু নেই।

সম্পর্ক ওদের যাই হোক না কেন, আমি কেন মাথা ঘামাচ্ছি। সুরঞ্জন আমার উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ছাড়া কিছু তো নয়। ওর সঙ্গে বহু বছর পর হঠাৎ দেখা। কেমন আছে, কী করছে সৌজন্যবশত জানতেই পারি। কিন্তু আমার ভুলে গেলে চলবে না যে বাংলাদেশের সুরঞ্জন আর এখানকার সুরঞ্জনে আকাশ-পাতাল তফাত। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের তফাতটাই তো বিশাল। সুরঞ্জন তখন সংখ্যালঘু, এখন সে সংখ্যাগুরু। সংখ্যাগুরুর পক্ষে তাবৎ সমাজ। সুতরাং তার দারিদ্র্য নিয়ে চোখের জল ফেলার কিছু নেই। সুযোগ পেতে চাইলে সে সুযোগ পেয়ে যাবে অবস্থার পরিবর্তন করার। জুলেখার সঙ্গে সম্পর্কটা তার সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত ব্যাপার! তার যদি ভালো লাগে একটা মুসলমান মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে, তবে অসুবিধে কী?

সুরঞ্জন জুলেখার পাশে বসে একটু ঘনিষ্ঠভাবেই বসে। আমি ঠিক বুঝতে পারি না, ঘনিষ্ঠভাবে সময় কাটানোও ওদের এখানে আসার উদ্দেশ্য কিনা। হতে পারে দুজনের বাড়িতেই এখন এ নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। তাই জায়গা খুঁজছে কোথাও ঘনিষ্ঠ হবার। নাকি আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে। জরুরি কোনও কথা ওদের আছে বলেও আমার মনে হয় না। উঠে স্টাডিতে চলে যাই। এত লেখার কাজ অথচ কিছুই করছি না। আলমারিতে থরে থরে সাজানো বই, কবে এগুলো পড়বো, কবে মাথায় বসে থাকা ভাবনাগুলো লেখায় নামাবো। সুরঞ্জন আর জুলেখা বরং ও ঘরে বসেই নিভৃতে সময় কাটাক।

ডেস্কে কম্পিউটারের সামনে বসে ইয়াহু ম্যাসেনজারে ম্যাসেজ পাঠাতে থাকা ইয়াসমিনের কী করছো, কোথায় তুমির উত্তর লিখে দিই, সুরঞ্জন এসেছে, কথা বলছি।

হু ইজ সুরঞ্জন?

'লজ্জা'র সুরঞ্জন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই নাকি লিখে ইয়াসমিনের পঁচিশটা বিস্ময় চিহ্ন। ওয়াও, ওরা আছে কেমন?

আছে খুবই ভালো। আচ্ছা বল তো তুই, সুরঞ্জন আমার শান্তিবাগের বাড়িতে কবার গিয়েছিল?

তুমি বলেছিলে দুবার।

কেন, তুই দেখিসনি?

না, কী করে দেখবো?

ডিসেম্বরে থাকিস না তুই শান্তিবাগে?

না না না বুবু, তুমি এত ভুলে যাও কেন? ৬ ডিসেম্বর ভালোবাসার জন্ম হলো। আমি তো তখন ময়মনসিংহে।

ও তাই তো।

এটুকু কথা হতেই মিনতি এসে বললো, ওরা চলে যাচ্ছে।

আমি লেখা ফেলে দ্রুত ওদের কাছে গেলাম। কেন, কী হয়েছে?

এক্ষুনি যাওয়ার কী হলো!

যেতে হবে।

আর বসবে না?

সুরঞ্জন বললো, না।

কী হলো, খেপেছো নাকি?

না না।

AMARBOI.COM

এত না না কেন? সুরঞ্জনের হাত ধরে সোফায় বসিয়ে দিই। জুলেখা মিহি গলায় বলে, আমাদের যেতে হবে।

জুলেখার এই কথা শুনে সুরঞ্জন দাঁড়িয়ে যায়। আমি ঠিক বুঝি, তার ইচ্ছে না করলেও এটা জুলেখার সিদ্ধান্ত যে তারা যাবে এখন।

আপনার কোনও গল্পই কিন্তু আমার শোনা হলো না জুলেখা।

জুলেখা একটু হেসে বলে, আমি তো বিখ্যাত কেউ নই, আমার গল্প লিখে কী লাভ?

কে বললো আমি আপনার গল্প লিখতে চাই?

জুলেখা হেসে বললো, আমিই বললাম।

গল্প লিখে লাভের কথা উঠলো। বললাম, কার লাভের কথা বলছেন?

জুলেখা কোনও উত্তর দিল না। বললাম, আমি কি বিখ্যাতদের নিয়ে গল্প লিখি বলে আপনার মনে হয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলেখা বলে, লিখে আপনি বিখ্যাত হন, আর যাদের নিয়ে লেখেন, তারাও বিখ্যাত হয়ে যায় রাতারাতি। ঠোঁট টেপা হাসি তার।

আমি মানি না। সুরঞ্জন তো বিখ্যাত হয়নি। আমার কণ্ঠটি নিরীহ কণ্ঠ।

জুলেখা রহস্যময় হাসলো। আমি সরলতার অনুবাদ করতে পারি, জটিলতার পারি না। সুরঞ্জন দাঁড়িয়ে জুলেখার হাত ধরলো। তার উষ্ণ হাতে আরেকটি উষ্ণ হাত। আমার চোখ ওই হাত দুটো থেকে ফিরতে চায় না। ওই হাত দুটো দুটো জরুরি চরিত্র হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি কেবল হাঁটু নুয়ে বসে তাদের গতি প্রকৃতি দেখতে চাই অপলক।

ওরা চলে যাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে একটা বালিশ মুখের ওপর চেপে চোখ বুজে থাকি। বুঝি যে ওদের সঙ্গে আমার আরও সময় ব্যয় করা উচিত ছিল। সুরঞ্জনের কাছে আমি অনেক বড় একজন, তাই সে তার প্রেমিকাটিকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু এতই কম আমার উৎসাহ যে, ওরা চলে যেতে বাধ্য হলো। সুরঞ্জন কি ভেবেছে আমি ওকে মোটেও গুরুত্ব দিচ্ছি না? কিন্তু ও একা এলেই বুঝতে পারতো, কতটুকু গুরুত্ব ওকে দিই। সুরঞ্জনের সঙ্গে আমি জানি না কেন, জুলেখাকে দেখতে আমার ভালো লাগে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনেপুকুর লেনে জুলেখাকে তার মামার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সুরঞ্জন জাননগর রোডে তার বাড়িতে গিয়ে কিছু না খেয়ে শুয়ে পড়ে। কিরণময়ী বলেন, নিশ্চয়ই তসলিমার বাড়িতে খেয়ে এসেছিস।

সুরঞ্জন কোনও উত্তর দেয় না।

আজ জুলেখা বলেছে, স্ট্রেঞ্জ।

স্ট্রেঞ্জ কেন? সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো।

কী রকম যেন! লেখা পড়ে কিন্তু এ রকম মনে হয় না। জুলেখা ধীরে, ঠোঁট উল্টে উল্টে বলে।

না, এ রকম না। একেবারে সাধারণ উনি, তাই না? ব্যবহারটাও যেন কেমন! হঠাৎ করে ঘরের ভেতর ঢুকে গেলেন। বেরোচ্ছেন না। গেস্টদের বসিয়ে রেখে... তুমি কী বলো? ঠিক করেছেন?

সুরঞ্জন মাথা নেড়ে বলে, হয়তো কাজ ছিল। লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আমাদের যে সময় দিয়েছে, তাই তো বেশি।

শোনো বাবু, তুমি একটু বেশি তসলিমা তসলিমা জপো। আমার ভাল্লাগে না।

সুরঞ্জন ভাবতে বসে, আসলেই কি তসলিমা জপে? না, সে জপে না। সে কিছুই করে না তসলিমার জন্য। একটা মেয়ে এখানে এই কলকাতা শহরে কলকাতাকে ভালোবেসে থাকছে। তার এই ভালোবাসার মূল্য কি কলকাতা দিচ্ছে? না, দিচ্ছে না। ভালোবাসা নিজেও তো প্রকাশ করেনি একবারও। মায়াকে এত দেখার ইচ্ছে, অথচ মায়া তো বিগড়ে আছে। কেউ কি কিছু করতে পারছে তসলিমার জন্য? সে তো মানুষকে ভালোবেসেই যাচ্ছে। যারা দেয় দেয় আর দেয়, মানুষ ভুলে যায় যে তারা শুধু দেওয়ার মানুষই নয়, পেতেও তাদের ভালো লাগে। তসলিমাকে কিছু দিতে ইচ্ছে হয় সুরঞ্জনের। কী দেবে, ভেবে পায় না।

সুরঞ্জন আর কীইবা দিতে পারে, দেওয়ার তার আর আছে কী? জীবনটা অদ্ভুত রকম বদলে গেছে। এই জীবনটা তার নতুন জীবন। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের সঙ্গে তার আগের জীবনের কোনও সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশে একটা জীবন ছিল তার, স্বপ্নময় একটা জীবন। সেই জীবনে শিক্ষিত সচেতন আদর্শবাদী মানুষেরা ছিল তার চারপাশের মানুষ। শ্রেণিসংগ্রাম, শ্রেণিশত্রু বিলোপ, প্রলেটারিয়েটের ক্ষমতা দখল, সমাজতন্ত্র এসব শব্দ এখন হাস্যকর লাগে শুনতে, কিন্তু এগুলোর সংজ্ঞা, তত্ত্ব ও তথ্য সুরঞ্জনকে একটা অর্থপূর্ণ জীবন দিয়েছিল। এসবের মধ্যে থেকে নিজেকে মনে হতো জীবনটা খুব জরুরি। খুব মূল্যবান। কিন্তু এ দেশে আসার পর থেকে তার চলাচল অন্য স্তরে। কঠোর বাস্তবতা। কুৎসিত দারিদ্র্য। কঠিন জীবন। এখানে সুরঞ্জনকে কেউ চেনে না। যে কোনও দিকেই সে যেতে পারে। যা কিছুই করতে পারে। সোনাগাছিতে রাতের পর রাত কাটাতে পারে, খালাসিটোলার মদ গিলে পড়ে থাকতে পারে, কেউ তাকে তুলে আনারও নেই, ছি ছি করারও নেই।

সুরঞ্জনের এই জীবনটা নিয়ে আবেগের তিল পরিমাণ কিছু নেই। সুদেষ্ণাকে বিয়ে করা, কলেজে পরানো সেই সময়টায় নতুন করে স্বপ্ন গড়ার ইচ্ছেটা তখনও ভেঙে পড়েনি। তারপর তো সব ভাঙলো, আবার যে কে সেই! স্বপ্নহীনতা গ্রাস করে ফেলেছে তাকে। কী করছে, কেন করছে, তার হিসাব রাখছে না।

রাজনীতির ছেলে সে, আর রাজনীতি থেকেই কিনা সম্পূর্ণ মন উঠেছে। মুসলিম মৌলবাদী আর হিন্দু মৌলবাদী দলে সে এখন কোনও পার্থক্য দেখে না। কোনও রাজনৈতিক দলই তার ভেতরে কোনও আগ্রহ সৃষ্টি করে না। মাওবাদীদের নিয়ে একটা সময় বেশ উত্তেজিত ছিল সে। কিন্তু সেই উত্তেজনাও উবে যায়। মানুষ হত্যা করে যতই সে অতিবাম হোক, বিশ্বাস করে না কিছু হবে। রাজনীতির ছেলে জানে না কখন ধীরে ধীরে রাজনীতিকে ছুট্টি দিয়ে দিয়েছে। জীবন যখন অর্থহীন হয়ে ওঠে, জগৎ যখন অর্থহীন তখন কোনও কিছুর প্রতি তার আগ্রহ সৃষ্টি হয় না। শুধু জীবনটা হেলেদুলে কাটিয়ে দেয়। অতীত বলে কিছু থাকে না, ভবিষ্যৎ বলেও না। কেবল বর্তমানটাই যাপন করে।

জুলেখাকে সে যাপন করছে। রাতে বাড়ি ফেরে কিরণময়ী আছে বলে, তা না হলে হয়তো কোথাও কোনওখানে কাটিয়ে দিত। কোনওভাবে কাটিয়ে দেওয়াই যখন কথা। এ রকম হতাশা সুরঞ্জনকে সেই বাংলাদেশ থেকেই গ্রাস করে ছিল, এখনও ছাড়েনি। ভেবেছিল দেশ ছাড়ার পরই বুঝি জীবন ভীষণ নিরাপদ হয়ে উঠবে, সুখ-শান্তি-স্বস্তি– সব এসে ঘিরে ধরবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন একটি সম্ভাবনাময় স্বপ্নময় জমকালো জীবন হাতের মুঠোয় এসে বসবে। ওপারেতেই সকল সুখ আমার বিশ্বাস, এই আশায় বা ভরসায় সুরঞ্জন দেশ ছাড়ার পর প্রথম ধাক্কাটা সে খায় চার লাখ টাকা মার খাওয়ায়। শংকর ঘোষকে কী বিশ্বাসই না করতো সুরঞ্জন, তার বাবা মা! আর সেই লোকটাই কি না দিব্যি টাকাটা ফেরত না দিয়ে পা নাচিয়ে গেল। আত্মীয়ের বাড়ির দুর্ব্যবহার তার দ্বিতীয় ধাক্কা। পার্টি অফিস থেকে টাকা না দেওয়া ধাক্কা। মায়ার শরীরে আত্মীয়ের হাতের ধাক্কা। সব ভুলে সে ঘর সংসার করবে, স্বাভাবিক জীবনে ফিরবে, মা-বোনকে নিরাপত্তা দেবে, কিন্তু সুদেষ্ণার অমন কিরণময়ী আর মায়ার মতো নিরীহ দুটি মানুষকে সহ্য করতে না পারা আরেকটা বড় ধাক্কা। সুদেষ্ণার ৪৯৮ (ক) মামলা আরেকটা ধাক্কা। উঠে বারবারই সে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে কিরণময়ীর জন্য, মায়ার জন্য। অপদার্থের জীবন সে যাপন করছিল, করছিল। কিন্তু তাতেও সম্পূর্ণ হয়নি ষোলোকলা। নিজেই নিজেকে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি দিল এরপর। মায়ার মতোই নিরীহ এক মেয়েকে তুলে এনে মস্তানি করলো, আর তার ফলে তাকে দেখাতে হলো লোকের ভয়াবহ নির্লজ্জতা, নির্মমতা। তারই তো অবয়ব তারা। তাদের মুখে নিজের মুখটিই সে দেখতে পেয়েছে এবং নিজেকে সে ঘৃণা করেছে। সুরঞ্জন জগতের কাউকে আর এত ঘৃণা করে না, যত ঘৃণা সে নিজেকে করে।

কী দেবে সে 'লজ্জা'র লেখিকাকে। কিছুই না। কিছু দেবার যোগ্যতা তার নেই। প্রেম থাকলে জুলেখাকে সে সরিয়ে নিয়ে আসতো ওই দুঃসহ জীবন থেকে। সব দুঃসহবাসের কারণ তো সে নিজে। সে যদি তুলে নিয়ে না আসতো জুলেখাকে মহব্বতের বাড়ি থেকে, একের পর এক দুর্ঘটনাগুলো ঘটতো না। সুরঞ্জন বোঝে যে প্রেম যেহেতু নেই আর তার মধ্যে, জুলেখাকে নিয়ে যা সে করছে, সবই তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। একদিন জুলেখা বুঝবে, আজ না বুঝলেও। সেদিন জুলেখাও, সুরঞ্জন জানে যে তাকে ত্যাগ করবে। যে মায়া আজ তার মায়ার জন্য, ধীরে ধীরে একই রকম মায়া তার জন্মেছে জুলেখার জন্য। দুজনকে বুকে জড়িয়ে রাখতে চায় সে, দুবাহুতে দুজনকে টেনে। কিন্তু মায়া তো তা হতে দেবে না।

সুরঞ্জনের মতো অকর্মণ্য আর অপদার্থকে তিনটে প্রাণী ভালোবাসে,– কিরণময়ী, মায়া, জুলেখা। এদের মধ্যে সে যোগ করলো আরেকজনকে, তসলিমা। জুলেখা তাকে ছেড়ে কোনও দিন হয়তো চলে যাবে। কিন্তু তসলিমার সৃষ্টি সে, সৃষ্টি ছেড়ে স্রষ্টা যদিও যায়, খুব দূরে কোথাও যেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে না। —এসব সুরঞ্জনের সারারাতের না ঘুমোনো ভাবনা। ভোরবেলা বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে পাখিদের কিচির মিচির শুনতে শুনতে তার মনে হয়, সে তো কারও রচিত নয়, সৃষ্ট নয়। সে তো রক্ত-মাংসের মানুষ। তার তো অস্তিত্ব আছে। মাঝে মাঝে অবশ্য মনে হতো, তার বোধহয় নেই সেটি। 'লজ্জা' পড়ে, লজ্জায় সুরঞ্জন যা যা করেছে, বাস্তবের সুরঞ্জন মোটেও তা করেনি জেনেও মনে হয়েছে হয়তো করেছে। যেমন, 'লজ্জা'য় সবাই শুদ্ধ বাংলায় কথা বলে। অথচ সুরঞ্জনের পরিবারের কেউই ও ভাষায় কথা বলতো না, বলতো আঞ্চলিক বাংলায়। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও আঞ্চলিক বাংলায়; শুধু যতীন চক্রবর্তী, কবীর চৌধুরী, সাইদুর রহমান বইয়ের ভাষায় কথা বলতেন।

'লজ্জা'র ১৪৩ পৃষ্ঠায় আছে সুধাময় বলছে, রাত করে ঘরে ফিরছিস। কাল হাবিব এসেছিল, ভোলায় নাকি খুব খারাপ অবস্থা। হাজার হাজার লোক খোলা আকাশের নিচে বসে আছে, বাড়িঘর নেই। মেয়েদের নাকি রেপ করছে। সুরঞ্জন বলছে, এসব কি নতুন খবর? সুধাময় বললো, নতুনই তো। এসব কি আগে কখনও ঘটেছে? তাই তো তোকে নিয়ে ভয় সুরঞ্জন। সুরঞ্জন উত্তর দিল, আমাকে নিয়েই ভয়? কেন, তোমাদের জন্য ভয় নেই? তোমরা হিন্দু নও? সুধাময় বলল, আমাদের আর কী করবে? সুরঞ্জনের উত্তর, তোমাদের মুণ্ডু বুড়িগঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে। এখনও চেনোনি এ দেশের মানুষকে। হিন্দু পেলে ওরা নাস্তা করবে, বুড়ো-ছেলে মানবে না। আসলে, সুরঞ্জন জানে কথাগুলো ঠিক এ ভাষায় ছিল না। ছিল এ রকম— রাত কইরা ঘরে ফিরস। কালকে হাবিব আইছিল, ভোলায় নাকি খুব খারাপ অবস্থা। হাজার হাজার খোলা আকাশের নিচে বইসা আছে। বাড়িঘর কিচ্ছু নাই। মেয়েদের নাকি মানে ধইরা ধইরা নিতাছে...।

— এই সব কি নতুন খবর?

— নতুনই তো! এই সব কি আগে কখনও ঘটছে? তাই তো তর কথা ভাইবা ডর লাগে।

— ডর আমার লাইগ্যা ক্যান? তুমগর লাইগ্যা লাগে না ডর? তুমরা কি হিন্দু না নাকি?

— আমগোরে আর কী করবো?

— কী করবো? তুমগর কল্লাডা বুড়িগঙ্গায় ভাসাইয়া দিব। অহনও চিনো না এই দেশের মানুষগরে। হিন্দু পাইলে ওরা নাস্তা করবো, কিছু মানবো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকার ভাষায় এখন তার কথা বলা হয় না, কলকাতায় ভাষায় বলতে বলতে অভ্যেস হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে কিরণময়ীর সঙ্গে ও-ভাষায় কথা বলে। মায়া তো বলতেই চায় না। জুলেখা এ দেশি মেয়ে, ও তো জানেই না ঢাকার, ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষা। আর বন্ধু যারা আছে, তারা কলকাতার ভাষাতেই বলে। বন্ধুই বা আর কজন আছে তার? বেলঘরিয়ার বন্ধুদের সুরঞ্জন ত্যাগ করেছে। ঢাকার জীবনের সঙ্গে কলকাতার জীবনের যেমন তফাত, বেলঘরিয়ার জীবনের সঙ্গে পার্ক সার্কাসের জীবনেরও সে রকম তফাত। এক জীবনে কতগুলো জীবন যে সুরঞ্জন যাপন করছে। তার মতো সাধারণ ছেলেকে 'লজ্জা'য় অসাধারণ বানানো হয়েছিল। কিন্তু নিজে সে জানে কী রকম সাধারণ সে। কী রকম যে কেউ। বেগবাগানে বেনেপাড়ায় তাঁতিবাগানে তার নতুন বন্ধু গড়ে উঠছে। আফতাব, হাকিম, এনামুল, সোবহান, সাধনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, এদের মানসিকতা বেলঘরিয়ার বন্ধুদের মন-মানসিকতা সম্পূর্ণ বিপরীত। কিছু না কিছু করছে সে, রক্তদান শিবির করা, একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র করা, বয়স্কদের একটা স্কুল করা, সব বিষয়ে তাল দিচ্ছে। সব সময়ই উত্তেজক নয় সবকিছু। হতাশাও গ্রাস করে রাখে এদের। সুরঞ্জন হতাশার মাস্টার। তার কথাই হলো, জীবনে কিছুই হলো না, কিছু হবেও না। আশাটাশা বাদ দিয়ে গাঁজায় টান দেওয়া অনেক বুদ্ধিমানের কাজ। কী হলো না জানতে চাইলে বলে সে কী যে হওয়ার ছিল তাও তো জানি না। পার্ক স্ট্রিট মল্লিক বাজার মোড়ে চায়ের দোকান, মদের দোকান, মডার্ন ফার্মেসি এগুলোয় সন্ধ্যেবেলা আড্ডা দেওয়া এখন নেশার মতো। এর আগেও আড্ডাবাজি কম করেনি সুরঞ্জন। বেলঘরিয়ায় তো দলই গড়ে উঠেছিল বড়সড়। ফিডার রোডে সন্ধ্যেবেলা ওদের জমজমাট আড্ডা বসতো। মদ খাওয়াটা ছিল ওদের নিত্য রাতের ঘটনা। মদে না কুলোলে স্টেশনে গিয়ে গাঁজার খোঁজ করা মাত্র জুটে যায়। গৌতম, রূপক, মানস, তন্ময়, জয়দেব, অচিন্ত্য— এরা ছিল তার সঙ্গী। সোবহানের সঙ্গে কিছুদিন সুরঞ্জনকে ঘুরতে দেখার পর শুরু হলো সমালোচনা, এর বাড়ি কোথায়?

ফিডার রোডে।

নাম কী?

সোবহান।

বাঙালি না?

বাঙালি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পকেট চেক করেছিস। বোমাটোমা থাকে না?

ধুত।

বাঙালির সাথে মিশছিস, বাঙালির সাথে মেশ। হঠাৎ মুসলমানের পাল্লায় পড়লি কেন!

সোবহান তো বাঙালি।

বাঙালি আবার কী করে? ও তো মুসলমান।

মুসলমানরা কি বাঙালি হয় না?

কী করে হবে?

যে করে হিন্দুরা বাঙালি হয় সেই করেই মুসলমানরা বাঙালি হয়। বৌদ্ধরাও, খ্রিস্টানরাও হয়। নাস্তিকরাও কিন্তু বাঙালি হয়। একটা হলো জাতি, আরেকটা ধর্ম। ধর্ম ভিন্ন হলেও জাত কিন্তু অভিন্ন হতে পারে।

সুরঞ্জনের কথা শুনে বন্ধুরা কেউ হো হো হেসে ব্যঙ্গ করে। কেউ সুরঞ্জনের পেটে গুঁতো দিয়ে বলে, শালা মুসলমানের মার পিঠে যথেষ্ট বুঝি পড়েনি।

সুরঞ্জন হেসে বলে, পড়েছে, পড়েছে। যথেষ্টই পড়েছে। না পড়লে কি আর ও দেশ ছেড়ে আসি? তবে যাই বলিস তোরা, অবাঙালি মুসলমান যেমন আছে, তেমন যে বাঙালি মুসলমানও আছে, তা তো তোদের জানা উচিত। যেমন অবাঙালি হিন্দু যেমন আছে, তেমন বাঙালি হিন্দু আছে।

অতো জ্ঞান দিস না তো! কেউ একজন বলে।

এগুলো তো জ্ঞান দেওয়া নয়। এগুলো সাধারণ জ্ঞান। তোদের তো বেসিক নলেজটাই নেই রে!

ফুঃ

ইতিহাসটা পড়।

তুই কী জানিস ইতিহাসের?

আমি তো কলেজে ইতিহাস পড়াতাম।

কোন কলেজে শুনি!

দমদম কলেজে।

ও রকম কলেজে রাস্তা থেকে লোক তুলে নিয়ে গিয়ে টিচার বানিয়ে দেওয়া যায়। ও কলেজে আমিও এখন গিয়ে ফিজিক্স পড়াতে পারি। নো প্রবলেম।

সুরঞ্জন বাংলাদেশের ছেলে। তেরো কোটি বাঙালির সঙ্গে বাস করেছে সে। তাদের বেশিরভাগই ছিল মুসলমান। সুরঞ্জন জানে বাঙালির সংজ্ঞা। কিন্তু জানে না অশিক্ষিত বাঙালি মুসলমানরাও এই ভুল কোনও দিনই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেনি যে, বাঙালি মানে শুধুই বাঙালি মুসলমান, কিন্তু শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুও অহর্নিশি এই ভুল করে যাচ্ছে যে বাঙালি মানে বাঙালি হিন্দু।

তর্ক শুরু হলে একদিন সুরঞ্জন এক পক্ষে, বাকিরা অন্য পক্ষে। নিজেই পরে ওদের হয়ে সে ভাবতে চেষ্টা করলো যে, হয়তো চারদিকে অবাঙালি মুসলমানের বাস এত, তাই হয়তো ওদের শুধু মুসলমান বলেই উল্লেখ করে। কিন্তু বাংলায় কথা বললেও, সোবহান তো বাংলাতেই বললো, শুদ্ধ সুন্দর বাংলায়, সুরঞ্জনের চেয়েও শুদ্ধ বাংলায়, একেবারে ঘটি উচ্চারণে, তার পরও সোবহানকে গৌতম, মানস, অচিন্ত্য আর রূপক বললো যে ও মোহামেডান, বাঙালি না।

সুরঞ্জন রেগে ওঠে। রেগে ওঠে মুসলমানের প্রতি তার কোনও সহানুভূতির কারণে নয়। রেগে ওঠে হিন্দুদের অশিক্ষা এবং অজ্ঞানতা দেখে। সুরঞ্জন তার বন্ধুদের বোঝাতে চেষ্টা করে বাঙালি-অবাঙালির পার্থক্য। না, তারা বোঝে না। তাদের মাথায় ঢোকেই না যে হিন্দু ছাড়া কেউ বাঙালি হতে পারে। আপাতত ঢুকলেও আবার কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে যায়।

ফিডার রোডে সবাই বাঙালি, শুধু হাতে গোনা কজন মোহামেডান বা মুসলিম।— সেই মুসলমানরা অবাঙালির নয় জেনেও তো সুরঞ্জনের হিন্দু বন্ধুরা এভাবেই বলে।

AMARBOI.COM

সুরঞ্জন হাল ছেড়ে দেয়, পৃথক পাড়ায় বাস বা সেগ্রেগেশন যদি জন্ম থেকে কেউ দেখে আসে, ওর মধ্যেই বড় হয়ে ওঠে, তবে হয়তো এই ভাষাতেই লোকে কথা বলে। কিন্তু শিক্ষাটা থাকলে, শিক্ষায় ঘৃণাটা না থাকলে ভাষাটা নির্ভুল হতে পারতো।

এ তো কিছুই না, যখন জুলেখাকে দেখলো ওরা, তখন কয়েকজন চোখ ছোট করে হেসেছিল। কথোপকথন এ রকম ছিল।

কী রে, এ আবার কে? কোন পাড়ায় থাকে?

থাকে কলকাতায়।

মাল তো খারাপ না।

মুখ সামলা।

ঝুলে আছিস নাকি?

হুম।

নাম কী?

জুলেখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানে? মোহামেডান?

নাম শুনে বুঝিস না?

সুরঞ্জনের বন্ধুদের মুখ থমথমে। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে সবগুলোর। পারলে তারা হাসি হাসি তার মুখখানার আকৃতি কিলিয়ে বদলে দেয়।

এরপর জুলেখার সঙ্গে সুরঞ্জনের সম্পর্ক নিয়ে উত্তেজিত হতে থাকে আড্ডার পরিবেশ। কয়েক দিন জুলেখাকে বেলঘরিয়ায় নিয়ে এসেছিল সে। কথাবার্তা নিজের ঘরে বসেই ভালো বলা যায়। নন্দননগরে তার দুঘরের ছোট বাড়িটির জানালার ধারে বসে ঝিলের দিকে তাকিয়ে দুজন গল্প করতো। জুলেখার সঙ্গে কথা বলে সুরঞ্জনের কোনওদিন মনে হয়নি যে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। বন্ধুদের সঙ্গ একটা বিরাট আকর্ষণ। সেটা সন্ধ্যেবেলাতেই সে সমস্ত শরীর টের পায়। আকর্ষণটা বোঝে সুরঞ্জন, অভ্যেসের, মদের, হালকা মজার কথাবার্তা শোনার এবং বলার। এই আকর্ষণ ছেড়ে তার হঠাৎ নন্দননগরের এত দিনের বাস ছেড়ে পার্ক সার্কাসের মতো একটা উদ্ভট জায়গায় বাস করার কথা নয়। কিরণময়ী তো ভীষণ আপত্তি করেছিল। কিন্তু কোনও আপত্তি সে মানেনি। আমজাদকে বলাতে সে খোঁজ দিয়েছিল জাননগর রোডের বাড়ির। নন্দননগরের বাড়ির ভাড়া দেড় হাজার। শহরের বাইরে থাকার চেয়ে শহরের মধ্যে থাকার উপকারিতার কথা সে কিরণময়ীকে বুঝিয়েছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে জুলেখা তো ছিলই। কারণ জুলেখাকে নিয়ে হেন অশ্রাব্য বাক্য নেই যে বন্ধুরা বলেনি। ওই মুসলমানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে সুরঞ্জনের বাপের সাধ্য নেই পাড়ায় থাকে বলে দিয়েছে। পকেটে ক্ষুর নিয়ে ঘোরে ওরা। সন্ধ্যেবেলা একদিন বেলঘরিয়া স্টেশনে জুলেখাকে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়ে দেখে মানস দাঁড়ানো। মানস দৌড়ে ট্রেনে উঠলো। দেখে সুরঞ্জনের ট্রেনে ওঠার কথা ছিল না, কিন্তু ওঠে। জুলেখাকে আগলে রাখে। মানস বিধাননগরে নেমে যায়। দেখে সুরঞ্জনও নামে বিধাননগরে। মানসকে ধরে পেছন থেকে।

কী রে, কী মতলব নিয়ে উঠেছিলি ট্রেনে?

সাবধান হয়ে যা সুরঞ্জন। এই রিলেশন বন্ধ কর।

এ আমার রিলেশন। তোর তাতে কী?

আমার অনেক কিছু। তুই এখনও মুসলমানদের চিনিস না? ওদের দেশে তো ছিলি।

চিনবো না কেন? খুব চিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানিস না যে ওদের রক্তের মধ্যে বদমাইশি আছে, বিশ্বাসঘাতকতা আছে?

জানি।

তাহলে জেনেশুনে এসব করছিস কেন?

ইচ্ছে হচ্ছে।

এসব হতে দেওয়া যায় না।

তুই না সিপিএম-এর সমর্থক? তোর চৌদ্দগোষ্ঠী সিপিএম করে। তোর পাড়ার লোকেরা সব সিপিএম। গোটা এলাকা সিপিএম।

গোটা বেলঘরিয়া। কয়েক দশক ধরে।

তাহলে তোর মেন্টালিটি এমন কেন রে? মানুষকে মানুষ মনে কর।

তুই যার-তার সাথে সম্পর্ক কর। কিন্তু মুসলমানের সাথে তোর সম্পর্ক আমরা মানি না।

তোরা করিস না। আমি তো একটা ইন্ডিভিজ্যুয়াল। আমার ডিসিশন আমি নেব।

সোসাইটিতে তো বাস করিস তুই, নাকি তুই ইন্ডিভিজ্যুয়াল যখন, পারবি কোনও জনমানুষহীন এলাকায় একা গিয়ে থাকতে? মানুষের এলাকায় বাস করলে মানুষের নিয়ম মানতে হবে?

মানুষের নিয়মটা কী শুনি? হিন্দু-মুসলমানের বন্ধুত্ব হবে না?

না, হবে না। ওরা টেররিস্ট। ওরা হিন্দুদের ওপর আজ থেকে অত্যাচার করছে না। দেশভাগ হয়েছে। পাকিস্তানে চলে যাবে মুসলমানরা। ওদের জায়গা পাকিস্তান। পাকিস্তানে চলে যায়নি কেন? এখন চলে যাক। আমাদের পূর্বপুরুষ পাকিস্তান থেকে চলে এসেছে। ওরা থাকছে কেন আমাদের দেশে? এ দেশ হিন্দুদের দেশ। দেশ ভাগ হয়েছিল তো এ কারণেই ভারতে হিন্দুরা থাকবে, পাকিস্তানে মুসলমানরা। আমরা কেন এখন ওদের জন্য সাফার করবো?

সুরঞ্জন স্তব্ধ হয়ে শোনে। পরে চোখ বড় হতে থাকে তার, মুখ খুলতে থাকে, বলিস কি মানস? মুসলমানরা না সিপিএম-এর ভোটব্যাংক? ওদের জন্য মাদ্রাসা হচ্ছে. মসজিদ হচ্ছে। ওদের মাথায় তুলে রাখা হচ্ছে।

ওসব পলিটিশিয়ানদের পলিটিক্স। মানস দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আমাদের নয়। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে রামকৃষ্ণ মিশনের মাঠে গিয়ে বসে। মানসের সঙ্গে সেই রাতে দীর্ঘক্ষণ কথা হয় সুরঞ্জনের। মানস একটা সরকারি অফিসে চাকরি করে। পড়াশোনা করেছে ভালো কলেজে। এমএ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যন্ত পড়েছিলে, কিন্তু পরীক্ষা দেয়নি। মানসের সঙ্গে বাংলা মদের দোকানে পেট ভরে মদ খেয়ে অনেক রাতে বাড়ি ফেরে সুরঞ্জন। মানস যদিও চেয়েছিল, জুলেখার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার কথা সুরঞ্জন তাকে দেয়নি। বারবারই সে বলছিল, দেখ সুরঞ্জন, কাজটা তুই ভালো করছিস না।

ভালো করছি না তো করছি না। আমার ভালোটা আমাকে বুঝতে দে।

এই সব ক্ষেত্রে যখন নিজের ভালোটা নিজে বুঝতে না পারিস তখন কাউকে কাউকে দায়িত্ব নিতে হয়।

দেখ, সবারই যার যার জীবন আছে। জীবনে নানা রকম সমস্যা আছে। এই সব সমস্যার সমাধান করতে করতেই তো জীবন শেষ হতে থাকে। এত কার সময় আছে কে কার সঙ্গে মিশলো, কার কী ধর্ম, কার কী জাত তা দেখার! তোর কার সঙ্গে কী রিলেশন, তা কি আমি জানতে চেয়েছি?

মানস তার হাতটা মুষ্ঠিবদ্ধ করে। চোয়াল তার শক্ত হতে থাকে। বলতে থাকে, তুই ভালো হয়ে যা সুরঞ্জন, এখনও সময় আছে, ভালো হয়ে যা। নিজের কমিউনিটির সাথে বিট্রে করিস না। ওরা হোল ওয়ার্ল্ডকে টেরোরাইজ করছে। ওরা নন-মুসলিমদের হেইট করে।— তুই বিয়ে করবি কর, যদি হিন্দু পছন্দ না হয়, খ্রিস্টান কর, বৌদ্ধ কর। বাট নো মুসলিম, নো মুসলিম। নো মুসলিম।

এর পরের রাতে সিসিআর ব্রিজের তলায় সুরঞ্জনকে মেরে ফেলে রাখে তারা। তার বন্ধুরা। সুস্থ হতে পুরো পাঁচ দিন লেগেছিল। পাঁচ দিন বাড়ি ফেরেনি তখন সে। সোবহান তাকে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করায়। সুস্থ হবার পর সোবহানই হাসপাতালের খরচ নিজের পকেট থেকে দিয়ে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। পাঁচ দিন হাসপাতালে আত্মীয়-বন্ধু-স্বজন বলতে সে একাই ছিল। নিজের চাকরিবাকরি-ব্যবসা-বাড়িঘর প্রায় ভুলে গিয়ে সোবহান পড়ে ছিল হাসপাতালে। কোনও খবর না পেয়ে কিরণময়ী আর মায়া দুজনই ভীষণ দুশ্চিন্তায় ভুগছিল... যদিও মাঝখানে সুরঞ্জন ফোনে জানিয়েছে সে এক বন্ধুর বাড়িতে আছে। কোনও দুশ্চিন্তা যেন তারা না করে। তাকে পৌঁছে দেবার পর সোবহানকে অকথ্য ভাষায় অপমান করেছিল মায়া। মায়া চেঁচাচ্ছিল অন্য ঘর থেকে, সোবহানের চেহারাটাও সে ভালো করে দেখেনি। চেঁচিয়ে বলেছিল যে মুসলমানরা কিডন্যাপ করেছিল সুরঞ্জনকে। তাকে মেরে ফেলাই উদ্দেশ্য ছিল তার এবং তাদের। সুরঞ্জন সোবহানকে কেবল ইশারায় বলেছে চলে যেতে। এ ছাড়া তার আর করার কিছু ছিল না। তার পক্ষে সম্ভব হয়নি সোবহানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে। হাসপাতালের খরচ সব সোবহানই মিটিয়েছে। সোবহান সফট ওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। আবার কম্পিউটারের ব্যবসাও আছে তার। সুরঞ্জনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় যখন সে দমদম কলেজে পড়ায়। ওখানে সে দেখেছে লোকের কাছে নাম বলে, শোভন। কলেজে সুরঞ্জনকেও সে বলেছিল। শোভনবাবু বলেই সুরঞ্জন সম্বোধন করতো। সোবহান আপত্তি করেনি। এরপর নিজের ঘরে একটা কম্পিউটার সুরঞ্জন বসিয়েছিল, এর যাবতীয় কাজের দায়িত্ব সোবহানকেই সে দেয়। সফট ওয়্যারগুলো লাগানোর সব দায়িত্ব। নষ্ট হয়ে গেলে সারানোর। তখনও সুরঞ্জন জানে সে শোভন। খবর নিয়ে দেখেছে, সফটওয়্যারগুলো তাকে সে বিনে পয়সায় দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, ভালো কম্পিউটার দিয়েছে, এক পয়সা লাভ করেনি। একদিন সোবহানকে সে বললো, আপনি তো অনেক বেশি দামে এসব বিক্রি করেন। আমাকে অর্ধেক দামে দিচ্ছেন। কেন?

সোবহান বললো, না, ঠিক আছে।

সফটওয়্যারগুলোর দাম রাখছেন না কেন? ইনস্টল করার জন্যও কিছু তো রাখলেন না।

সোবহান মাথা নিচু করে বিনয়ের সুরে বললো, ওগুলো তো আমার কাছেই ছিল। ওগুলোর দাম দেওয়ার কিছু নেই।

অদ্ভুত লেগেছিল সোবহানকে তার। চায়ের নেমন্তন্ন করলো একটা দোকানে এক বিকেলে, দিব্যি সে চলে এল। তারপর তো ফিডার রোডে তার দোকানে গিয়ে দেখলো সুরঞ্জন, কী ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হয় সোবহানকে। আর এই ব্যস্ত মানুষটিই নাকি সুরঞ্জনের মতো চালচুলোহীন ছেলের এক ভ্রুপল্লবের ডাকেই চলে আসে। সোবহানও তাকে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছে অনেক। দুজনে কম্পিউটার, ইউনিভার্স, ন্যানো টেকনোলজি, বুটুথ, বিগ ব্যাং, স্টেম সেল রিসার্চ এসব নিয়ে গল্প করে। সোবহান এমনিতে বিনয়ী। মাথা নিচু করে থাকা ছেলে। কিন্তু সায়েন্সের কথা বলাতে তার ভেতরে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, খলবল করে ওঠে। সুরঞ্জন ভীষণ ভালো শ্রোতা। এত ভালো শ্রোতা এবং বোদ্ধা সম্ভবত সোবহান পায়নি, তাই সুরঞ্জনকে সে নিভৃতে বন্ধু করে নিয়েছে।

শোভন বাবু থেকে শোভন। শোভন থেকে সোবহান। এভাবে একটু একটু করে তাকে চিনেছে সুরঞ্জন। যেদিন জানলো যে সে আসলে সোবহান, চমকালো। তার চমকে ওঠা মুখের সামনে সোবহানের মাথা নত, বিষণ্ন মুখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি হিন্দু না?

সুরঞ্জনের প্রশ্নের জবাবে অপরাধীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে শুধু নাবোধক মাথা নাড়ালো।

ও শিট। সুরঞ্জনের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো রাগের বিরক্তির অপমানের একটা শব্দ।

সোবহান দ্রুত সরে গেল সামনে থেকে।

সে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে কথা বলা। মাথা নিচু করে থাকা ভালো স্বভাবের ছেলে সোবহান। সুরঞ্জনের তাকে না হলেও চলে। সোবহানেরও চলে। চলে কিন্তু চলে না। দুজন কী ভীষণ রকম একা! এবং দুজনই দুজনের শ্রোতা। সুরঞ্জন তার বাবার-মায়ের-বোনের-স্ত্রীর গল্প বলে। সোবহানের কাছে সব গল্পই করেছে, এমনকি তার মুসলমানবিদ্বেষী বন্ধুদের, কিন্তু কখনও জুলেখার কথা সে বলেনি সোবহানকে। কেন সোবহানকে বলতে তার বাধে, নিজেকে সে জিজ্ঞেস করে উত্তর যেটা পেয়েছে, সেটা হলো সোবহান মাথা নিচু করে থাকা ছেলে, আর সুরঞ্জন মাথা উঁচু করে থাকা ছেলে। সুরঞ্জন মেজরিটি। সোবহান মাইনরিটি। জুলেখার সঙ্গে সুরঞ্জনের সম্পর্কের কথা জানা মানে সুরঞ্জন সোবহানের কাতারে দাঁড়ালো এসে। মাইনরিটির সঙ্গে বন্ধুত্ব আর মাইনরিটির সঙ্গে প্রেম দুটো দু জিনিস। প্রেম মানে শুধু প্রেম নয়, অনেক কিছু। প্রেমের পরে বিয়ে, বিয়ের পরে সন্তান। যে সন্তানটি পিওর হিন্দু সন্তান নয়। মুসলমানের গর্ভের সন্তান মুসলমানই।

শোভন বাবুর আড়ালে লুকিয়ে থাকা মুসলমান সোবহানকে আবিষ্কার করার পর সম্পর্ক আর রইলো না। শোভন আর সুরঞ্জন দুজনই জানতো সম্পর্কটা আর এগোবে না। ওই আবিষ্কারের ঘটনার পর আর কোনও দেখা-সাক্ষাৎ নেই। কোনও খোঁজখবর নেই। জীবন যার যার তার তার। মুখ দেখাদেখি বন্ধ। এভাবেই চলছিল। চলেও যেত এভাবেই। কিন্তু সুরঞ্জনই, সে নিজেই জানে না কী কারণে যোগাযোগ করলো প্রথম। সোবহানকে ছাড়া তার চলবে না। চালালেই চলতো। কিন্তু সুরঞ্জন আলসেমি করে চালাল না। সে একটা ঝুঁকি নিল। নিতান্তই হেঁয়ালির মতো একটা ঝুঁকি। যাদের সে জানে যে রক্তের মধ্যে বদমাইশি আর বিশ্বাসঘাতকতার বীজ, তাদের সঙ্গেই সে মেলামেলা শুরু করলো। নন্দননগর ঝিলের ধারে, রামকৃষ্ণ মিশনের মাঠে, কম্পিউটারের দোকানে সুরঞ্জনই সোবহানের সঙ্গে তখন অনর্থক গল্প করে কাটায়। মনে মেলে বলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভবত। তা ছাড়া আর কী! বন্ধুর তো তার আর অভাব ছিল না। সুরঞ্জনের তো অবশ্যই ভালো লাগে। সোবহানের কেমন লাগে তা সে কোনদিনই সে বলেনি, প্রসঙ্গ এলে মুখে রহস্যময় একটা হাসি ফুটে ওঠে শুধু।

সুরঞ্জনের সঙ্গে সোবহানের মাখামাখিটা বেলঘরিয়ার বন্ধুদের পছন্দ হয়নি। সোবহানের ওপর যেদিন চড়াও হয় ওরা, সেদিন সুরঞ্জনের মাথা ঠিক ছিল না। সোবহানের কম্পিউটারের দোকানে বসেছিল সে। অচিন্ত্য ঢুকে বললো, কী রে, মুসলমানের সঙ্গে ভাব হচ্ছে নাকি বেশ? তা মালটা কোথায়?

সুরঞ্জন ঠাণ্ডা গলায় বললো, বাজে কথা বলিস না।

কিছু টাকা ফেলতে বল।

মানে?

মালটা তো হিন্দুদের দেশে বসে ভালো কামাচ্ছে। তা হাজার দশ ফেলতে বল আজ। নইলে...

নইলে কী?

নইলে রাজারহাটে নিয়ে গিয়ে কপালে একটা চুমু খাবো আদর করে। অচিন্ত্যের ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি।

সুরঞ্জন দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকে। তার কথা বলতে ঘেন্না হয়। অচিন্ত্য এর দিন দশের পর তার আরও কয়েকটা শিষ্য নিয়ে সকালবেলা সোবহানের ওপর চড়াও হয়। অচিন্ত্য ভেতরে ঢুকলো। শিষ্যরা অবস্থান নিল দোকানের দরজায়।

চাঁদা দিন সোবহান সাব।

কিসের চাঁদা?

পুজোর।

কী পুজো।

কার্তিক পুজো?

হ্যাঁ, পাঁচ হাজার এক টাকা দিয়ে দিন। পুজোটা করে ফেলি।

সোবহান অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। পরে বললো, আমি দুর্গা পুজো, কালী পুজো, সরস্বতী পুজোয় চাঁদা দিই। কার্তিক পুজোয় তো দাদা আমি পারবো না।

অচিন্ত্য হেসে বললো, আপনাকে তো দিতেই হবে চাঁদাটা।

অত টাকা আমার কাছে নেই।

নেই বললেই তো হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে?

টাকাটা এখন, এই মুহূর্তে যে লাগবেই মিস্টার সোবহান।

সোবহান ঢোক গিলছে। মাথা নিচু।

এবার জোরে একটা ঘুষি সোবহানের সামনে টেবিলের ওপর পড়লো। গ্লাসভর্তি জল ছিল, ছিটকে পড়লো।

এক হাজার দিলে চলবে?

এক হাজার দিলে তো পুজোটাই হবে না।

এই মুহূর্তে...

অচিন্ত্য সোবহানের শার্টের কলার মুঠো করে ধরে টেনে নিয়ে দেয়ালে চেপে ধরলো। সোবহান তার সহকারীকে কাছাকাছি কোনও একটি দোকান থেকে এক্ষুণি চার হাজার টাকা ধার আনার জন্য বললো। সহকারী দৌড়ে বেরিয়ে গেল। কলার ছেড়ে অচিন্ত্য বসলো একটা চেয়ারে, সুরঞ্জনের মুখোমুখি। না, সুরঞ্জন কোনও কথা বলেনি। তাকিয়েছিল বাইরে রাস্তার মানুষের দিকে, তাদের হেঁটে যাওয়া, সাইকেলে যাওয়া, যানবাহনে যাওয়ার দিকে। কেউ উত্তরে যায়, কেউ দক্ষিণে। সহকারী খুব দেরি করেনি। ঘেমে নেয়ে টাকাটা সোবহানের হাতে দিল। পকেট থেকে এক হাজার এক টাকা বের করে ধারের চার হাজার মিলিয়ে অচিন্ত্যকে দিল। টাকাটা গুণে পকেটে ভরে, সোবহানের পেটে একটা শক্ত লাথি কষিয়ে 'শালা মুসলমানের বাচ্চা' বলে মেঝেয় থুতু ফেলে চলে গেল। সুরঞ্জন পাথরের মতো কিছুক্ষণ বসে থেকে বেরিয়ে যায়। সোবহানের সঙ্গে কোনও কথা সে বলেনি। বেরিয়ে রাস্তায় সে অচিন্ত্যকে ধরে। পেছন থেকে পা পেঁচিয়ে টেনে ফেলে দেয় অচিন্ত্যকে। টাকাটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করে। বলে, গুণ্ডামি করিস কার সাথে?

লাফ দিয়ে উঠে সুরঞ্জনের চোয়ালে ঘুসি দিয়ে বলে, মুসলমানের সাথে।

সুরঞ্জন পাল্টা ঘুসি দিয়ে বলে, না, তুই গুণ্ডামি আজকে আমার সাথে করেছিস।

অচিন্ত্য গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, সুরঞ্জন, সাবধান, টাচ করবি না। তোর সাথে কিছু করিনি আমি। চাঁদা চাইতে গেছি, সে যদি তোর বন্ধু হয়, ইটস ইওর প্রবলেম, নট মাইন।

সুরঞ্জন বলে, তুই পুজোর চাঁদা নিবি, সে হিন্দুদের কাছ থেকে নে। মুসলমানকে প্রেশার দিবি কেন শুনি? ওদের ঈদের সময় তোর কাছ থেকে চাঁদা নেয়? কত টাকা চাঁদা দিয়েছিস এ পর্যন্ত?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অচিন্ত্য জোরে গলা ফাটিয়ে বলতে থাকে, এখনও ওদের সঙ্গ ছাড় সুরঞ্জন। তোর কি জানা হয়নি ওরা কী জিনিস? বাংলাদেশে ভুগে আসিসনি? ওরা ফেরোসাস। ওদের বিষদাঁত তোর এখনও দেখা হয়নি। যত ক্রাইম হয় দেশে, কারা করে জানিস না? চোখ বুজে থাকিস? ওরা এ দেশে থাকে, একটা কাপল বারো-চৌদ্দটা করে বাচ্চা বানায়, দেশটায় কী হারে বাড়ছে মুসলমান দেখছিস না? ওরা আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে, বোমা মেরে মেরে আমাদের সবাইকে মারবে। দেশটা দখল করে নেবে। দেখিস তুই। ওরা পাকিস্তানে চলে যায় না কেন? পাকিস্তান খেলায় জিতলে তোর ওই বন্ধু যায় না পাকিস্তানের পতাকা হাতে বিজয় মিছিলে? যায়। আমাদের দেশে থেকে আমাদের ট্যাক্স না দিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে। যা, দেখ গিয়ে পাকিস্তানে তলে তলে বাড়িও বানাচ্ছে বোধহয়। সব টেররিস্টের জাত। ইচ্ছে করে লাশ ফেলে দিই শালাদের।

অচিন্ত্য বলছে আর হাঁপাচ্ছে। হাঁপাচ্ছে আর ঘামছে। ঘামছে। তার চোখ ফেটে আগুন আর জল দুইই বেরোচ্ছে। ওর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সুরঞ্জন। তার মনে পড়তে থাকে অন্য কিছু। মনে পড়তে থাকে ঠিক এ রকমই সব কথা। এমন কথা আগেও সে শুনেছে, শুনেছে বাংলাদেশে। হিন্দুবিরোধী কট্টরপন্থি মুসলমানেরা বলতো এভাবে, ওরা ভারতে চলে যায় না কেন, ভারত খেলায় জিতলে ওরা খুশি হয় মনে মনে। আমাদের দেশে থেকে আমাদের ট্যাক্স না দিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে। দেখ গিয়ে ভারতে তলে তলে বাড়িও বানাচ্ছে বোধহয়।

অচিন্ত্য একসময় নকশালপন্থি ছিল। এখন কোনও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নয়। কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য নয়, বজরং দলের কিছু ছেলের সঙ্গে কিছুদিন ঘুরেছিল। এরপর সিপিএম-এর খাতায় নাম লিখিয়েছিল। কিন্তু ওখান থেকে কারও জানা নেই কেন নাম কাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন অচিন্ত্য নিজের বিশ্বাসে নিজে চলে। কাউকে পরোয়া করে না। বিজেপির লোকদের সে গালি দিয়ে বলে, তোদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না। অচিন্ত্যর গুণগ্রাহী কম নয়। সাধারণের মধ্যে তো আছেই, এমনকি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত লোকেরাও অচিন্ত্যর শিষ্য হয়েছে স্বেচ্ছায়।

এই অচিন্ত্যর সঙ্গে, অচিন্ত্যই বলে দিয়েছে, যে, তেড়িবেড়ি করলে আর বেঁচে ফিরতে হবে না। সুরঞ্জন একটি আর কথা না বলে ফিরেছিল নিজের বাড়ি। আর বাড়ি থেকে সে বেরোয়নি। তার কেবল মনে পড়েছে অচিন্ত্যর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাগুলো। কী বীভৎস ঘৃণা উপচে উঠছে! মুসলমান জাতটার প্রতি ঘৃণা। একই রকম হিন্দু ঘৃণা সে দেখেছে। হিন্দু-মুসলমানে অমিল অনেক, কিন্তু দুই সম্প্রদায়ের একটিই মিল, সে ঘৃণার মিল। কিন্তু সবাই তো নয়। সবাই কী? বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকে সুরঞ্জন। সুরঞ্জন কী? বারবার সে নিজেকে জিজ্ঞেস করে, সুরঞ্জন কী? সুরঞ্জন কী? আমি কী? আমি কী? ঘামতে থাকে সে। একবার উঠে জল খায়। আবার শোয়। এপাশ করে। ওঠে। পায়চারি করে। সিগারেট ধরায়। একটা শেষ হলে আরেকটা। জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে। চপ্পল পরে বেরিয়ে পড়ে, কোথাও না, এদিক-ওদিক হেঁটে ফিরে আসে। বই মেলে ধরে চোখের সামনে। বন্ধ করে। উঠে চা করে। চা ঠাণ্ডা হতে থাকে। সিগারেট ধরায়। শোয় চিত হয়ে। আবার উপুড় হয়ে। বালিশ একটা বুকে চাপে। বুকে চাপা বালিশটায় আবার মুখ গুঁজে দেয়। একটা ঘুমের বড়ি খোঁজে বাড়িতে। পায় না। দরজা ভিজিয়ে রেখে বেরোয়। ফার্মেসিতে যায়। ঘুমের ওষুধ পাওয়া যাবে কিনা জানতে চায়। যাবে না। ফিরে আসে। সিগারেট ধরায়। দ্রুত শ্বাস পড়তে থাকে তার। বুকে ব্যথা ব্যথা লাগে। স্নান করে। স্নান থেকে এসে সিগারেট ধরায়। পায়চারি করে। আবার চা করে খায়। ফোন বাজে। ফোন ধরে না। কিরণময়ী কথা বলতে আসে। বলে দেয় বিরক্ত না করতে। শুয়ে পড়ে, এবার উপুড় হয়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। সুরঞ্জন ওভাবেই শুয়ে থাকে।

সিদ্ধান্তটা তখনই সে নিয়েছিল বেলঘরিয়া ছাড়াব।

ধীরে ধীরে সে টের পায় তার ভেতরে কোথাও যেন ধস নামছে। পাল্টে যাচ্ছে ছবিগুলো। স্পষ্ট করে সে বুঝতে পারে না পাল্টে যাওয়া ছবিগুলো ঠিক কার রকম। তবে যখন সে হাঁটে রাস্তায়, দেখে বেশিরভাগ মানুষের আঙুলে আঙুলে কুসংস্কারের আংটি, কব্জিতে লাল সুতো, মন্দিরে মন্দিরে উপচে পড়া ভিড়, মোড়ে মোড়ে শনিপুজোর উন্মাদনা— না, এই কলকাতা তার স্বপ্নের কলকাতা নয়। ধর্মবিশ্বাস,— সে যার সঙ্গেই মিশেছে, দেখেছে, আছে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবারই আছে। আরএসএস, বজরং দল, বিজেপির দলের যাদের সঙ্গে মিশেছে, যেমন আছে ধর্মবিশ্বাস, কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম সদস্য কারও কিছু কম নয়। সবাই পুজো করে। ঠাকুর দেবতা মানে। সবচেয়ে অবাক হয়েছে সুরঞ্জন, এই দেখে যে, শিল্পী, সাহিত্যিক, এমনকি পদার্থবিদ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা পণ্ডিত ব্যক্তি যাকেই দেখেছে সে, সবাই ধর্মবিশ্বাসী। ঢাকায় কিন্তু শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, টেকনোক্রেট, বিজ্ঞানী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস তুলনায় অনেক কম, প্রায় নেই বললেই চলে। অন্তত নিজে সে দেখেনি কাউকে। তার নিজের বাড়িতে সুধাময়কে কোনও দিনই সে দেখেনি ধর্ম বিশ্বাস করতে। নাস্তিক ছিলেন। ছেলে সুরঞ্জনও নাস্তিক হয়েছে ছোটবেলাতেই। কেবল কিরণময়ীর ছিল বিশ্বাস। মায়ার ছিল না, জন্মেছে কলকাতায় এসে। কলকাতায় এসে কিরণময়ীর বিশ্বাস আগের চেয়ে বেড়েছে কি না সুরঞ্জন জানে না, তবে লক্ষ করেছে ধর্মপালনের নানা রকম অনুষ্ঠানাদিতে কিরণময়ী আগের চেয়ে অনেক বেশি নিজেকে জড়িয়েছেন। এগুলো কি কিছু ভুলে থাকার জন্য, সুধাময়কে, নিঃসঙ্গতাকে, দারিদ্র্যকে, ভাগ্যকে? নাকি সত্যিকার বিশ্বাস থেকেই কিরণময়ী বিপদতাড়িনী পুজো দিতে কালিঘাটে ভোর হওয়ার আগেই দৌড়ে যান, বাড়িতে রান্নাপুজোর আয়োজন করেন, আরও কী কী সব সুরঞ্জন নামও সব জানে না। আর সবার মতো হতে চাওয়ার তাগাদা? নাকি অন্য কিছু? কিরণময়ী শাড়ি কাপড় বিক্রি করে হাতে যে টাকা পান, সুরঞ্জনের বিশ্বাস বেশিরভাগই যায় কিরণময়ীর ঠাকুরদেবতায় পেছনে।

দিন বলছে, কী হবে এসব করে মা।

লোকে করে কেন?

লোকে করে, নির্বোধ বলে। সুরঞ্জন উত্তর দেয়।

এত লোক নির্বোধ?

হ্যাঁ, এত লোকই।

কিরণময়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ভাবছিলাম এই দেশে আইস্য তর বোধহয় মতিগতি পাল্টাইবো। ভগবানে বিশ্বাস করবি।

এত যে ভগবানকে ডাকো, তোমার ভগবান তোমাকে দুর্ভোগ ছাড়া আর কিছু কি দিয়েছে? সুরঞ্জন বলে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন কিরণময়ী। সুরঞ্জনের এসব উদ্ভট কথার উত্তর তিনি দিতে চান না। ভাবে সে, কিরণময়ী এত ধর্মান্ধ কখনও ছিলেন না, মায়া তো ঠাকুর-দেবতার দিকে যেতই না। আর সেই মায়া এত অদ্ভুতভাবে কালিভক্ত হয়ে পড়েছে যে সুরঞ্জন ঠিক কী করবে বুঝে পায় না। মায়াকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা সে করেছে। বলেছে, মুসলমানরা খারাপ, তার মানে এই নয় যে তোর হিন্দু হতে হবে। হিন্দু হবি হ, তাই বলে ধর্মান্ধ হওয়ার কী দরকার? এতে তোর কী লাভ শুনি? না। মায়ার মাথায় সুরঞ্জনের কোনও উপদেশবাণী প্রবেশ করে না। মায়া, সুরঞ্জন ভাবে, দিনকে দিন মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। কিরণময়ীর বরং ব্যঙ্গ বিদ্রূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন খুশি করতে পারে। বোঝানোর কাজটাও করে সে। কিন্তু এসবে দেখেছে সে কোনও কাজ হয় না। হবেই বা না কেন? এত অন্ধ। চারদিকে তো অন্ধত্বরই জয়জয়কার। শুধু হাতে গোনা কিছু ছেলেমেয়েদের সুরঞ্জন দেখেছে ধর্ম এড়িয়ে চলে। পুজো আচ্চার ধারে-কাছে ঘেঁষে না। ছেলেমেয়েরা হয় বিজ্ঞান ক্লাবে জড়িত, নয়তো সত্যিকারের কমিউনিস্ট। সুরঞ্জন একবার ভেবেছিল সিপিএমে যোগ দেবে। বেলঘরিয়ার অনেকে তাকে বলেওছিল। কিন্তু এখানকার সিপিএম-এর নীতি-আদর্শ কমিউনিজম থেকে এতটা দূরে চলে এসেছে, যে, সুরঞ্জন এই দলকে ঠিক মেনে নিতে পারে না কমিউনিস্ট দল হিসেবে। এই যে ধর্মে ছেয়ে আছে চারদিক, মন্দিরগুলোয় উপচে পড়া ভিড়, রাস্তার ওপর শনির মন্দির, কুসংস্কারে, জ্যোতিষে ছেয়ে যাচ্ছে শহর নগর গ্রাম। কী করে হয় এসব যখন তিরিশ বছর কমিউনিস্টরা ক্ষমতায়? এত বছর শাসন করলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি যেরকমই হোক, অন্তত মানসিকতার তো উন্নতি হওয়ার কথা। আস্তিকতা আর ধর্মবাদের বদলে ধর্মমুক্তি আর মানববাদ যদি সবার অন্তরে প্রবেশ করতো, তবেই হতো কমিউনিজমের সার্থকতা, তবেই হতো সত্যিকার উন্নয়ন। ধর্মমুক্ত মানববাদ-এর সঙ্গে কমিউনিজমের তো কোনও বিরোধ থাকার কথা নয়।

সুরঞ্জন বোঝে না চিন্তার এই দৈন্য কী করে এই রাজ্যে এত প্রকট। কেবল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পাস করলেই কি সত্যিকার শিক্ষিত হয় মানুষ? বোঝে সে, খুব ভালো করেই বোঝে যে, সে একটা ধর্মান্ধ দেশ-এর দিকে ঘেন্না ছুড়ে আরেকটা ধর্মান্ধ দেশে এসে পড়েছে। নিয়তিতে বিশ্বাস নেই তার, সে জানে এ নিয়তি নয়, দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত ছিল সম্পূর্ণই তার সিদ্ধান্ত। এ নিয়ে আফসোস সে করে না। তবে একটা সত্য পরিবারের আর সবার মতো সুরঞ্জনও স্বীকার করে যে এ দেশে তাদের অন্তত এই নিরাপত্তা আছে যে হিন্দু বলে তাদের ওপর চড়াও হবে না কোনও মুসলমান। নিরাপত্তার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সুরঞ্জন শিউরে ওঠে ভেবে যে বোম্বের আর গোধরার ট্রেন-এর সেই বিস্ফোরণগুলোর কথা। সুরঞ্জন যদি কোনও একটি ট্রেনে থাকতো। তাকে তো মুসলমানের হাতেই মরতে হতো! মুসলমানের শব্দটিকে শুদ্ধ করে সে বলতে চায় জঙ্গি মুসলমানের, বা মুসলমান মৌলবাদীদের। টেররিস্ট, কট্টরপন্থি, জঙ্গি, মৌলবাদী কোথায় নেই? সবখানে সব ধর্মে সব সমাজে মহা আনন্দে তারা বিরাজ করছে। সুতরাং একশ ভাগ নিরাপত্তা, সে বোঝে যে কোথাও নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর, সুরঞ্জন এই প্রথম একটা প্রশ্ন করে যে, মুসলমানরাই কি এই দেশে খুব নিরাপদ? এর উত্তর তার চেয়ে ভালো আর কে জানে! সোবহানের সামনে দাঁড়াতে সুরঞ্জনের সত্যি বলতে কী, লজ্জা হয়।

ধর্মের কথা বাদ দিলেও সে ঠিক বোঝে যে চারদিকের হতদরিদ্র মানুষের কারওই নিরাপত্তা নেই। শুধু ধনীদের আছে, তারা যে ধর্মেরই হোক না কেন! যে গোত্রেরই হোক না কেন! এই কথাটা কি সুরঞ্জন মনে মনে জানতো না যখন বাংলাদেশে ছিল! জানতো। সে যদি ধনী হতো, তবে হয়তো দেশ ছাড়ার কথা ভাবতো না। যদি পার্টির বড় নেতা হতো, ভাবতো না। ক্ষমতার কোনও জাত-ধর্ম হয় না।

নিশ্চয়তার পায়ে অনিশ্চয়তা জোঁকের মতো কামড় বসায়। সুরঞ্জন দোলে, স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন তাকে দোলায় দ্রুততর। অন্ধ অভিমানের অন্ধকারে চাপা পড়ে থাকা তার বিজ্ঞানমনস্কতা, তার সাম্যবাদ, তার ধর্মমুক্ত কুসংস্কারমুক্ত সুস্থ বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন একটু একটু করে উঠে আসতে থাকে। ক্রমশ আলোকিত হতে থাকে চারধার। সুরঞ্জন কি নিজেকে একটু একটু করে সেই আলোয় চিনতে পারছে না? নিজে সে তো এ রকমই তৈরি করেছিল নিজেকে। তৈরি করা নিজেকেই সে ভেঙে দেয় কেন! কী হতে চায় সে? অন্য কিছু? সুরঞ্জন তার ভেতরেই ঘটতে থাকা অনেক ঘটনার মধ্যে থই পায় না। তারও আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে নন্দননগর ঝিলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরঞ্জনের সঙ্গে মাঝে মাঝে ফোনে কথা হয়, দেখা খুব কম হয়, আমার দেখা হতে থাকে কিরণময়ীর সঙ্গে। তিনি কালীভক্ত। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে তাঁকে একদিন বেড়াতেও নিয়ে যাই। কুশল চৌধুরীর প্রচুর অনুরোধে কয়েক বছর আগে আমি প্রথম দক্ষিণেশ্বর দেখতে যাই। ইউরোপে যেমন পুরনো গির্জাগুলো দেখেছি, তেমন দেখি মন্দির-মসজিদও। স্থাপত্যশিল্প আমাকে আকৃষ্ট করে। দক্ষিণেশ্বরে কালীর ঘরটিতে আমাকে ঢোকানো হয়েছে, এ কথা শোনার পর কিরণময়ীর চোখে মুগ্ধতা উপচে উঠছিল। তিনি চান যে কালীর ঘরটিতে তাকে একদিন আমি নিয়ে যাই। দিন-তারিখ তক্ষুণি ঠিক করে ফেলি। আমার নিরাপত্তারক্ষীকে দুদিন আগে জানিয়ে দিই যে মন্দিরে যাবো সকালে। দক্ষিণেশ্বর যেতে গেলে পেছনে আমার এসকর্ট কার থাকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক ভর্তি। আর সামনে প্যাঁ পুঁ বাজিয়ে খাকি পোশাকের রাইফেলধারী পুলিশের গাড়ি যায়। এভাবে সামনে-পেছনে পুলিশের গাড়ি দেখে কিরণময়ীর চোখ পলকহীন, মুখ হাঁ। আর যেই না দক্ষিণেশ্বর পৌঁছালাম. লোকাল থানার পুলিশ এসে আমাকে রিসিভ করে দেয় গাইড করার ভার মন্দিরের কর্তাব্যক্তিদের হাতে। তাঁরাই আমাকে নিয়ে ওঠান কালীর ঘরটিতে, দরজার বাইরে থেকে যেখানে ছুড়ে ছুড়ে পুজোর ফুল দিচ্ছে দর্শনার্থীরা. আমার হাতে ফুলের ডালি। ডালিটি আমি কিরণময়ীর হাতে দিই। তাঁর হাত থেকে ডালিটি নিয়ে সেই ডালি থেকে ফুল ঢেলে মন্ত্র পড়লেন পুজারি। চোখে তখন জল কিরণময়ীর। পূজারি দুজন আমাদের হাতে চরণামৃত দিলেন। চরণামৃত চোখ বুজে পান করলেন কিরণময়ী। আবেগে তিরতির করে কাঁপছেন তিনি। পূজারিকে পাঁচশ টাকা দিয়ে বেরিয়ে যাই। কিরণময়ীর কাঁপা শরীরটাকে আমি আলতো করে জড়িয়ে ধরি। তিনি আমার বুকে মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, মা, তুমি আমার স্বপ্ন সার্থক করলে!

তক্ষুণি মনে পড়ল কুশল চৌধুরীর দেওয়া শাড়িটির কথা। কালী ঠাকুরের পরা একটা লাল বেনারসি শাড়ি তিনি আমাকে উপহার

AMARBOI.COM

দিয়েছিলেন। সেই শাড়িটি সেদিনই বাড়ি ফিরে আমি আলমারি থেকে বের করে কিরণময়ীর হাতে দিই। ঘ্রাণ তখনও শাড়িটি থেকে বেরোচ্ছে। ফুলের, সুগন্ধির। কিরণময়ী দ্বিতীয়বার কাঁদলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আগের জন্মে তুমি আমার মেয়ে ছিলে।

কিরণময়ী পরজন্ম বিশ্বাস করেন জানতাম, পূর্বজন্মেও যে তার বিশ্বাস আছে, জানা ছিল না।

তিনি আর কত কালীঠাকুরের ভক্ত! ভক্ত বেশি মায়া। মায়া এ খবর শুনে ওই শাড়ি নিজে পাবার জন্য আঁকড়ে ধরল। তসলিমা শাড়িটি কিরণময়ীকে দিয়েছে জেনেও সে সেটি পেতে চায়।

জানি না আমাকে তখন কোনওভাবে মায়া ক্ষমা করে দেয় কিনা। ওই বেনারসি শাড়িটি কিরণময়ী দেন মায়াকে। আমার বিশ্বাস, যতবারই শাড়িটি ছোঁয় মায়া, যতবারই শাড়িটিকে সে প্রণাম করে, আমাকে তার মনে পড়ে। শাড়িটি আমি দিয়েছি। শাড়িটি যে কালীঠাকুরের পরনে ছিল, এ আমি বলেছি। বলা কথা, প্রমাণ নেই। তার পরও আমার বলা কথাটিকে মায়া বিশ্বাস করছে। কেন? যেহেতু কিরণময়ী বিশ্বাস করছে? কিরণময়ীর সব কথা তো মায়া বিশ্বাস করে না। মায়া তো বিশ্বাস করে না যে আমি সত্যিই মায়ার কথা যা লিখেছিলাম, ভালোর জন্য লিখেছিলাম, কোনও অসৎ উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমি তার কষ্টে কেঁদেছিলাম, বিশ্বাস তো করেনি। তার অসহায়তা তার যন্ত্রণা আমাকে ছিঁড়ে খেয়েছে, রক্তাক্ত করেছে, সামান্যও বিশ্বাস করেনি। মায়ার খবরাখবর পেয়ে যাই কিরণময়ীর কাছ থেকে। মায়া নিয়ে আপাতত আমি ভাবছি না।

জুলেখা আর সুরঞ্জন যখন রিশপে বেড়াতে গেল, দুজন কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবে বলে, কিরণময়ীকে নিয়ে এসেছিলাম আমার বাড়িতে। থেকেছিলেন আমার বাড়িতে কদিন। ওই কদিন আমি সারাক্ষণই তাঁকে সঙ্গ দিয়েছি। তাঁকে নিয়ে নাটক-থিয়েটারে গিয়েছি, গানের অনুষ্ঠানে গেছি, দক্ষিণাপণে নিয়ে শাড়ি চাদর আর ঘর সাজাবার জিনিসপত্র কিনে দিয়েছি, মার্কো পোলোতে, আইটিসি সোনার বাংলায় নিয়ে বুফে খাইয়েছি। কিরণময়ী যেন আমার খুব আপন কেউ, আত্মীয় কেউ। নিজের মা বা নিজের মাসি, এমন। তাঁর স্নান, তাঁর ঘুম, তাঁর খাওয়া, তাঁর আরাম আয়েশের দিকে, তাঁর মন ভালোর দিকে আমার চব্বিশ ঘণ্টা নজর। নিজে আমি স্ট্যাডিতে ঘুমোই। শোবার ঘরটা ছেড়ে দিয়েছি তাঁকে। এত ভালোবাসা আর আদর পেয়ে বারবারই তিনি বলেছেন, এ শহরে আত্মীয় তো কতই আছে, কারও বাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি যেতে পারি, কেউ কি একটা দিন থেকে যেতে বলে? তুমি আমার আত্মীয়ের চেয়েও বেশি মা।

জানি না হঠাৎ উত্থলে ওঠা কোনও আবেগে কিনা, তিনি বলেছিলেন নিজের জীবনের অনেক কথা। সংসারের কথা, স্বামী-সন্তানের গল্প। কিরণময়ী শুয়ে, আর তাঁর বিছানায় আধশোয়া হয়ে তাঁকে মন দিয়ে শুনতে শুনতে সুরঞ্জনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় আরও আর সুধাময়ের ব্যাপারে তৈরি হয় সংশয়। যখনই জানতে চাই সুধাময়ের মৃত্যুর কথা, কিরণময়ী প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। কী করে তিনি মারা গেছেন, তার কোনও বর্ণনা, চেয়েও আমি পাই না। প্রথম প্রথম ভাবতাম, কোনও না শুকোনো ক্ষতে বোধহয় হাত দিলাম। পরে ধীরে ধীরে টের পাই, কিছু গোপন করছেন কিরণময়ী। সুধাময়ের কথা বারবারই আমি জানতে চাই, কতবার আর পারবেন এড়াতে, ভুল করে হঠাৎ হঠাৎ বলে ফেলেন, আমাকে যে লুকোনো হচ্ছে তা ভুলে গিয়ে বলে ফেলেন, হঠাৎ খুব কাছের মানুষ ভেবে বলে ফেলেন। কিরণময়ী বলেন টুকরো টুকরো করে, যে, তিনি বাঁচতে চাননি। দেশ ছেড়েছেন বটে। সে শুধু শরীরে। মন পড়ে ছিল ওই দেশে। শেকড় উপড়ে তুলে অন্য কোনও মাটিতে অনেক বৃক্ষ হয়তো বাঁচে, সব বাঁচে না। সুধাময়ও তেমন না বাঁচা বৃক্ষগুলোর মতো। তিনি পারেননি এই মাটির সঙ্গে মিশতে। দারিদ্র্য ছিল, দারিদ্র্য মানা যায়, কিন্তু দারিদ্র্যের চেয়ে যেটা বেশি আঘাত করেছে তাকে, তা হলো লোকের শঠতা, অনুদারতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা। প্রতিদিন তাঁকে দেখতে হয়েছে ওসব।

আর?

আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে হয়তো তিনি দেখতে পেতেন তিনি রোগী পাচ্ছেন, অভাব গেছে। মায়াকেও আর ওভাবে ওই অবস্থায় দেখতে হতো না।

আর?

একবার তিনি চিন্তা করলেন না আমাদের কথা। আমাদের বেঁচে থাকা যে কী দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। কষ্টের সময় ছিল, কিন্তু সে সময়টা তো কেটেই গেছে। ও দেশ থেকে যারাই এসেছে, কটা মানুষ একেবারে সব মনমতো পেয়েছে? কষ্ট তো প্রথম প্রথম সবাইকেই করতে হয়েছে। কেন তিনি ভাবলেন তিনি চলে গেলেই সব ঠিকঠাক থাকবে? সব গেছে আমাদের।

হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠে বলেন,— ঝিলটার ধারে বসে থাকতেন। কে জানত..। কী করে মারা গেছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্নের উত্তর কিরণময়ী দেন না।

বলি, হার্ট অ্যাটাক?

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

সেই রাতে স্ট্যাডিতে ঢুকে রাস্তিতে যখন ঘুমোবার চেষ্টা করছি, বারবারই তাঁর কথাগুলো ভেবে আমার সংশয় জাগছিল, সুধাময়ের কোনও স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। সুধাময় আত্মহত্যা করেছেন। নন্দননগর ঝিলে ডুবে আত্মহত্যা। কী কী কারণে আত্মহত্যা করতে পারেন একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক?

লোকেরা বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে বলে?

দেশ ত্যাগটা মনে হয়েছে ভুল, তাই?

সুরঞ্জনের ভালো কোনও চাকরি হচ্ছে না বলে?

নিজের প্র্যাকটিস ভালো না বলে?

সুধাময়কে যতটুকু চিনি আমি, এগুলোকে কোনও কারণ বলে আমার মনে হয় না। সম্ভবত মায়ার কারণে আত্মহত্যা। মায়াকে হয় তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন অধঃপাতে যেতে। মায়া কি সেজেগুজে ডানলপের মোড়ে দাঁড়িয়েছিল রাতে, কারও সঙ্গে কথা বলে কারও গাড়িতে উঠে গিয়েছিল? সুধাময় দেখে ফেলেছিলেন! মায়া ছাড়া সুধাময়ের আত্মহত্যার অন্য কোনও কারণ আপাতত আমার সন্ধানে নেই।

মনে পড়ে ঝিল সম্পর্কে এর আগে একবার সুরঞ্জন বলেছিল যে, ইচ্ছে করে ওই ঝিলে ডুবে আত্মহত্যা করি। সম্ভবত টেলিফোনেই বলেছে। কিছুই তার আর ভালো লাগছে না। কটা ছেলেমেয়ে আসে পড়তে, ওদের নেহাত ভালো লাগে বলে পড়াচ্ছে সে। ওইটুকু থেকে যা উপার্জন। কিন্তু চাকরির জন্য কোথাও আর তার ঘুরতে ইচ্ছে করে না। দশটা-পাঁচটার গোলামিও তার সইবে না। তার চেয়ে স্বাধীনতা যেটা সে ভোগ করছে থাকুক, একটা মানুষের কত আর দরকার হয় বাঁচতে হলে? এই ফালতু দুনিয়ায় অত সচ্ছলতার দরকারটাই বা কী? চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ মানুষ অসচ্ছল জীবন যাপন করছে। কিরণময়ীর ব্যবসায় টাকা সংসারে ঢালা হচ্ছে। যখন কিরণময়ী থাকবেন না? তখন কী করবে? গাছের তলায় থাকবে? হেসে সুরঞ্জন বলে, না না ওই সব গাছের তলাটলা খুব রোমান্টিক ব্যাপার, ওসব আমার পোষাবে না। তার চেয়ে ঝিলে ডুবে আত্মহত্যা করব। কোন ঝিলে? ঝিলটিল কিছু ঠিক করেছো মরার জন্য? সুরঞ্জন গম্ভীর হয়ে বলে, নন্দননগর ঝিল।

এসব কোনও প্রমাণ নয়, তার পরও আমার সংশয় ঘোচে না সুধাময় থাকলে তিনি দেখতে পেতেন বছর না যেতেই ডাক্তারির পসার বেড়েছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশ থেকে আসা ডাক্তাররা চেম্বার খুলে বসলে প্রথম প্রথম রোগী হয় না, দু-তিন বছর পর ধীরে ধীরে অবস্থা ভালো হয়। আজ সুধাময় বেঁচে থাকলে এই দুর্গতি হতো না। কিরণময়ী জানেন সুরঞ্জনের ওপর ভরসা করা যায় না। তাই শাড়ির ব্যবসাটা তিনি শুরু করেছেন এবং এটাই আরও পুঁজি খাটিয়ে বড় করতে চান। কিন্তু মুশকিল হলো, ব্যবসাটা ভালো হতে পারত বেলঘরিয়ায়। এই পার্ক সার্কাসে মুসলমান বাড়িগুলোয় কিরণময়ীর যাওয়া-আসা নেই। না থাকলে শাড়ি কিনবে কে? লোকে তো নিউমার্কেট বা গড়িয়াহাট বাজার থেকেই কিনতে পারে যা কেনার। কিরণময়ীর কাছে আসার কারণ কম টাকায় ভালো জিনিস পাওয়া। হাতের কাজ ভালো, দামও বড় বড় দোকানের তুলনায় কম। কিন্তু প্রচারটা খুব নেই তাঁর এই শাড়ির ব্যবসার। থাকলেও তিনি বোঝেন যে মুসলমানরা তাঁর কাছে থেকে কিনবে কম। মুসলমানদের সঙ্গে সেই সম্পর্ক এখনও গড়ে ওঠেনি। তবে ব্যবসার জন্য তিনি চাইছেন সম্পর্কটা গড়তে। সালোয়ার-কামিজ রাখছেন, এমব্রয়ডারির কাজ করা কিছু বোরখাও রাখছেন। বিজ্ঞাপনও কিছু পাড়ায় দিয়েছেন, বাংলাদেশ দূতাবাসের কয়েকজন এসে বেশকিছু শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, এমনকি বোরখাও কিনে নিয়ে গেছে সেদিন। তারা কথা দিয়েছে আবার আসবে, তাদের সঙ্গে কিরণময়ী প্রাণ খুলে দেশের ভাষার কথা বলেছেন। তাদের চা খাইয়েছেন, দেশের গল্প করেছেন।

কিরণময়ী ভালো থাকুন চাই। সচ্ছলতা এলে মনে ফুর্তি হবে, সুরঞ্জন আর মায়ার জন্য কিছু করে তিনি তৃপ্তি পাবেন। ভালোবাসার মানুষের জন্য কিছু করতে পারাই জীবনের সবচেয়ে বড় সুখ। সুরঞ্জনকে ভালোবাসা যায়, কিন্তু ওর ওপর ভরসা করা যায় না। সংসারে যে মানুষটা সবচেয়ে বেশি দুর্বল আর পরনির্ভর ছিল, সেই মানুষই আজ সুধাময়ের মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরেছে; আর যে ছিল সবচেয়ে মুক্তবুদ্ধি নিয়ে চলা, সেই মায়া আজ অযৌক্তিক কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবে আছে; আর যে ছিল রাজনীতি-পাগল ছেলে, সে রাজনীতি নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদাসীন। পরিবর্তনটা নিয়ে আমি ভাবতে থাকি। আর যে মানুষটা ছিলেন জীবনসংগ্রামী, হারি জিতি যুদ্ধ করে বাঁচবে মানসিকতার, দুর্যোগে একা হাল ধরতে তিনিই জানতেন, আর তিনিই কিনা ছাড়লেন হাল, পেছনে না তাকিয়ে একটিবার, কী হবে কার, সংসারে কে ভেসে যাবে কে ডুববে, কিছুই না ভেবে নিজেকে ডোবালেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরঞ্জনের বাবা তোমাকে যদি একটিবার দেখে যেতে পারতেন। কী শান্তিই না পেতেন। তোমার কথা খুব বলতেন।

আমি থামিয়ে দিই কিরণময়ীকে এই বলে যে, এসব শুনেছি আমি আগে, বলেছেন তিনি। জুলেখার কথা জিজ্ঞেস করাতে কিরণময়ীর শীর্ণ মুখটি আরও শীর্ণ আর শুকনো দেখায়। জুলেখা ভালো মেয়ে তিনি স্বীকার করেন, সুরঞ্জনের চেয়ে জুলেখার ওপর বেশি ভরসা করা যায়। তাকে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু কিরণময়ীর কি যথেষ্ট হয়নি? মায়া তার স্বামী নিয়ে ভুগছে, এই স্বামী থাকার চেয়ে না থাকা ভালো। আর সুরঞ্জন যদি ভোগে মুসলমান মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-পড়শি নিন্দা করবে, তার ওপর মায়া তো এ সম্পর্ক কিছুতেই মেনে নেবে না বলে জেদ ধরেছে, আর জুলেখাও তো সমাজচ্যুত হবে। বিয়ে তো অন্য কিছু নয়, শুধু সামাজিকতা। যতক্ষণ ওরা সামাজিকতা করছে না, ততক্ষণ স্বাধীন।

বিয়ে ছাড়া কি ওরা একসঙ্গে থাকতে পারে না? হঠাৎ প্রশ্ন করি।

কিরণময়ী সজোরে মাথা নাড়লেন। না।

তাহলে কী হবে এই সম্পর্কের?

কিরণময়ী বিরক্ত হয়ে উত্তর দেন, জানি না। সুরঞ্জনকে অনেক বুঝিয়েছি ঝামেলায় না যাওয়ার জন্য, ও কিছুতেই শোনে না। ও তো কাউকেই মানে না। লক্ষ করেছি তোমাকে খুব মানে। তুমি যদি একটু বোঝাও ওকে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করি, না না না। অমন কথা ভুলেও ভাববেন না। আমি কোনও বিষয় নই তার কাছে।

কিরণময়ী বলতে থাকেন, তুমি আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে কীভাবে মিশছো, কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি যদি বেলঘরিয়ার লোকদের বলি, কেউই বিশ্বাস করবে না, তোমার বাড়িতে আমি থাকছি। তুমি আমার কী যত্ন করছো। ভাববে আমি বানিয়ে বলছি। তোমাকে বাইরে থেকে কেউ বলবে না যে, তুমি সাধারণ মানুষকেও এত আপন করে নিতে পারো। কে করে কার জন্য আজকাল? কেউ না। আত্মীয়স্বজনরা কোনও দিন খবর নিয়েছে? জানোই তো হুন্ডির নাম করে কত টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল। আমাদের তো শেষ করে দিল। এখন তো...

আমি ধীরে ধীরে বলি, কী গেছে তা নিয়ে দুঃখ করে কী লাভ! সুখ কিন্তু টাকা-পয়সায় থাকে না। আমি তো জীবনে অনেক টাকা করলাম। টাকা কি আমাকে একবিন্দু সুখ দিয়েছে? দেশে যখন ছিলাম, চাকরির প্রথম দিকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামান্য টাকায় চলতাম, ওই সব দিনগুলোতে, বুঝি, কী ভীষণ সুখী ছিলাম। অভাব ছিল, কিন্তু অভাববোধ ছিল না। আসলে, ভালোবাসা থাকলে সুখ থাকে। ভালোবাসার চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই।

কিরণময়ী শুনলেন। ঠিক অনুমান করতে পারি না কী ভাবছেন তিনি।

রিশপ থেকে ফিরে সুরঞ্জন প্রথমেই আমার বাড়িতে আসে, কিরণময়ীকে নিয়ে যাবে। সেদিন অনেকক্ষণই ছিল সে সঙ্গে। কিরণময়ী দুপুরে নিজে রাঁধলেন সেদিন। কই মাছের ধনে পাতা ঝোল, লাটি মাছের ভর্তা, দেশি মুরগি কষানো, বুটের ডাল, পটল ভাজা, বেগুন ভাজা, কলমি শাক। খেতে খেতে কথা হয়। সুরঞ্জনের মন খুশি খুশি! প্রেমিকার সঙ্গে তিন দিন কাটিয়ে এসেছে।

আমি বলি, বলা হয়, পার্টনার চিনতে হয় ট্রাভেল-এ। নন স্টপ তো কাটালে প্রেমিকার সঙ্গে কদিন। বোধ করছো কেমন?

সুরঞ্জনের কণ্ঠে কোনও কুণ্ঠা নেই। বললো, ভালো।

শুধু ভালো বললেই হবে?

এবার আমার চোখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট উচ্চারণ করলো, বেস্ট টাইম ইন মাই লাইফ।

বাক্যটি বিষমাখা তীর ছাড়া আর কিছু না। সে তাকিয়েই আছে। আমি চোখ নামিয়ে খাওয়ায় মন দিই। কিরণময়ীও খাচ্ছেন। তার তো আবার পরিবেশন করার অভ্যেস। টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে সবার পাতে পাতে খাবার ঢেলে দিতে যেই না শুরু করেছিলেন, আমি টেনে বসিয়ে দিলাম চেয়ারে। বললাম, ওসব ছাড়ুন। আমার বাড়িতে ওসব দাসীবৃত্তি চলে না। যার যার খাবার সে সে প্লেটে তুলে নেবে। এখানে কেউ পঙ্গু নয়।

এখানকার ছেলেদের মতো বাটি থেকে মাছ-মাংস থালায় তুলতে গিয়ে সুরঞ্জনের হাতের চামচ পড়ে যাচ্ছে না, বা চামচ থেকে মাছ-মাংসও পড়ে যাচ্ছে না। সে দিব্যি নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে আর খাচ্ছে। কারণটা সম্ভবত বাংলাদেশের ছেলে বলে। এখানে যেভাবে ছেলেদের নষ্ট বানানো হয়, ওখানে বোধহয় নয়। ওখানেও নষ্ট বানানো হয়, তবে ছেলেরা নিজে নিয়ে খেতে শেখে, এত নারীনির্ভর হয় না, কারণটা বোধহয় বহির্বাটিতে যখন পুরুষরা খায়, তখন অন্দরমহল থেকে বহির্বাটিতে গিয়ে মেয়েলোকদের খাবার পরিবেশন করার অনুমতি থাকে না। রক্ষণশীলতার কিছু কিছু ভালো দিক আছে, এটি একটি দিক। আমি যখন এসব ভাবছিলাম, সুরঞ্জন রিশপের বর্ণনা দিচ্ছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপের কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোনাচ্ছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে ওর মুখের দীপ্তি দেখছিলাম। নিশ্চয়ই খুব প্রেম করে কাটিয়েছে দিন-রাত। কী করে প্রেম সে করে, ভাবতে থাকি। সারা দিন চুমু খায়। সারা দিন হাত ছুঁয়ে থাকে। আমার শ্বেতি হওয়া হাতটি নিজের চোখের সামনে মেলে ধরে ভাবি হাত দুটো একসময় কী সুন্দর ছিল! কত কেউ চেয়েছিল হাত স্পর্শ করতে, কাউকেই তো দিইনি। অহংকার আমাকে আঠার মতো সেঁটে ছিল। হঠাৎ কোথায় খসে গেল সব? জীবন ফুরোচ্ছে বুঝতে পারি। জীবন খুব দ্রুত ফুরায়। জীবন তো সবারই ফুরোচ্ছে। এ সময় কেউ নেই হাতখানি ছোঁয়ার। আবার ভাবি, ভুল মানুষদের ছুঁয়েই তো জীবন কাটালাম। এবার নাহয় হাত দুটো একলা কাটাক।

আচ্ছা, হাতে হাত ধরে হেঁটেছো পাহাড়ে? আমার আচমকা প্রশ্ন শুনে কিরণময়ী আর সুরঞ্জন দুজনে চমকালো।

হেসে বললো সুরঞ্জন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

খুব প্রেম? জিজ্ঞেস করি।

হ্যাঁ। খুব। সুরঞ্জন বলে।

এ সময় গালের তিলটা সে চুলকোয়। মস্তটা দেখতে লাগে ছোটবেলায় দেখা আমেরিকান টিভি সিরিয়ালের নায়ক জনবয়-এর মতো। পেপার চেজ-এ ছিল ছেলেটা। ওরও ঠিক গালে এমন একটা তিল ছিল। তিলটা ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। ছোঁয়ার ইচ্ছেটুকু ভেতরে রেখে বলি, ওটা চুলকোবে না, চুলকোনো ভালো না, বুঝলে! চুলকোলে অনের রকম ডিজিজ হয়। চুলকোলে...

সুরঞ্জন, বুঝি যে গাল তিল চুলকোনো এসব কিছুই শুনছে না। সে মগ্ন আগের প্রশ্নটির উত্তরে। খুব প্রেম কিনা? হ্যাঁ খুব। সুরঞ্জনের হাত ভাতের থালায়, চোখ আমার মুখে, মন অন্য কোথাও। আপ্লুত কণ্ঠটি বলে, জীবনে ভালোবাসার চেয়ে বড় কিছু নেই। ভালোবাসার চেয়ে মূল্যবান সত্যিই কিছু নেই আর। এটিকেই আমি মূল্য দিই। এটিই সুখ দেয়।

আমার মনের কথা ও জানলো কী করে? সুরঞ্জন কি আমার মনে ঢুকেছে? কবে থেকে আমার মনের মধ্যে ঢুকে বসে আছে সে? চোখ জ্বালা করে আমার।

কেন, টাকা-পয়সার বুঝি মূল্য নেই? টাকা না থাকলে রিশপ যেতে পারতে? দুজনে বেড়ালে বলে ভালোবাসতে পারছো। আর টাকা না থাকলে ওই পরিবেশ তো পেতে না! ছিলে কোন রিসোর্টে? সোনার বাংলায়! দ্রুত্ উত্তর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও।

আমি আর বলি না যে রিশপে ওই সোনার বাংলাতেই ছিলাম আমি। খসখসে গলায় বলি, কী করবে? জুলেখাকে নিয়ে কী করবে শুনি?

কী আবার করবে? কিরণময়ী আমাকে চুপ করাতে চান।

বলো, ওকে নিয়ে বনবাস যাবে? ঠোঁটে হাসি, চোখে হাসি আমার।

যাবো।

দেশান্তরী হবে?

সুরঞ্জন হো হো করে হেসে বললো, নাহ্, সে ইচ্ছে নেই।

বিয়ে করবে?

জুলেখা যদি চায়।

তুমি নিজে চাও?

আমি জুলেখাকে চাই। ও যদি বিয়ে ছাড়া একসঙ্গে থাকে, থাকবো। যদি চায় বিয়ে করতে, তাহলে করবো দুজন বিয়ে। বিয়ে ব্যাপারটা অর্থহীন। করেছিলাম তো একবার বিয়ে। পাঁজিপুঁথি দেখে, জাতগোত্র, নাড়িনক্ষত্র, ঠিকুজি কুলুজি হস্তরেখা মিলিয়ে কী করিনি? হোম যাগযজ্ঞ, শালগ্রাম শিলাকে সাক্ষী রেখে মন্ত্রোচ্চারণ, পাণিগ্রহণ, সপ্তপদী গমে মালাবদল। সবই তো হয়েছিল? কদ্দিন টিকেছে?

আচ্ছা ওসব করেছিলে কেন? শুধু রেজিস্ট্রেশন করলেই তো হতো।

মেইনস্ট্রিম কালচারে ইনটিগ্রেট করতে চেয়েছিলাম।

কেন? সুবিধে হবে ভেবেছিলে?

বোধহয় তাই।

তারপর কী দেখলে? সুবিধে হয়নি?

বোধহয় তাই।

এখন কী করবে? কাজি ডেকে বিয়ে? ইসলাম ধর্ম মতে বিয়ে?

শাট আপ!

মুসলমান হবে না?

সুরঞ্জন হঠাৎ খাওয়া না শেষ করেই উঠে পড়লো। হাত ধুতে যাচ্ছে।

সুরঞ্জন কেউ না। কিচ্ছু না। হোপলেস। ওয়ার্থলেস। ভ্যাগাবন্ড। কোনও রুচি নেই, আদর্শ নেই। সুস্থ চিন্তাভাবনা নেই। লেখাপড়া নেই। পেছনে অন্ধকার। সামনে অন্ধকার। নিজের শিকারকে আবার নতুন করে শিকার করে তার সঙ্গে ঝুলেছে। মেয়ে বুদ্ধিমতি, ভালো চাকরি পাবে। আর সুরঞ্জন ওর ওপর বসে বসে খাবে মাইনরিটিকে প্রটেকশন দিচ্ছে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছুতোয়। জুলেখা কোনও ভালো এলাকায় বাড়িভাড়া পায় না, মুসলমান বলে পায় না। সুরঞ্জনের সঙ্গে বিয়ে হলে আর সে অসুবিধে হবে না।

জুলেখা কি সিঁদুর পরবে? শাঁখা পলা পরবে?

ওর যদি ইচ্ছে করে পরবে, না ইচ্ছে করলে পরবে না। সুরঞ্জন কঠিন কণ্ঠে উত্তর দেয়।

খুব দেখাচ্ছো যে ইকুয়ালিটি মানো। আসলে তো তুমিই চাপাবে। তোমার ইচ্ছেটা কী, শুনি?

কেন এত জানতে চাইছেন?

জাস্ট জানার জন্য।

উপন্যাস লিখবেন নাকি?

এখনও ঠিক করিনি। হয়তো লিখবো না। হয়তো লিখবো।

যথেষ্ট হয়েছে লেখা।

মানে?

মানে যথেষ্ট লেখা হয়েছে। এবার আমাকে মুক্তি দিন।

তোমাকে কি বন্দি করেছিলাম?

বুকের ভেতরটা কাঁপে। আমি ঠিক বুঝি না সুরঞ্জনের প্রতি আমার এই আকর্ষণ যেটিকে নিরস্ত করা যায় না, সেটি কেন? আমি নিঃসঙ্গ বলে? নাকি তার ক্রোধ নিয়ে, ঘৃণা নিয়ে, প্রচণ্ড আশা আর হতাশা নিয়ে বিভ্রান্তি আর ভ্রান্তি নিয়ে, সমস্ত ব্যর্থতা নিয়ে, নিস্পৃহতা নিয়েও মানুষটা ভেতরে খুব সৎ বলে!

আমার জীবন নিয়ে আমি কী করবো, সম্পূর্ণ আমার ব্যাপার। আমার আর জুলেখার। এগুলো নিয়ে প্লিজ কিছু লিখবেন না। কী লিখতে গিয়ে কী লিখবেন। পরে কী না কী ঝামেলা হয়।

আমার লেখার জন্য ঝামেলা?

ঝামেলাই তো।

ঝামেলাকে ভয় পাও বুঝি? আমার সবিস্ময় প্রশ্ন।

কী ভেবেছেন আমাকে? মহামানব? মোটেই কিন্তু তা নই। ভয় না থাকলে দেশ ছেড়েছি নাকি? এখানে ভয় করি না? এখানেও মুসলিম ফান্ডামেন্টালিস্টদের ভয় করি। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিন্দু ফান্ডামেন্টালিস্টদের। যে কটা দিন বাঁচি, নিজের মতো করে বাঁচতে চাই।

কিরণময়ীর হাতটি ধরে বুকের কাছে একটু টেনে নিল। এই আদরটুকু, এই ভালোবাসাটুকু, হৃদয়ের উত্তাপটুকু প্রকাশ করতে সবাই জানে না। দেখে কী যে ভালো লাগে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললাম, গাড়ি নিয়ে যাও।

তরুণকে বলেও দিয়েছিলাম ওদের পৌঁছে দিতে। সুরঞ্জন কিছুতে গাড়ি দিল না। বললো রাস্তায় ট্যাক্সি ধরে নেবে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি। হু হু হাওয়া আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। আমি কে ওদের কাছে? কেউ নই। শুধু একজন লেখক। কিরণময়ী সাধারণ অসাধারণের কথা বলছিলেন। ওঁরা নাকি সাধারণ আর আমি নাকি অসাধারণ। অসাধারণ একবার যদি কেউ কাউকে ভেবে ফেলে, তাকে কেবল দূরেই ঠেলে। অসাধারণদের দূর থেকে দেখতে ভালো লাগে। নাগালে এসেও দূর থেকে দেখার মতোই তাদের তারা দেখে। জাতপাত না মানলে হিন্দু-মুসলমানে প্রেমের সম্পর্কও হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ যাকে একবার অসাধারণ ভাবে, তাকে সত্যিকার আপন কোনও দিনই করতে পারে না। তাদের সঙ্গে আসলে কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। কিরণময়ী আর সুরঞ্জন যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল, দুজনের চোখেই আমি কৃতজ্ঞতা দেখেছি, ভালোবাসা দেখিনি। খুব ব্রাত্য বোধ করি। খুব নিঃসঙ্গ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিরণময়ী বিধবা হয়েছেন। শুধু শাঁখা-সিঁদুর খুলেছেন। সাদা শাড়িও পরেন না, মাছ-মাংসও বাদ দেননি। সুধাময় বলতেন, আমি মারা গেলে তোমাকে অনুরোধ করে বলছি ভুলেও যেন বিধবার সাজ সেজো না। যেমন আছো এখন, তেমনই থেকো। যা ইচ্ছে করে, কোরো। স্বামীর অনুরোধ তিনি রাখেননি, গায়ে সাদা থান জড়ালেন, হবিষ্যি খাওয়া শুরু করলেন, কিন্তু বাদ সাধলো সুরঞ্জন, বললো তুমি যদি এই সব বন্ধ না করো, আমি সোজা বাড়ি থেকে চলে যাবো।

এর চেয়ে বড় হুমকি জীবনে আর কীইবা থাকতে পারে কিরণময়ীর? স্বামী চলে গেছে, মায়া চলে গেছে, এখন সবেধন নীলমণি সুরঞ্জনও যদি চলে যায়, তবে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না তার। আর সুরঞ্জন মাথা খারাপ ছেলে, সে যদি সত্যিই চলে যেতে চায়, তাকে বাধা দেবার সাধ্য যে কিরণময়ীরও নেই, তা তিনি জানেন। কিরণময়ী রঙিন কাপড় পরছেন, সবই খাচ্ছেন। কিন্তু সাধ মিটিয়ে পুজো করার স্বাধীনতা তিনি বলে দিয়েছেন, যেন কেউ কেড়ে না নেয়। এত লোক পুজো করছে, এত লোক ধর্ম মানে, নিশ্চয়ই ভগবান বলে কেউ আছে কোথাও, কিরণময়ী ভাবেন। আর আজকাল সময় নিয়ে হয়েছে মুশকিল, এত সময় দিয়ে করবেন কী তিনি জানেন না। সংসারের সব কাজ শেষ হওয়ার পর ভয়াবহ এক একাকীত্ব তাঁকে ঝাপটে ধরে। যত বয়স বাড়ছে, তত তিনি একা হয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে সময় দেওয়ার সময় কারও নেই। সুরঞ্জন যখন ঘরে থাকে, একা একাই থাকে, তার নিজের ঘরে, হয় কিছু পড়ে, নয় ছাত্রছাত্রী পড়ায়, নয় বন্ধু বা জুলেখা এলে তাদের নিয়ে কাটায়। খুব কম হঠাৎ হঠাৎ কিরণময়ীর বিছানায় এসে সে উপুড় হয়ে শোয়। মা হয়তো ছেলের মাথায় পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দিলেন, ওই আদরটুকু শরীর পেতে ছেলে গ্রহণ করে। কিরণময়ী পান ধরেছেন, মায়ের কাছে পান খাবার আবদার ছেলের। পান চিবুতে চিবুতে জাবর কাটার মতো ফেলে আসা সুখের দিনগুলোর কথা বলেন কিরণময়ী। দিন তো সবই ফেলে আসা। কিরণময়ীর মনে হয়, এই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনটা অর্থহীন এবং অতিরিক্ত একটা জীবন। অন্ধকার গলির মধ্যে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে বাস করে জগতের সমাজের পরিবারের নিজের কীইবা লাভ করছে কে? না সুরঞ্জন। না তিনি। ব্যক্তিজীবন যাপন করার যে আনন্দ, দুজনের কারওই নেই। কিরণময়ী বোঝেন, জুলেখার জায়গায় যে কোনও হিন্দু মেয়ে যদি হতো, সুরঞ্জন হয়তো বিয়ে করে ঘরে তুলতো। তাঁর এও মনে হয়, তার পক্ষে যদি সম্ভব হতো জুলেখাকে ত্যাগ করা, করতো সে। কিন্তু ওকে ঠিক কেন ত্যাগ করা যায় না, তার তিনি কিছু জানেন না। সম্ভবত এই কারণে যে মেয়েটার মধ্যে যা আছে, তা আর কারও কাছে সে পাবে বলে মনে করে না। অথবা এই বাজারে খুব সুলভ নয় বান্ধবী পাওয়া, বিশেষ করে হাতে যখন টাকা কড়ি অত থাকে না। প্রেমও, অপ্রিয় সত্য যে, বেচাকেনার ব্যাপার হয়ে উঠেছে। গরিবের প্রেম গরিবের সঙ্গে আর বড়লোকের প্রেম বড়লোকের সঙ্গেই হচ্ছে। প্রেম তো আগে এমন শ্রেণি মেনে চলতো না। কিরণময়ী তার শৈশব কৈশোরে দেখেছে বড়লোক মেয়ে গরিব ছেলের সঙ্গে প্রেম করছে। বিরাট ধনী ছেলে এক অন্ধ-অনাথ মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। কোথায় সেসব এখন! সিনেমা থিয়েটারেও সমাজের সেসব উঁচু নিচু শ্রেণির প্রেম অহরহ দেখাতো। এখন সেসব প্রাচীন ব্যাপার। প্রেম এখন হিসাব করে হয়। বাবা-মা যেরকম মানানসই পাত্র পাত্রী খোঁজেন, ছেলে মেয়েরাও প্রেম করার জন্য তেমনই মানানসই কাউকে খুঁজে নেয়। ধর্ম গোত্র সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা সব দেখে নিয়ে তবে প্রেম। কিরণময়ী চেষ্টা করেও অনুমান করতে পারেন না সুরঞ্জন কেন জুলেখাকে বা জুলেখা কেন সুরঞ্জনকে পছন্দ করলো। বেলঘরিয়ায় থাকা হিন্দু ছেলে পার্ক সার্কাসের মুসলমান মেয়ের দেখা কী করে পায় তার রহস্য আজও তিনি জানেন না। ছেলেকে জিজ্ঞেস করে কোনো দিন উত্তর মেলেনি। জুলেখার কাছেও জানতে চেয়েছিলেন, এড়িয়ে গেছে মেয়ে। মেয়েটা মনে হয় না সুরঞ্জনের কোনও ক্ষতি করার জন্য এসেছে। তবে খুব ঘরোয়া, ঘর-সংসারের জন্য উদগ্রীব বলে তাকে মনে হয়নি তাঁর। সুরঞ্জনের এলোমেলো ঘরে যখন মেয়ে ঢোকে, ঝুলে থাকা মশারি, চায়ের কাপ, ছাই-এ ঠাসা ছাইদানি, খাটের রেলিং-এ টেবিলে চেয়ারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শার্ট প্যান্ট তোয়ালে এসব নিজ হাতে গোছায়নি বা পরিষ্কার করেনি কোনও দিন। সুরঞ্জনকে শুনিয়ে শুনিয়ে কিরণময়ী বলেছেন, কী মেয়ে বাবা, এত অগোছালো থাকে, কোনও দিন তো ঘরটা একটু গোছালো না! সুরঞ্জন একদিন শুধু বলেছে, ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার চাকর নাকি? কথাটা কিরণময়ীর খুব লেগেছিল, তাহলে তিনি যে গোছান, তিনি কি চাকর? একবার মুখ ফসকে বেরিয়েও যাচ্ছিল, আমি কি চাকর নাকি? সুরঞ্জনের এই মন্তব্য শুনে কষ্ট হবে ভেবে প্রায় বেরিয়ে আসা কথাকে তিনি আটকে দিলেন। কিরণময়ী এই অভিযোগ কেন করতে যাবেন, ছেলের ঘরটা গুছিয়ে তিনি যে স্বস্তি পান, তা তো অন্য কিছুতে পান না। ছেলে অপদার্থ হোক, রোজগার না করুক, সংসারী না হোক, তবু সে তো ছেলে, মাকে তো ভালোবাসে। বুকে জড়িয়ে ধরে হৃদয়ের উত্তাপ তো মাঝে মাঝে দেয়। নিজের সুখ-দুঃখগুলো মাঝে মাঝে তো ভাগ করে নেয়। একবার মায়ের কোলে মাথা রেখে কাঁদলো বাবার জন্য, বইপত্র ঘাঁটতে গিয়ে একটা ছবি বেরিয়ে এসেছিল সেটি নিয়ে, সুধাময়, মায়া আর সুরঞ্জন, ঢাকার বাড়িতে। এত জীবন্ত সেই ছবি, যেন সেদিনের। সুরঞ্জনকে এমনিতে আবেগাপ্লুত হতে কোনও দিন দেখেননি কিরণময়ী। পাথর পাথর একটা মুখ। আগে ঢাকায় এমন ছিল না। রাগ হলে ভাঙতো, তছনছ করতো। এখন কী রকম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে! কিছুতেই কিছু যায়-আসে না। কিরণময়ীর মনে হয় না জুলেখাও খুব খুশি ওকে নিয়ে। আশঙ্কা হয় কবে না জানি মেয়েটি ওকে ছেড়ে চলে যায়। এমনিতে কারও সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেশে না, কিন্তু মিশলে তাকে ভালোবেসেই মেশে। তারপর ভালোবাসার মানুষ যখন ঠকিয়ে চলে যায়, সেটা বুকে খুব বাজে। তা ছাড়া যাকে সে আপন বন্ধু বলে বরণ করেনি ভেতরে, সে ঠকাতে চাইলে বা ঠকালে গা করে না সুরঞ্জন।

তসলিমা, কিরণময়ীর বিশ্বাস, সুরঞ্জনের জন্য চাইলে কিছু করতে পারে। ওর প্রতি আগ্রহ তার প্রচণ্ড। ছেলেটি, চায়, দায়িত্ববান হোক, সচ্ছল হোক, সুখী হোক। ওর মতো উদাসীন ছেলেকে কারও সাধ্য নেই মানুষ করে। বয়স হয়েছে, কে বোঝাবে? এখনও কেমন বাইশ-তেইশ বছর বয়সীদের মতো জীবন নিয়ে রোমান্টিকতা। এঁদো গলিতে এনে তুলেছিস তুই, বলে যতবার কিরণময়ী অভিযোগ করেছেন, ততবারই সুরঞ্জন হেসে বলেছে, এঁদো গলিতে কোনও দিন থেকেছো বাপের জন্মে? কী রকম লাগে এ রকম জীবন, চল না একবার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। না। রোমান্টিকতা অবশ্য বলা যেত, যদি লাখপতি বা কোটিপতির এমন আহ্লাদ হতো। কিন্তু এঁদো গলি ছাড়া কি সুরঞ্জন আর কিরণময়ীর দুজনের উপার্জন জোড়া দিয়ে ত্রিগুণ করলেও কোনও রাজপথ জুটবে? তসলিমা ধনী। বেহিসেবির মতো টাকা ওড়ায়। সে তো পারে সুরঞ্জনকে কোনও একটা ব্যবসা করার জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকা দিতে? কোথাও একটা ফার্মেসি করতে পারে। ওষুধপত্রের সঙ্গে তো যোগ জন্ম থেকে। আর তা যদি নাই হয়, কত বড় বড় লোকের সঙ্গে তার পরিচয়। ছেলেটাকে ঢুকিয়ে তো দিতে পারে কোনও কোম্পানিতে বা কোনও কলেজে। কিরণময়ী ভাবেন ঢুকিয়ে দেওয়া নাহয় সহজই হলো, কিন্তু সুরঞ্জন কি ঢুকবে, কোনও নিয়ম মানবে? অদ্ভুত একটা পুরুষ। স্বাধীনতা একবার পেয়ে গেলে তা ছাড়া মুশকিল হয়। কিছু না করার স্বাধীনতা। ঘর-সংসার না করার স্বাধীনতা। কিরণময়ীর ইচ্ছে তসলিমাকে একবার তিনি অনুরোধ করবেন তার ছেলেটাকে একটু মানুষ করার জন্য। জুলেখাই বা কেন সুরঞ্জনের সঙ্গে জড়াবে! অল্প বয়স মেয়ের। লেখাপড়া শিখেছে। এখন যেমন হোক একটা চাকরি করছে, চার-পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পায়। কী আছে সুরঞ্জনের যে চাইবে বিয়ে করতে? নিজের গোত্রের লোকেরা ওকে ত্যাগ করবে। সে কি সুখী হতে পারবে আত্মীয়স্বজনদের অসুখী করে? সুরঞ্জন কি পারবে সুখী হতে মায়াকে কাঁদিয়ে? নিজের বোনকে? নিজের মাকে? সেই বন্ধনে তার চেয়ে না জড়ানোই ভালো, যে বন্ধন স্বস্তি দেয় না। সুদেষ্ণার সঙ্গে যে জীবন ছিল সুরঞ্জনের সেখানেও কোনও সুখ ছিল না। সুদেষ্ণা যত নিজের করে পেতে চাইতো সুরঞ্জনকে, সে তত বাঁধন আলগা করে বেরিয়ে যেত। ছেলে তো বাঁধন মানার নয়! কিরণময়ী চেয়েছিলেন যেমনই হোক সম্পর্কটা টিকে থাকুক। কিন্তু সুদেষ্ণা কিছুতেই রাজি হলো না। বিয়ে ভাঙলোই। সুধাময়ের সঙ্গে যে দাম্পত্য জীবন যাপন করেছেন কিরণময়ী, স্বস্তি ছিল। সুখ ছিল। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল। কিন্তু দুজনের দুই সন্তানের জীবনে কোনও সুখ হলো না। মাঝে মাঝে সংসারহীনতাও বুঝি ভালো। মায়ার সংসারের চেয়ে কি সুরঞ্জনের সংসারহীনতা ভালো নয়! ভালো। প্রতিদিন মায়াকে যন্ত্রণা পোহাতে হয়। সুরঞ্জনকে নয়। সে দিব্যি দায়িত্ব-কর্তব্যবিহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে। মায়া এমন যে ওই সম্পর্কের সুঁতোটা ছিঁড়তে পারে না। ছিঁড়তে চেয়েও যারা না পারে, তাদের কষ্ট অনেক, যারা অত কিছু না ভেবে ছিঁড়ে ফেলে, তারাই হয়তো ভালো থাকে। কিরণময়ীর মনে হয়, শুধু মনেই হয় না, তিনি বিশ্বাসও করেন যে, সংসারে পুরুষের চেয়ে নারীর কষ্ট অনেক বেশি। তসলিমা ভালো আছে, কোনও ঝুটঝামেলা নেই, একা থাকে। একা থাকতে যদি মায়াও পারতো।

একা একা কিরণময়ী এসব ভাবেন। ভাবনাগুলো ঘুড়ির মতো উড়িয়ে দেন ঘরের হাওয়ায়। ঘর ছেড়ে ভাবনাগুলোয় বাইরেও বেরোয়, তাঁর সঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরে স্যাঁতসেঁতে একটি উঠোন। উঠোনে ন্যাংটো বাচ্চা, নেড়ি কুকুর। এদের পেরিয়ে তিনি চটের ব্যাগে কয়েকটা শাড়ি আর সালোয়ার-কামিজ নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। বাড়ি থেকে বেরোলেই কিছু সোনার দোকান। জগন্নাথ জুয়েলার্সে কিরণময়ী তাঁর সোনার চেইন বিক্রি করে দিয়েছে খুব বেশি দিন আগে নয়। মায়াকে জানালে বাড়ি মাথায় করবে, তাই সুরঞ্জনকে জানিয়েছেন। টাকা তাঁর শাড়ির ব্যবসায় খাটিয়েছেন। বেনেপুকুর রোডের দুটো পরিচিত বাড়িতে তিনি কাপড়গুলো দেখান। দুটো বিক্রি হয়। টাকা সামনের সপ্তাহে দেবে বলে দেয়। আর পার্ক স্ট্রিটের ওপর একটি বাড়িতে পাওনা টাকার অর্ধেকটা ফেরত পেয়ে চলে যান শিয়ালদা স্টেশনে। স্টেশন থেকে দমদমের দিকে তিনটে স্টপেজ পরেই বেলঘরিয়া। তার পুরনো পাড়ায় কজনকে বাকিতে শাড়ি দিয়েছিলেন, সেই কজনের কাছে গিয়ে টাকা তোলেন আর নতুন কজনকে শাড়ি কাপড়গুলো দেখান। কারও পছন্দ হয়, রাখেন তিনটে। বাকি যা আছে, তা নিয়ে দু'তিনটে পুরনো প্রতিবেশীর বাড়িতে কিছুক্ষণ বসে চা খেতে খেতে আশা আর হতাশার গল্প বলে ফিরে আসেন ট্রেনে করে শিয়ালদা আর বাসে করে এন্টালি, এন্টালি থেকে রিকশায় জাননগর। গলির ভেতর কিরণময়ীর বাড়ির দেয়ালে এক টুকরো টিনে লাল রঙে লেখা মায়াবন। এই নামটিই তিনি রেখেছেন তাঁর অদৃশ্য শাড়ির দোকানে।

সকালে বেরিয়ে তাঁর ফিরতে ফিরতে বিকেল। বিকেলে ফিরে তাঁর আর ইচ্ছে করে না রান্না চড়াতে। না খেয়েই শুয়ে পড়েন। সুরঞ্জন ঘরে না থাকলে তাঁর আর রান্নার ইচ্ছে আজকাল করে না। রান্নার জোগাড় করাটাই ঝামেলা। মঙ্গলা নামের একটা দুস্থ মেয়ে আসে ঘর মোছা আর কাপড় ধোয়ার কাজ করতে। ওকে দিয়েই কাটা বাছা করিয়ে নেন তিনি। সব দিন ভালো লাগে না। বয়স হচ্ছে। বয়স হচ্ছে এটা ওপরে না বোঝা গেলেও ভেতরে তো হচ্ছে। এই বেলঘরিয়া যাওয়া-আসা কিরণময়ীকে কাহিল করে ফেলে। এই কাজগুলোর দায়িত্ব সুরঞ্জন কোনও দিন নেবে? নেবে না। ঘর দুটোর ভাড়াও আজকাল কিরণময়ীকেই দিতে হয়। কী করে মা তাঁর ওই টাকা কটা রোজগার করছেন, তা কি জানতে চেয়েছে সুরঞ্জন, কোনও দিন? এত উদাসীন দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলের জন্য তার পরও কিরণময়ীর মায়া হয়। কিন্তু কত দিন, কিরণময়ী শিউরে ওঠেন যদি তিনি হঠাৎ সুধাময়ের মতো চলে যান কোথাও, কী হবে ছেলের! জুলেখা কি তখন কোনও দায়িত্ব নেবে? না, তাঁর বিশ্বাস হয় না দায়িত্ব নেবে বলে। জুলেখা, কিরণময়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতদূর জানেন স্বামী পরিত্যক্তা, তার ওপর একটা ছেলে আছে। দেখতে-শুনতে ভালো, এই মেয়ে নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে কোনও সহৃদয় ধনবান। সুরঞ্জন কে, কী আছে তার যে মেয়ে তার সঙ্গে সেঁটে থাকবে? ভালোবাসার কথা অনেকে বলে। ভালোবাসা জিনিসটির আদৌ কোনও অস্তিত্ব আছে বলে তাঁর বিশ্বাস হয় না। সুরঞ্জন, তিনি লক্ষ করেছেন, মুসলমান বন্ধু-বান্ধব জুটিয়েছে। মুসলমানগুলো কি ওই তপসিয়া থেকে আসে, সন্দেহ হয়। ওই এলাকাটায় সন্ত্রাসীদের বাস। ছেলেটাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ নেই। এই দুশ্চিন্তা সব তাঁর একার। স্বামী বেঁচে থাকলে তাঁকে কিছু ভাগ দেওয়া যেত। আত্মীয়রা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যারাই আছে, কেউ খবর নেয় না। তাদের বাড়িতে যাওয়া-আসাও নেই এখন আর। কেউ কারও জন্য আর ভাবে না। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। নিঃসঙ্গতা কিরণময়ীকে ছিঁড়ে খায়। তাঁর ইচ্ছে করে কোনও একদিন এই দুঃসহ জীবন থেকে বাঁচতে তিনি আত্মহত্যা করেন।

সারাদিনের না খাওয়া শরীরে ভাবনাগুলো পোকার মতো পিলপিল করে হাঁটে আর কামড়ায়। মঙ্গলা একসময় খোঁজ নিতে এসে দুটো রুটি বানিয়ে আর একটা ডিম ভেজে দিয়ে যায়। খাবে যখন, তখনই সুরঞ্জন ঢোকে। ছাত্র পড়িয়ে এলো। ক্লান্ত। কিছু খাবি রে? বলতেই বললো খাবো। কিরণময়ী মঙ্গলার বানানো ওই রুটি-ডিমই খেতে দেয় সুরঞ্জনকে। কী ব্যাপার, ভাত নেই? হঠাৎ রুটি-ডিম কেন? কিরণময়ী উত্তর দিলেন না। সুরঞ্জন গোগ্রাসে খেয়ে নিল রুটি-ডিম। থাকলে আরও খেত। কিরণময়ী নিজে চা আর এক বাটি মুড়ি খেয়ে নিলেন।

কিছু একটা কর সুরঞ্জন, এভাবে আর চলছে না। কথা শুরু করলেন কিরণময়ী।

কী চলছে না শুনি?

এ পাড়ায় কোনও ভদ্রলোক থাকে?

শহরের মধ্যিখানে তুমি কম টাকা ভাড়ায় আর বাড়ি কোথায় পাবে বলো তো। এ পাড়ায় কি আর মানুষ থাকছে না? ওদের তুমি মানুষ বলে মনে করো না?

তোর বাবা একজন ডাক্তার ছিলেন। কোনও ডাক্তার ফ্যামিলি এ পাড়ায় থাকে?

বাবা তো বেঁচে নেই। এখন টিউশনি করে চলা আর শাড়ির বিজনেস করা তাও বাড়িতে বসে, তাদের পক্ষে এর চেয়ে বেশি আর স্ট্যান্ডার্ড আশা কর কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো চাকরিটাকরি কিছু কর। কিছুর জন্য তো চেষ্টা করছিস না।

করছি না চাকরি? এই যে টিউশনি করছি, এ কি কিছুই না? তোমার কাছে এর কোনও মূল্য নেই? শুধু টাকা হলেই মূল্য আছে? কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আনতে পারলেই মূল্য? টাকা কি পাচ্ছি না আমি? আমি তো বেকার বসে নেই। রোজগার তো করছি।

এবার কিরণময়ী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। কী রোজগার করছিস? দু হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া তো আমাকেই দিতে হচ্ছে। গত তিন মাস ধরে দিচ্ছি। সে খেয়াল করেছিস?

তাতে কী হয়েছে? তুমি দিয়েছো। বিজনেস করছো। দেবে না?

বিজনেস করছো! বলতে লজ্জা করে না তোর? বিজনেসে কিছু সাহায্য এ পর্যন্ত করেছিস? বুড়ো হয়েছি, তার পরও রোদে পুড়ে পুড়ে লোকের বাড়ি বাড়ি দৌড়োতে হয়। গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছিস তুই। মুসলমানদের অত্যাচারে জীবন শেষ হয়ে গেল ফ্যামিলির সবার। তোর বাবা মরেছে। মায়ার জীবনে এক ফোঁটা শান্তি আছে? ও তো মরার মতো পড়ে আছে। তোর মুখ চেয়ে আমি বেঁচে আছি। কী রকম বেঁচে থাকা এটা? আর তুই কিনা চোখের সামনে একটা মুসলমান মেয়ে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করছিস? ওকে নিয়ে তুই বেড়াতে গেলি। আমি যে কত কত দিন বলেছি, একবার পুরী নিয়ে যা। কই কোনও দিন তো নিয়ে গেলি না। মা বলে মনে করিস? মায়ের কষ্টের দিকে কোনও দিন ফিরে তাকাস? বলে হু হু করে কাঁদতে থাকেন কিরণময়ী।

সুরঞ্জন কিছুক্ষণ চিত হয়ে শুয়ে থেকে পেছনে ক্রন্দনরত কিরণময়ীকে রেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। তার ভালো লাগে না কিছু। কাকে সে দোষ দেবে, নিজেকে নাকি কিরণময়ীকে, বুঝে পায় না। জুলেখার খোঁজ করা। বা কোনও বন্ধুর সঙ্গে আড্ডায় বসা, কিছুই করে না সে। পার্ক স্ট্রিটে একটা বারে বসে একা একা মদ খেতে থাকে। জুলেখার ফোন এসেছিল, কেটে দিয়েছে। অন্য দু-একজন বন্ধুর ফোন ধরেনি। চার পেগ খাওয়ার পর নিজে সে সোবহানকে ফোন করে।

কী খবর?

আর খবর?

ভালো আছো তো?

আছি। এই থাকাকে ভালো থাকা বলে কিনা জানি না।

মাসিমা ভালো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই একই রকম। জীবন এ রকমই। সুখ আসে, দুঃখ আসে। সুখ যায়, দুঃখ যায়।

– অনেক দিন পর ফোন করলে। তোমাকে তো পাওয়া যায় না ফোন করে। ফোন অফ করে রাখো।

– ফোন ব্যাপারটাই বিচ্ছিরি লাগে।

ওপাশে সোবহান হাসে।

– তোমাকে খুব মিস করছি সোবহান।

– তাই?

– হ্যাঁ, খুব।

– তাহলে ফোনটোন তো করো না।

– ফোনে কথা বলে খবরাখবর জানা এসব আমার কাছে খুব সুপারফিসিয়াল লাগে। মুখোমুখি বসে কথা বলতে হয়। চোখের দিকে তাকিয়ে। স্পর্শ করতে হয়।

– তুমি কোথায় আছো বলো, আমি চলে আসি।

চলে এসো।

সোবহান ধর্মতলার দিকে ছিল। বেলঘরিয়ায় ফিরে যাওয়া বাদ দিয়ে পার্ক স্ট্রিটে সুরঞ্জনের কাছে চলে আসে। দুজন মুখোমুখি বসে। অনেক দিন পর। হ্যাঁ, অনেক দিন পর। কত দিন? দুমাস পর দেখা। দু মাসকে দুজনেরই মনে হচ্ছে বুঝি দু বছর।

সোবহান মদ খাবে না।

– তোমাদের মুসলমানদের এই একটা বাজে স্বভাব। মদ খাবে না। গরু খাবে। আমাদের দেবতাগুলোকে খেয়ে সর্বনাশ করে দিলে। সুরঞ্জন বলে।

সোবহান জোরে হেসে ওঠে।

– মুসলমানরা আমার সর্বনাশ করেছে সোবহান। আমার নিজের দেশ গেছে। একটা লাইফ ছিল আমার, আমার দেশে। আমার প্রেমিকা, আমার কেয়ারিং ফ্রেন্ডস ছিল। সব গেছে। এখন কোথায় আছি, কেন আছি, জানি না। কী রকম আছি? বলো তো? এই দেশটা তোমার দেশ। আমার দেশ না। তুমি এ দেশে জন্মেছ, তোমার চৌদ্দ পুরুষ এ দেশে জন্মেছে। আমার কেউ এ দেশে জন্মায়নি। এই মাটিতে কেউ না। এ দেশটায় তোমার শত্রু আছে বন্ধু আছে, এ দেশটা এ মাটিটা তোমার। আমি তোমার ল্যান্ডকে নিজের ল্যান্ড বলে মনে করছি। মুসলমানের কারণে আমার সর্বনাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে। তাদের কারণে আজ জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে আমি কোনও পার্থক্য দেখি না। আমার পুরো ফ্যামিলি শেষ। বুঝলে তো, শেষ। আমার বাবা শেষ, বোন শেষ, আমার মা শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর আমি তো...

সোবহান বলে, তুমি তো কী?

– আমি তো সেই কবেই শেষ। এই যে তুমি দেখছো আমাকে। এটা আসলে আমি নই। এ আমার ডেডবডি।

সুরঞ্জন আরও একটা লার্জ রয়েল স্টেগ-এর অর্ডার দেয়। সোবহান ঠাণ্ডা জল চায়।

– বুঝলে সোবহান, এখানে মাঝে মাঝে দেখি যে বাবা তার ছেলেমেয়ে বউকে মেরে তারপর নিজে মরে। দেখ না? দেখ না এমন খবর?

হ্যাঁ। দেখি। দেখি না শুধু, পড়িও।

– পড়। পড়বেই তো। আমার এসকেপিস্ট বাবা সেটা করেনি। বুঝলে তো, আমার বাবা পালিয়েছে। একা একা পালিয়েছে। এমন জায়গায় পালিয়েছে যে তাকে তার শার্টের কলার ধরে টেনেহিঁচড়ে পার্ক সার্কাসের কানা গলিতে বা সচিন সেন নগরের বস্তিতে খুঁদি ফেলতে পারতাম। ধরো চার নম্বর ব্রিজের বস্তিতেই যদি ফেলতে পারতাম, তাহলে তো কথাই ছিল না। পালিয়েছে মানুষটা এতকাল সেক্যুলারিজম, কমিউনিজম, সোশ্যালিজম, একজিসটেনশিয়ালিজম, পেট্রিয়াটিজম এই ইজম, সেই ইজমের গপ্প শুনিয়ে ব্যস ফুড়ুৎ। শালা স্বার্থপর। আমার বাবাটা ছিল একটা শিশুর মতো, আবার শয়তানের মতো।

সোবহান বসে বসে শুনতে থাকে সুরঞ্জনের কথা আর বলতে থাকে মদ আর না খেতে। বাড়ি যেতে। সুরঞ্জন বলে দেয় বাড়ি আজ সে ফিরবে না। ও বাড়িতে ফিরতে তার ভালো লাগে না। ও বাড়ি কিরণময়ীর বাড়ি। অপদার্থ ছেলেকে মায়েরও আর সহ্য হচ্ছে না। ছেলে যদি টাকা দিতে না পারে, তাহলে ছেলেও আর ছেলে থাকে না।

– বুঝলে সোবহান। তোমার মতো একটা ইঞ্জিনিয়ার হলে, দেদার টাকা কামালে দাম থাকতো। তোমাকে তো আবার কার্তিক পুজোর চাঁদা দিতে হয়। হা হা হা।

– আমি হলে কী করতাম জানো, ওদের একটা বোনকে রেপ করে আসতাম। আমি আবার রেপটা ভালো জানি। কারও ওপর রাগ হলে আমি তার বোনকে বা বউকে রেপ করি। বুঝলে সোবহান, রেপ করি। বাংলাদেশে একটা মুসলমান মেয়েকে করেছিলাম। জানো তো সে খবর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানো না? পুরো পৃথিবী জানে। পৃথিবী জানে যে একটা হিন্দু ছেলে একটা মুসলমান মেয়েকে রেপ করে প্রতিশোধ নিয়েছে। আমি একটা রেপিস্ট। তাই নামকরণের সার্থকতার জন্য আমি রেপ করে বেড়াচ্ছি, বুঝলে? হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে যা করি আমি, তার নাম লাভ মেকিং, আর মুসলমান মেয়েদের করি রেপ। একটি মুসলমান মেয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক...। বুঝলে, সম্পর্ক...

সোবহান মাথা নাড়ে। সে জানে।

– ওটা আসলে মেয়েটাকে ধোঁকা দেওয়া। আসলে আমি রেপ করি। জুলেখার সাথে আমার রেপ-এর সম্পর্ক, বুঝলে? আর কিছু না। মুসলমানের ওপর ক্ষোভ আমার আজও যায়নি। মুসলমানরা আমার বাবাকে মেরেছে। বোনের লাইফটা শেষ করে দিয়েছে। মাটাও কী জঘন্য অবস্থায় কাটাচ্ছে। কজ কী? কারণ কী? মুসলমান।

– এবার থামো সুরঞ্জন। সোবহান ঠাণ্ডা গলায় বলে।

– থামবো কেন? খারাপ লাগছে? বলো যে সুরঞ্জন মুসলমানবিদ্বেষী। দুনিয়ার সব লোক তো জানে এ কথা। রেপিস্ট। মুসলিম হেটার। জানে আমি হিন্দু ফান্ডামেন্টালিস্ট। জানে না? হ্যাঁ আমি তাই। কিন্তু আমি তোমার ওই অচিন্ত্যর মুখে মুতে দিই। বুঝলে সোবহান। অচিন্ত্যর মুখে মুতি আমি।

– রাখো তো এসব কথা, সোবহান বলে।

– পার্ক সার্কাসে থাকি। মুসলমানগুলোর লাইফ বুঝলে তো? পভারটি লাইনের নিচে বাস করে ওরা। কীটের মতো। কেঁচোর মতো। দৌড়ে যায় নামাজ পড়তে। ওটাই ওদের আইডেনটিটি। শুক্রবার মসজিদ উপচে পড়ে লোকে। ফুটপাতেও কুলোয় না, রাস্তা বন্ধ করে গরিবগুলো নামাজ পড়ে। আরবিতে বিড়বিড় করে। কী বলে, ওরা জানে? শালাদের একটাও জানে না কী বিড়বিড় করে। কটা মুসলমানের সাথে খাতির করেছি। এদের একটা একটা করে যদি জবাই করতে পারতাম। হোমো হলে আবশ্য রেপ করতাম। হা হা হা।

– এবার ওঠো সুরঞ্জন। অনেক হয়েছে। সোবহান বলে।

– না, উঠবো না। খাবো। আরও মদ খাবো। ক্ষিদে আছে পেটে। খাবার খাবো।

সোবহান খাবার অর্ডার দেয়। নান, চিকেন ভর্তা, তন্দুরি চিকেন। সুরঞ্জন আরও এক পেগ-এর অর্ডার দেয়। সোবহানের বাধা মানে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– আরে আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না তো। হুইস্কি খেয়ে মাতলামো করেছি কখনও? কখনও না। বুঝলে সোবহান, তোমার মতো অনেক বন্ধু আমার ছিল দেশে। ওদের মুখে আমি মুতে এসেছি। আজ তুমি আমার বন্ধু, কাল শালা তুমি তেড়িবেড়ি করো, তোমাকে আমি আস্ত রাখবো না।

– ভয় দেখাচ্ছো?

– হ্যাঁ, ভয় দেখাচ্ছি। আমাকে কেউ ভয় পায় না। জানে না আমি কী করতে পারি। মুসলিমরাই টেররিস্ট হয়। আমি যে হিন্দু। জাত হিন্দু। চৌদ্দগোষ্ঠী হিন্দু আমার। আমি বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে পারি। আমি তপসিয়া তিলজলা খিদিরপুরে মোটিয়াবুরুজ পার্ক সার্কাস বোমা মেরে উড়িয়ে দেব। দেখে নিও।

– আর ড্রিংক করো না সুরঞ্জন। থামো এবার।

সোবহান হাত বাড়িয়ে গ্লাস টেনে নিতে চায়। সুরঞ্জন এক হাতে সোবহানের হাতটি শক্ত করে ধরে রাখে। আরেক হাতে গ্লাসে চুমুক দেয়।

– আমাকে, বুঝলে সোবহান, অনেকে ভাবে, বোধহয় আমি ইন্টেলেকচ্যুয়াল একটা। হা হা হা। হাবিজাবি কথা বললে লোকে ভাবে এ রকম। আমি তো একটা বোকা। বোবা হয়ে থাকি। বোবা হয়ে থাকি। বোকা বলে বোবা হয়ে থাকি। তুমি তো বোঝো সে কথা। বোঝো না সোবহান?

খাবার এসে যায়। সুরঞ্জনের থালায় রুটি আর চিকেন উঠিয়ে বলে, এবার খাও। মদটা ছাড়ো সুরঞ্জন। মদটা ছাড়তে চেষ্টা করো।

– আমি যদি বলি মদ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, শোনাবে দেবদাসের মতো। রোমান্টিক যুবক মদ খেয়ে ফিলোসফি আওড়ায়। ওই বড়লোকদের যদি মারতে চাই, বলবে শ্রেণিশত্রু খতম করতে চাই। না সোবহান, আমি চাই রাগ মেটাতে। আমার কেন হলো না, ওদের কেন হলো, সে কারণে। আমি যদি বড়লোক হই, আমার মতো ভিখিরিদের আমি গুলি করে মারবো। বুঝলে, গুলি।

সুরঞ্জন আঙুলে তাক করে সোবহানের বুকের দিকে, তার হাতের অদৃশ্য রিভলভার।

সোবহান খাবার খেতে থাকে। সুরঞ্জনকে বলে বলে খাওয়ায়। খেতে গিয়ে সে ছড়িয়ে ফেলে সব। আরও মদ খাবে গোঁ ধরে। সোবহান ওয়েটারদের আর কোনও মদ দিতে বারণ করে দেয়। বিল মিটিয়ে সে উঠে সুরঞ্জনকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে ট্যাক্সিতে ওঠায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ি যাবে তো?

না। সুরঞ্জন বলে, বাড়ি আমি যাবো না।

তাহলে যাবে কোথায়?

তুমি যেখানে যাও, সেখানে যাবো।

আমি তো বাড়ি যাবো।

তোমার সাথে যাবো আমি।

কেন. বাড়ি যাবে না কেন?

আই হেইট মাই মাদার।

বাজে কথা বলো না। বাড়ি চলো।

অত ভালো মানুষ সেজো না সোবহান। তোমার সঙ্গে আমার ফ্রেন্ডশিপ। হোল ফ্যামিলি নিয়ে আমি তোমার ফ্রেন্ড হইনি। আমাকে টেক কেয়ার করো। গুল্লি মারো ফ্যামিলি।

মাসিমাকে একটা ফোন করে দাও যে বাড়ি ফিরবে না।

বাড়িতে ফোন নেই।

চিন্তা করবেন তো।

করুক। আই কুডনট কেয়ারলেস। আমার কিছু যায়-আসে না। সোবহান আরও কিছুক্ষণ অনুরোধ করে। কিছুতেই আজ সুরঞ্জন বাড়ি যাবে না। অগত্যা ডানলপের মোড়ে যেতে বলে ট্যাক্সিকে। না, টাক্সি ওদিকে যাবে না। শ্যামবাজার অবধি যাবে। তাই সই। শ্যামবাজার থেকে ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি। পথে সোবহান এক হাতে ধরে রাখে সুরঞ্জনকে। আবার পড়ে না যায়। আগে তাকে দেখেছে মদ খেয়ে অর্থহীন কথা বলতে। কিন্তু আজ সীমা ছাড়িয়ে খিস্তি করছে সুরঞ্জন। যেতে যেতে সুরঞ্জন বলে, জানো সোবহান, মন দিয়ে শোনো। তোমাকে একটা কথা বলছি। কাউকে বলবে না। এটা খুব সিক্রেট। সিক্রেট, বুঝলে তো!

– হ্যাঁ বুঝলাম। বল। সোবহান বলে।

– তসলিমা নাসরিনের নাম শুনেছো?

– হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

– ও আমার প্রেমে পড়েছে।

– তাই নাকি?

– হ্যাঁ, তাই। ও ভেবেছে আমি বোধহয় একটা সাংঘাতিক কিছু। ও জানে না যে আমি একটা অপদার্থ। ঢাকায় তো আমাকে পাত্তাই দেয়নি। আর আমাকে নিয়ে বই লিখেছে। এখন সে সেলিব্রিটি। সেলিব্রিটি বুঝলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো? বিরাট সেলিব্রিটি। এখন এমন পাত্তা দিচ্ছে যে আমি ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি বলছি।

– কী করে বুঝলে যে প্রেমে পড়েছে?

– তোমার প্রেমে যদি কেউ পড়ে সোবহান। বলো তো, তুমি বুঝবে না? বুঝবে। চোখ দেখেই বুঝেছি। আমি তসলিমার চোখ দেখেই বুঝেছি। এত লোক থাকতে আমাকে তার পছন্দ কেন, বুঝলাম না। বড়লোকের খেয়াল। আমি অত সহজে ভিড়তে চাই না। খেলাতে চাই। সে আমাকে নিয়ে খেলেছে কাগজে। আমি খেলতে চাই তাকে নিয়ে জীবনে।

– কীভাবে খেলবে?

– জানি না এখনও। তুমি একটা অ্যাডভাইস দাও তো। আমি তো আবার ভালো প্লেয়ার নই। ঢাকার না হিন্দু, না মুসলমান, না খ্রিস্টান কোনও মেয়েই তো চাইলো না আমাকে। সুদেষ্ণা ও মাধবী এসেই বলে যাই এর মতো চলে গেল। আর এ বাড়ি ও বাড়ির সেক্স স্টার্ভড বৌদিগুলোও আর চাইলো না। আই ফাকড দেম, দ্যাটস অল। নো বডি লাভড মি। জুলেখা ভালোবাসে? জুলেখা আঁকড়ে আছে আমাকে। কারণ তাকে সুখ দেওয়ার জন্য কোনও মুসলমান ছেলে অবশিষ্ট নেই বলে। কোনও হিন্দু ছেলেও কোনও মুসলমান মেয়ের সঙ্গে জড়াবে না। তাই সুরঞ্জন নামের একটা জাত নেই ধর্ম নেই একটা বখে যাওয়া মরে যাওয়া অপদার্থর গলাতেই ঝুলে থাকা ভালো। সেক্সটা ভালো জানি তো সোবহান, আর যাই হোক রেপটা তো ভালো জানি। ফ্রি সেক্স আজকের বাজারে কে পায় বলো? বৌদিরা তো কিছু উপঢৌকন অন্তত দিত।

সোবহান এবার ধমক দেয়। অনেক বকেছো, এবার চুপ করো।

– তসলিমা খুব লোনলি। বুঝি আমি। তা না হলে আমার মতো ছেলের প্রেমে ও পড়ে। আমার কী আছে বল? কিচ্ছু নেই। আমি শুধু রেপটাই তো পারি করতে। ও জানে না? ওর চেয়ে ভালো কে জানে? ও তো আমার রেপটার কথাই লিখে দিয়েছে। ওকে একদিন, বুঝলে সোবহান, আমার খুব রেপ করতে ইচ্ছে করে।

সোবহান আবার ধমক দেয়। শান্ত হও তো!

সুরঞ্জন বলে, হ্যাঁ ইচ্ছে করে। ওকে রেপ করেই বোঝাতে চাই রেপ কাকে বলে। আর আমাকে যে রেপিস্ট বানিয়েছে, তাকে আমি রেপ না করে ছেড়ে দেব কেন, বল? যদি কেউ হোল ওয়ার্ল্ডে জানিয়ে দেয় যে ইউ সোবহান, ইউ সান অব মিস্টার সামবডি, আর অ্যা গ্রেট রেপিস্ট। তাহলে তুমি কি রেপ করবে না তাকে? সেই বিচকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– হোল ওয়ার্ল্ড তো জানছে না সেই সুরঞ্জন তুমি। সোবহান বলে।

– না জানুক। জানছে তো আমার সঙ্গে যে মানুষই পরিচিত হচ্ছে, ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। জানতো সুদেষ্ণা। জানে জুলেখা। জানে মা-বাবা-মায়া, যারাই আমাকে চেনে তারাই। আমার তো একটা জগৎ আছে। সেই জগৎটা তো জানে। এই জগৎ ছেড়ে যে জগতেই যাই না কেন, সবাই জানবে। মুক্তি আছে আমার?

ট্যাক্সি হু হু করে ছুটছে। সুরঞ্জনের সব কথা সোবহান শুনতেও পাচ্ছে না। কাঁধ ধরে কানটা এগিয়ে এনে সে শোনাচ্ছে। তুড়ি দেখিয়ে বললো সে, আই ক্যান ফাক দ্যাট বিচ এনি টাইম।

সাট আপ। সোবহান রুষ্ট কণ্ঠে বলে। –আমাকে সাট করে কিছু হবে না ভাইয়া। আমি ছেড়ে দেব না। আমি রেপ করেছি, আমার পারসোনাল ব্যাপার। নিজেকে প্রতি মুহূর্তে আমার রেপিস্ট বলে মনে হয়। 'লজ্জা'র সবকটা অক্ষর আমাকে হন্ট করে। মায়াকে করে। মায়ার নিজের শরীরটাকে মায়া ঘৃণা করতো। তাই তো বেচতে যেতো। বেচতো, তোমাদের ওই ডানলপের মোড়েই ওকে আমি দেখেছি দাঁড়িয়ে থাকতে। একবার তো ওখান থেকে টেনে ওকে বাড়িতে নিয়ে মেরে আধমরা করে রেখেছিলাম। বুঝলে, নিজের ওপর যদি রেসপেক্ট না থাকে তাহলে তুমি গন। তুমি একটা গন কেস।

সুরঞ্জনের মুখ এভাবেই অশ্লীলতায় অশোভনতায় অমার্জিত শব্দ উচ্চারণ করতে থাকে। সোবহান হাল ছেড়ে দেয়। পাঠানপুরে তার বাড়িতে এসে ওকে শুইয়ে দেয় একটা সাজানো সুন্দর ঘরে, ধবধবে সাদা চাদর বিছানো পরিচ্ছন্ন বিছানায়। খাটের পাশে ছোট টেবিলগুলোয় টেবিল ল্যাম্পের হালকা আলো, আর ফুলদানিতে এক থোকা লাল গোলাপ। হাস্নাহেনার ঘ্রাণ ঘরে। জানালার কাছে রাখা টবে ফুল ফুটেছে। সুঘ্রাণ ছড়িয়ে আছে ঘরটায়। কী রকম যেন স্বর্গ স্বর্গ মনে হয় সুরঞ্জনের। ঘরে মদ আছে কিনা জিজ্ঞেস করে সে। সোবহানের সোজা উত্তর, নেই। সোবহান বরং এক বোতল ঠাণ্ডা জল আর একটা গ্লাস এনে রাখে টেবিলে।

– সবার ওপর তোমার খুব রাগ। কেন এত রাগ? সোবহান জিজ্ঞেস করে।

শার্ট খুলে মেঝেয় ছুড়ে দিয়ে জোরে হেসে ওঠে সুরঞ্জন। সোবহান দুটো বালিশ খাটের রেলিং-এ ঠেকিয়ে বসে। ঠিক বসা না, আধশোয়া।

সুরঞ্জন উপুড় হয় বুকের ওপর বালিশ নিয়ে। ঘরে এসি চলছে। আরামে চোখ বুজে আসে। সুরঞ্জন উত্তর দেয় সোবহানের প্রশ্নের, রাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারও ওপর না সোবহান। রাগ আমার নিজের ওপর। এর চেয়ে বেশি সত্য আমার কাছে নেই। আই নো নাথিং মোর।

– ঘুমোও। ঘুমোও তুমি। সোবহান সুরঞ্জনের চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় ধরে সুরঞ্জন বলে, আই উইশ আই কুড কুইট ইউ।

– কী বললে?

– বললাম, আই উইশ আই কুড কুইট ইউ।

– কেন বললে? কুইট করতে চাইলেই তো পারো কুইট করতে। পারো না?

– পারি।

– তাহলে বললে কেন?

সুরঞ্জন ভাঙা গলায় বলে, এটা একটা সিনেমার ডায়লগ।

– ও।

সুরঞ্জনের ঘুমিয়ে থাকা মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সোবহান ঘুমোতে যায়। বাড়িতে বউ-বাচ্চা, বাবা-মা। সকলে খুব অবাক। এত রাতে একটা মাতালকে নিয়ে বাড়ি ফিরেছে সে। ঘটনা কী? বাবা-মাকে শুধু বলেছে, বন্ধু, বিপদে পড়েছে। কেমন বন্ধু, কী নাম, বলেনি। ড্রইংরুমের সোফায় শুয়ে পড়ে। বাচ্চা নিয়ে বউ শোয় অন্য ঘরে। বাড়ি থমথমে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরঞ্জন বাড়ি ফেরে দুপুরবেলা। ফিরে দেখে মায়া তার দুই বাচ্চা নিয়ে বাড়িতে উঠেছে। সঙ্গে দুটো বড় বড় স্যুটকেস। বলছে শ্বশুরবাড়ি আর সে যাবে না। সে এখানেই থাকবে মা-দাদার সঙ্গে। বাচ্চা দুটো এখান থেকেই স্কুলে যাবে।

কেন, কী হয়েছে, শ্বশুরবাড়ির কে কী করেছে, এসব কথা জিজ্ঞেস করেন না কিরণময়ী, না সুরঞ্জন। দুটো ঘরে পাঁচজনের জায়গা ঠিক কী করে হবে সে জানে না। মায়ার এমন স্বামী বা শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে রাগ করে চলে আসা এই প্রথম নয়। যদিও বলে যে আর না, ওভাবে ওই নরকে আর থাকা যায় নয়, সাত দিন পেরোনোর আগেই আবার স্যুটকেস গুছিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। বলে যায়, একবার যখন বিয়ে হয়েছে, স্বামী যেমনই হোক, মেনে তাকে নিতেই হবে। এসব বুদ্ধি তাকে কে দেয় সুরঞ্জন জানে না। কিরণময়ীও না। কেউই মায়াকে কোনও দিন বলেনি– যা, শ্বশুরবাড়ি চলে যা। মানিয়ে নিতে চেষ্টা কর বা বিয়ে যখন হয়েছে স্বামী পাগলছাগল হলেও তো স্বামী। স্বামীই মেয়েদের দেবতা।

অশান্তিতে মানুষের শরীর নষ্ট হয়, শরীর হয় মেদে ভরে যায়, না হয় হাড়গিলে। মায়ার শরীর চাবুকের মতো। ফোলা গাল উবে গিয়ে এখন ভাঙা গাল। ঘন কালো চুল আগে পিঠে পড়তো. যত্ন করতে পারে না বলে ঘাড়ের ওপর কেটেছে। সুবিধের জন্য জর্জেট শিফন শাড়ি পরে, সুতি তাঁত পোষায় না। মেট্রো ধরতে, দৌড়ে বাস-অটো চড়তে কোনও অসুবিধে হয় না। মায়া স্বনির্ভর মেয়ে। বাচ্চা দুটো না থাকলে ও দিব্যি থাকতে পারতো। কেন যে পাঁড় মাতালদের সঙ্গে শুয়ে বাচ্চা নেয় মেয়েরা?

মায়া আসার পর বাড়িটা কলকল করে উঠলো। যেন সত্যিকার বাড়ি এটি। কিন্তু ছোট দুটো ঘরে কী করে বাস করবে ওরা! মায়া অবশ্য বারবারই বলছে, বাচ্চা নিয়ে আমি শ্বশুরবাড়িতে যে ঘরটিতে থাকি, সে ঘরটি এ বাড়ির একটা ঘরের চেয়েও অনেক ছোট। সুরঞ্জন একটা ক্যাম্প খাট কিনে নিয়ে আসে। রাতে বিছিয়ে একজন শুতে পারবে। সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজনটি সে নিজে। আর নিজের বিছানাটি দেয় বাচ্চাদের জন্য। কিরণময়ীর খাটে কিরণময়ী আর মায়া, মা আর মেয়ে। সুরঞ্জন ক্যাঁচরম্যাঁচর হইচই পছন্দ করে না, কিন্তু আশ্চর্য, মায়ার এই চলে আসা, একসঙ্গে এক বাড়িতে বাস করার সিদ্ধান্ত তাকে প্রচুর প্রশান্তি দেয়। যেন আগের জীবন। যেন হঠাৎ করে ফিরে এল কৈশোর-যৌবন। ফিরে এল সেই সব দিন। ছেলেবেলার সেই সব ধুলোখেলা, সেই উচ্ছ্বাস, আবেগ। সেই ভালোবাসায় ভরা দিন। কিরণময়ীর জীবনে হঠাৎ একটা পরিবর্তন। নাতি-নাতনিদের নিয়ে তাঁর জীবনটাও যেন পাল্টে গেছে। কিন্তু এ বাড়িতে তো সংসার চলবে না, বড় বাড়ি ভাড়া নিতে হবে। বড় বাড়ি নেওয়ার পক্ষে কিরণময়ী মত দেন না। কারণ মায়ার আবার মতিগতি যদি পাল্টায়, যদি শ্বশুরবাড়ির কেউ তাকে নিতে আসে, স্বামী আসে, আর মায়া যদি চলে যায়, অথবা কেউ না এলেও সে যদি সিদ্ধান্ত নেয় হঠাৎ করে সে চলে যাবে শ্বশুরবাড়ি। তখন বড় বাড়ি কী করে সামলাবেন কিরণময়ী?

মায়া কারও কথা শুনবে না। দিন দিন সে একটা গোঁয়াড়ে পরিণত হচ্ছে। ঘিঞ্জি গলিতে পলেস্তারা খসা হাড়গেড়ে বেরিয়ে আসা স্যাঁতা পড়া নোনা ধরা বাড়িতে সে থাকবে না জানান দিয়ে বাড়তি যা ভাড়ার টাকা, তা সে নিজে দেবে এই আশ্বাস দিয়ে কাছেই বেগবাগানে নিজেই একটা ভালো বাড়ি দেখে বড় বড় দুটো ঘর, রান্নাঘরটা আগেরটার চেয়ে বড়, স্নানঘর পায়খানা ঘরের সঙ্গে লাগোয়া, এক চিলতে একটা বারান্দাও আছে, উঠলো। এ অঞ্চলেও মুসলমান বেশি। আসলে মুসলমানদের সঙ্গে পাশাপাশি থেকে জন্ম থেকে অভ্যেস যাদের, তারা হঠাৎ নাক সিঁটকোবে কেন? মুসলমান চাকর-বাকর। এতেও অস্বস্তি হয় না। এই গলিতে স্যাঁতসেঁতে ভাব কিছু কম। আগের গলির চেয়ে এ গলি কম সরু। কিছু কম অন্ধকার। তাই, ভাড়া আগেরটির চেয়ে আটশ টাকা বেশি। জিনিসপত্র যা আছে জাননগর থেকে নিয়ে এসে গুছিয়ে নিল। নিজের জমানো টাকা থেকে একটা স্টিলের আলমারি কিনলো। একটা খাট কিনলো। দরজা-জানালার ভালো পর্দা কিনলো। চারটে বেতের চেয়ার কিনলো। সব সে নিজেই করলো। এসবে না ছিল কিরণময়ী, না সুরঞ্জন। যেন এ সংসার তার সংসার। দাদা আর মাকে সে তার সংসারে রাখছে। চাকরিতে তার মাইনে বেড়েছে। মায়া কি আর পেছনে তাকায়? কিন্তু এত সহজে প্রথা ভাঙার মেয়ে তো মায়া নয়। মায়ার সমস্ত বুদ্ধি-বিবেচনা, সাহস-শক্তি প্রচলিত প্রথার কাছে হেরে যায়। স্বামীর সংসার ছেড়ে সে চলে এসেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমন স্বামীর সঙ্গে থাকার কোনও মানে হয় না বলে। কিন্তু সিঁথিতে সিঁদুর ঠিকই পরছে, শাঁখা পলা পরছেই, এমনকি লোহাও বাদ রাখছে না। সুরঞ্জন দেখে হাসে, বলে, কী রে, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই, আর এগুলো পরে আছিস যে! স্বামীর যেন মঙ্গল হয়, তাই?

মায়া চুপ। কথা বলে না।

সুরঞ্জন জোরে হাসে।

ওই হাসির দিকে মায়া ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। হাঁপাতে থাকে সে। চোখ ফেটে জল আসতে চায়।

এবার সে ফেটে বেরোয়।

– শোনো দাদা, জগৎটা তো পুরুষের। জানো তো! তোমাদের জগৎ এটা। তোমাদের যা ইচ্ছে তাই করার জগৎ। আমি যদি আজ সিঁদুর মুছে ফেলি, তোমার মতো বদমাশগুলো সব আমার পেছনে ছুটবে। কিসের লোভ? এই শরীরটার ওপর লোভ। সিঁদুর হলো তোমাদের মতো লোকদের কাছ থেকে বাঁচার জন্য আমার সিকিউরিটি। আর কিছু না।

সকালবেলা চোখের সামনে যখন আনন্দবাজার মেলে ধরা, আর হঠাৎ মায়ার এই বিস্ফোরণ সুরঞ্জনকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। সে জানে না তার কী বলা উচিত। সে জানে তার ইচ্ছে করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। কারও কোনও কথা বা কাজ পছন্দ না হলে এই যে স্থান ত্যাগ করার স্বভাব, এটিকে পলায়নপরতা বলে সে বিশ্বাস করে। কিন্তু কখনও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি এটি ত্যাগ করা। এটি ত্যাগ করতেই সে ঠায় বসে থাকে, চোখ আনন্দবাজারে। কথা বলতে গিয়ে কেন মায়া আজ পুরুষদের বদলে তোমাদের মতো শব্দদ্বয় ব্যবহার করলো, তা ভাবছে সুরঞ্জন। তাহলে কি জুলেখার সঙ্গে তার সম্পর্কের মূল কারণ সম্পর্কে কিছু সে জেনেছে কোথাও? জুলেখা যেহেতু তার চোখের বালি, তার পক্ষ হয়ে মায়ার তো কিছু বলার কথা নয়। বরং মুসলমান মেয়ের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছিল সেটিই ঠিক ছিল, পরে আদর দেখানোটাই শুধু অনুচিত এবং অন্যায়– এ রকমই বলার কথা। তোমার মতো বদমাশ, তোমাদের মতো লোক– এর মানে কী? মানে সুরঞ্জন বদমাশ ছেলে, তার মতো লোকেরা খারাপ লোক, মেয়েদের ওপর লোভ করে, মেয়েদের জীবন নষ্ট করে, তার মতো লোকদের কাছ থেকে বাঁচতে হয়। সে কোন মেয়ের ওপর লোভ করেছে আর তার সর্বনাশ করেছে? ভাবে সে। জীবনের প্রতিটি মেয়ের কথা ভাবে এবং মেয়েদের চোখ দিয়ে সে দেখতে চেষ্টা করে নিজেকে। সুদেষ্ণার কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি মায়া বলতে চাইছে, মায়ার পক্ষ নিতে গিয়ে যার সঙ্গে তিক্ত হয়ে উঠেছিল সম্পর্ক? নাকি জুলেখার? সুদেষ্ণার সঙ্গে বদমাইশি হয়নি, শরীরের লোভের কারণে কিছু ঘটেনি, আর তার জীবনে তার কারণে বিপর্যয়ও কিছু আসেনি। এই কথাগুলো খাটে জুলেখার বেলায়। বদমাইশি, লোভ, বিপর্যয় সবকিছুর শিকার জুলেখা। আর যার প্রতি মায়া তার থাক, তার তো জুলেখার প্রতি কোনও মায়া থাকার কথা নয়। সে কি এমনি নিজেকে রক্ষা করতে আগ্রাসী হয়ে উঠেছে আর তীরগুলো লেগে গেছে যথাস্থানে? নিশ্চয়ই সে খুব কষ্ট থেকে বলেছে, যে কষ্ট থেকে জন্ম নিয়েছে ক্ষোভ। ক্ষোভটাই শুধু দেখা যায়, কষ্টটা অদৃশ্য থাকে।

অনেকদিন পর জুলেখার কথা মনে পড়ে তার। কেমন আছে, জানে না। খোঁজখবরও নেই। কদিন দেখা না হলে সে যে চলে আসতো বাড়িতে, তেমনও হচ্ছে না। এ বাড়িতে এখন তো আসা তার পক্ষে আর সম্ভবই নয়। আর তার ওই মামার বাড়িতে সুরঞ্জনের যাওয়াও সম্ভব নয়। দেখা হওয়ার বাকি যে জায়গা, বাড়ির বাইরে, মাঠে, গাছতলায়, চায়ের দোকানে, ফুটপাতে, রাস্তায়। দেখা করার তাগিদটা কারও ভেতরেই নেই। নাকি একজনের আছে, সে অভিমান করে বসে আছে। অভিমান সুরঞ্জন করে, তবে এখন অভিমানের চেয়েও বেশি কাজ করছে আলসেমি। মাঝে মাঝে এমনই হতাশা তাকে গ্রাস করে ফেলে যে, তার আর জগতের কোনও কিছুতে জড়াতে ইচ্ছে করে না। জুলেখা চাকরি নিয়ে ব্যস্ত। থাকুক সে ব্যস্ত। সুরঞ্জন তো আর তার জীবনের কোনও কাজে আসছে না। জীবনে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এই তিন নিয়ে অপূর্ণতা থাকলে বোধহয় প্রেমেও ঠিক মন বসে না। জুলেখাকেও কদিন উদাস উদাস দেখেছে সে। নিজের পায়ে কিছুটা হলেও সে দাঁড়িয়েছে, এখন ভাবছে মেয়েদের কোনও একটা মেসে বা চাকরিজীবী মহিলাদের কোনও হোস্টেলে উঠে যাবে। ছোটোছুটি করছে মেয়ে। সময় নেই তার। দেখা করার সময় নেই, নাকি সুরঞ্জনের আবেগহীনতা-অপদার্থতা ইত্যাদি কারণে অভিমান? ভালোবাসার তো আর কেউ নেই তার, তবে জুলেখার প্রতি এই অনীহা কেন, যখন রিশপে এত ভালো কাটালো দুজন। কত না স্বপ্ন দেখলো। হয়তো ওই স্বপ্ন দেখাটাই কাল হয়েছে। স্বপ্ন একটা বড় বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। স্বপ্নের বোঝা ভীষণ বোঝা, ওসব বাস্তবায়নের একটা চাপ থাকে। সামনে কোনও স্বপ্ন না থাকলে, কোনও প্ল্যান-প্রোগ্রাম না থাকলে, কোনও অঙ্গীকার না থাকলে, কোনও আশা না থাকলে দিব্যি সুখে কাটানো যায়। দুজন একসঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকবো, একটা বাড়ি, একটা উঠোন, কিছু গাছপালা, একসঙ্গে চা, একসঙ্গে খাওয়া, একটা বিছানা, রাতে বাড়ি ফেরা, শোয়া, শুয়ে আদর-আহ্লাদ, একটা বাচ্চা, একটা স্কুল, টাকা-পয়সার হিসাব, পাকা চুল, অবসর জীবন নাতি-নাতনি, মৃত্যু। চোখের সামনে নিশ্চিত ওই জীবন। সুখের স্বস্তির জীবন। ভাবলে সুরঞ্জনের গা কাঁপে। রিশপে রাত্তিরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জড়াজড়ি করে শুয়ে স্বপ্নের কথা বলছিল দুজন। সারা রাত। আকাশে চাঁদ ছিল, চাঁদের আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘা যে কী অপরূপ হয়ে উঠতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। জুলেখার সঙ্গে তার সবচেয়ে ভালো সময় ওই রিশপেই কেটেছে। এক জীবনে আর কী দরকার! ওই স্মৃতি নিয়ে তার বাকি জীবন চমৎকার কেটে যাবে। জুলেখা থাকুক তার মতো করে, সুখে। সুখে থাকাটাই তো আসল। ওই স্বপ্নগুলো সামনে থাকলেই সুখে থাকা যায়। পূরণ হয়ে গেলে তো স্বপ্ন বলতে তখন কিছু থাকে না। সুখে কাটানোর চেয়ে সুরঞ্জনের মনে হয় সামনে সুখের স্বপ্ন নিয়ে অসুখে কাটানো ঢের ভালো। এতে উত্তেজনা থাকে। উত্তেজনা না থাকলে মৃত্যুর মতো ভয়াবহ শীতল একটি জীবন নিয়ে চরমতম হতাশার অন্ধকারকে সঙ্গী করে ঠায় বসে থাকতে হয়। সে নিজে যেমন বসে আছে। জুলেখা চেষ্টা করে তার জোয়ার দিয়ে মাঝে মাঝে সুরঞ্জনের মধ্যে তরঙ্গ তুলতে। ওঠে তরঙ্গ, কিন্তু কাছে সে না থাকলে আবার শান্ত হয়ে যায় চরাচর। সম্ভবত মেয়েটি তাকে নিয়ে আর কোনও স্বপ্ন দেখে না। না দেখুক। একবার শুধু মাঝে এসএমএস পাঠিয়েছে, কোথায়? লিখে। উত্তর দিয়ে দিয়েছে, বাড়িতে। ব্যস। আর কোনও কথা নেই। সুরঞ্জন একবার আই মিস ইউ লিখেও সেন্ড করেনি। সত্যিই সে জুলেখাকে কি মিস করছিল? তখন মনে হয়েছে– না, করছে না। বরং একটা বই নিয়ে চিত হয়ে শুয়ে থাকতেই তার মনে হয়েছে জুলেখার সঙ্গে প্রেম করার চেয়ে ভালো। বরং তার মনে হয়েছে সোবহানের সঙ্গে গল্প করাও ওই প্রেম করার চেয়ে ভালো। এখন মায়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সময় কাটানো মনে হচ্ছে ঢের আনন্দের কাজ। জুলেখার সঙ্গে সম্পর্কটা সম্ভবত গড়ে উঠেছিল তার নিঃসঙ্গতার কারণে। কিছু অসৎসঙ্গের সঙ্গে টানাপড়েন, নিজের মধ্যে কিছু ভাঙাচোরা, ঠিকানা পাল্টানো শুরু থেকে সব কিছু শুরু করা, আগের জীবন ঝেঁটে বাদ দিয়ে নতুন জীবন গোছাতে গেলে একটা শূন্যতা তৈরি হয়। এই শূন্যতাই ঢুকিয়েছিল জুলেখাকে। প্রায়শ্চিত্ত– ওসব বাজে কথা। প্রায়শ্চিত্ত কখনও কিছু দিয়ে হয় না। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। জুলেখাকে যেভাবে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা হয়েছিল, তা কোনও দিন ওর জীবন থেকে মুছে দেওয়া যাবে না। ধর্ষকগুলোকে সব ফাঁসি দিলেও ওই বীভৎস স্মৃতি জুলেখা যত দিন বাঁচে, বেঁচে থাকবে তার সঙ্গে। তার শ্বাসের সঙ্গে শ্বাস নেবে স্মৃতি।

বাড়িটা আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে দেখতে। এখন মায়ার স্বপ্নের সংসার গড়ে উঠছে বাড়িটায়। শ্বশুরবাড়ির কেউ এখনও খবর অবধি নেয়নি। কিরণময়ীর খুব ভালো লাগছে দেখতে যে, মায়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিদিনকার দুঃসহ জীবন থেকে নিজেকে মুক্তি দেবে। দিতে কি সত্যিই পারবে? আবার হঠাৎ কখন কার ওপর বিগড়ে যায়, কখন আবার কারও আচরণে মন খারাপ হলে তল্পিতল্পা নিয়ে রওনা হবে। ভয় হয় কিরণময়ীর। ঠিক এ সময় কিরণময়ী বুঝতে পারছেন না সুরঞ্জন কী রকমভাবে নিচ্ছে পুরো ব্যাপারটা। সে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। বাড়িতে বোনপো-বোনঝি নিয়ে কাটায়, বাকি সময় বই পড়ে, নয়তো টিউশনি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। জুলেখা অনুপস্থিত। তবে কি দুজনে কোনও মনোমালিন্য হলো? ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল? যদি হয় হয়েছে, এ নিয়ে কিরণময়ী ভেবেই বা কী করবেন। ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন। মায়ার উপস্থিতি যদি জুলেখার অনুপস্থিতি ঘটায়, তবে হয়তো কোথাও কোনও মঙ্গল সত্যিই আছে। মায়া সুরঞ্জনের বোন। বোন চিরকাল থাকে, স্ত্রী বা প্রেমিকা আজ আছে, কাল নেই। সুদেষ্ণা আর জুলেখা এসেছে, গেছে বা যাবে। যার এত বছরেও সংসার হয়নি, তার আর হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। কিরণময়ী মনে করেন না সুরঞ্জনের কোনও সত্যিকারের উৎসাহ আছে। কত কত পুরুষ অবিবাহিত অবস্থায় থাকে। সুরঞ্জনের কপালেও তাই আছে। আর এমন তো ধন-সম্পদ নেই তাদের যে মনে হতে পারে, মরে গেলে এগুলো ভোগ করবে কে বা খাবে কে তাই কিছু বংশের প্রদীপ রেখে যাই। কোনওভাবে সংসার চলে, চলে পর্যন্তই। সদস্য বাড়ানোর কোনও আর দরকার নেই। এমন কিছু রোজগার কারও নেই যে উজ্জ্বল ঝকঝকে কোনও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আছে। এভাবেই টিউশনি করে, এভাবেই ছোটখাটো কাজ করে, এভাবেই দু-তিনটে শাড়ি-কাপড় বিক্রি করে শহরের মধ্যিখানের নামকরা মুসলমান অধ্যুষিত অন্ধকার গলিতে বাস করতে হবে। এর মধ্যে যদি পরিবারটি খানিকটা সুখ-স্বস্তিতে থাকতে পারে, তারই চেষ্টা করতে হবে। সুরঞ্জনের নাহয় হলো না, এখন সে যদি বোনের দুটো বাচ্চাকে মানুষ করতে পারে, তবেই তো ছেলেপুলে না হওয়ার দুঃখ অনেক ঘুচবে। ঠিক কিরণময়ীর মতো মায়াও ভাবছে, সুরঞ্জনও কি ভাবছে না? তার অবচেতনেই ভাবনাটা বসে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবারের সবাইকে এক করে দিল মায়া। একজন সদস্য নেই, দুজন সদস্য বেড়েছে। জুলেখা এই পরিবারের কোনও সদস্য নয়। মায়ার স্বামীও সদস্য নয়। কেমন সব! সুরঞ্জনের অবশ্য কোনও অদ্ভুত জিনিসে আপত্তি নেই। সে বরং এক ধরনের মজাই পায়। এই ঘটতে থাকা অদ্ভুত জিনিসগুলো জীবনে কিছুটা হলেও তরঙ্গ তোলে তার।

এর মধ্যেই একদিন বাড়িতে মায়া তার মেয়ের জন্মদিন পালন করছে। ভালো রান্না হচ্ছে। মায়ার মনও খুব ভালো। এই দিন সুরঞ্জন বলেছে তার এক বন্ধুকে সে ডাকবে। মায়া বলে, একজন কেন, একশ জনকে ডাকো, কিন্তু মুসলমান কাউকে যেন ডেকো না। মায়া যে জুলেখার কথা ভেবে বলেছে তা সে জানে।

কাকে বলছো? নাম কী?

তুই চিনবি না।

না চিনি। নামটা তো বলতে পারো।

শোভন।

সোবহানকে সে শোভন উচ্চারণ করলো। মিথ্যে বলছে, বুঝেই করলো।

ফোনে তার বন্ধুটিকে নেমন্তন্ন করলো নতুন বাড়িতে। বাড়ি বলতে একটা তিনতলা বাড়ির একতলা। ঠিকানাও ফোনে দিয়ে দিল। বলেও দিল, এ বাড়িতে তোমার নাম এখন থেকে শোভন।

শুনে ওদিকে সোবহান বললো, কী বললে?

বলছি তুমি শোভন।

তাই নাকি? হাসলো সোবহান।

হাসছো কেন?

আমাকে আরও অনেকবার হিন্দু সাজতে হয়েছে এবং এই নামটিই তখনও ব্যবহার করতে হয়েছে।

বাহ তাহলে অবশ্য এ রকম আশা করিনি।

তোমার বাড়িতে তো ভালোই।

আমিও করিনি। কিন্তু এ ছাড়া অন্তত আজ উপায় নেই।

কেন ডাকছো, বলো তো।

বাড়িতে ছোট একটা অনুষ্ঠান আছে। তাই...

অনেকে আসছে বুঝি?

কেউ না। ফ্যামিলির বাইরে শুধু একজনই। তুমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– শুধু শুধু বাইরের মানুষ ডাকবে কেন? ফ্যামিলি নিয়েই আজকে করো অনুষ্ঠান।

– ও, তোমার দূর হয়ে যায়, তাই বুঝি?

– না, সে কথা না।

– তবে কী কথা?

– খাওয়ার জন্য যাবো? অত দূর যাবো? খেতে তো আমার তেমন ইচ্ছে করে না। ... তার চেয়ে ...

– একটা কথা বলবো? সুরঞ্জন গলা শক্ত করে বলে।

– বল কী কথা।

– তোমাকে আমার খুব ইচ্ছে করছে দেখতে। তাই ডাকছি। খাওয়াটা উদ্দেশ্য না।

ওদিকে কিছুক্ষণ চুপ থেকে সোবহান বলে। কটায় যাবো?

– যখন ইচ্ছে।

পার্টি বলতে কিছু বেলুন টাঙানো, হ্যাপি বার্থডে লেখা কাগজ টাঙানো। একটা কেক কাটা। আর খাওয়ার মধ্যে বড়দের জন্য ভাত, ডাল, বেগুন ভাজা, পার্শে মাছ, চিংড়ি মাছ আর কাতলা মাছ। ছোটদের জন্য ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন। অতি সামান্য আয়োজন। কিন্তু সোবহান একেবারে অবাক। এত রান্না কেন? কিরণময়ী বললেন, বাবা শোভন আমরা পুব বাংলার মানুষ। ওখানে খাওয়াদাওয়াটা খুব ভালো। অনেক আইটেম রান্নার চল। অতিথিদের খাওয়ানোর চল। এখন সুরঞ্জনের বাবা চলে যাওয়ার পর কিছুই কি আর আগের মতো আছে? কোনওভাবে বেঁচে থাকা আর কী! মেয়েটার শখের কারণে উৎসবটা করছে।

এমন পারিবারিক হইচই আনন্দের পরিবেশে সোবহানকে ডাকতে পেরে সুরঞ্জনের খুব ভালো লাগে। সোবহান বাচ্চাদের সঙ্গে কত রকম খেলা খেলছে। আর মায়ারও ভালো লাগছে বাচ্চাদের চমৎকার একটা নতুন আংকল জুটেছে বলে। জন্মদিনের কথা শুনে সে এনেছে লাল একটা ব্যাকপ্যাক-এর মধ্যে রং পেনসিলের বাক্স, ছবি আঁকার খাতা, কয়েকটা ছড়ার বই, একটা গ্লোব, আর ছবিঅলা একটা এনসাইক্লোপেডিয়ার বিশাল বই। বইটা মায়াও অনেকবার উল্টে উল্টে পড়ে বলেছে, শোভনদা, থ্যাংকু সো মাচ। বইটা এক কথায় অসাধারণ।

বাড়িতে কোনও খাবার টেবিল নেই। বিছানায় বসে খাওয়া। খবরের কাগজ পেতে বিছানাতেই খাওয়া হয়। একমাত্র অতিথি শোভনকে বেশ যত্ন করে খাওয়ায় মায়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোভনের বাড়ি কোথায়?

বেলঘরিয়া।

বেলঘরিয়ার কোথায় বলো তো? আমরাও তো বেলঘরিয়ায় ছিলাম।

সুরঞ্জন বলে, ফিডার রোডে।

কিরণময়ী মাথা নাড়েন। তা হবে। ওখানে তো বেশ সম্পন্ন লোকেরা বাস করে।

শোভনের বাড়িতে কে কে আছে, শোভন কী করে, কোথায় চাকরি, কোথায় ব্যবসা— এসব কিরণময়ী আর মায়া জিজ্ঞেস করে করে জেনে নেয়। সুরঞ্জনের বন্ধুদের মধ্যে শোভনই যে সবচেয়ে ভালো, এত ভালো ভদ্র, অমায়িক সজ্জন ছেলে বন্ধু হিসেবে তার যে আগে জোটেনি, তা মায়াই বলে কিরণময়ীকে। বলে শোভন কী কারণে সুরঞ্জনের মতো একটা অকর্মণ্য, আলসে আর হোপলেসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে, তা বোঝার ক্ষমতা তার নেই। মায়ার এই কথার তীরটি গেঁথে যায় সুরঞ্জনের মাথায়। সুরঞ্জন পুরুষ বলে তার ওপর আশা করা হয় অনেক, সে জানে। কিন্তু তাই বলে এসব তীরের হাত থেকে মুক্তি পাবে না সে কখনও? তাকে কি অহোনিশি বুঝিয়ে দেওয়া হবে সে অযোগ্য, যেহেতু অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের মতো তাকে টিউশনি করে চলতে হয়, যেহেতু টাকা এতে অঢেল নেই, টাকা? সুরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ছোটবেলায় শিখেছিলো দরিদ্রের দেশে টাকা করা লোকেরা কোনও সৎ লোক নয়। কম টাকাতেও জীবন চলে, চলতে পারে। মানুষ হিসেবে বড় হও সেটাই বড় কথা। টাকা নাহয় সুরঞ্জনের কম হয়েছে। কিন্তু মানুষ হিসেবে সে কি বড় হতে পেরেছে? বোঝে যে সে হয়নি। খুব গভীর করে যখন ভাবে, বোঝে। সোবহানের সামনে যখন সে দাঁড়ায়, বোঝে। ওর চোখে যখন চোখ রাখে, বোঝে। সোবহানকে সে ভেতরে ভেতরে ভালোবাসে, আবার ঘৃণাও করে কম না। মায়া কিরণময়ী দুজনই যখন সোবহানের প্রশংসা করছিল, একদিকে ভালো লাগছিল তার বন্ধু বলে, অন্যদিকে ঈর্ষা হচ্ছিল। এই প্রশংসা কেউ কি তাকে করেছে কখনও? যেমন দেখতে, তেমন পড়াশোনায়, তেমন নিষ্ঠ কাজে, তেমন সিনসেয়ার, আপাদমস্তক সভ্য ছেলে। এ হচ্ছে সোবহান। এই ছেলে কেন সুরঞ্জনের সঙ্গে মেশে? তাকে কেন বন্ধু মনে করে? সুরঞ্জন অনুমান করে, তার মতোই নিঃসঙ্গ সে।

সুরঞ্জন বলে, সেদিন সে যা বলেছিল, সবই কিন্তু মদ খেয়ে। ডোন্ট মাইন্ড।

সোবহান বলে, মদ না খেয়ে কি ওগুলো তুমি বলবে না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা নাড়ে, বলবে না।

– বলবে বলে মদ খাও, নাকি মদ খাও বলে বলো? সোবহান হেসে শুধোয়।

সুরঞ্জন হেসে বলে, হয়তো দুটোই।

আমারও মনে হয় তাই। সোবহান বলে।

– তুমি মদ খাও না কেন?

– খাই না।

– কোনও ধর্মীয় বাধা?

– মোটেই না।

– তবে কেন?

– অভ্যেসটা হয়নি ছোটবেলা থেকে। আর যা খেলে নেশা হয়, তা খেতে চাই না। সিগারেট খাইনি কোনও দিন।

– চশম পরা স্কুলের ভালো ছাত্রদের মতো তুমি। সকলে ভালো বলে। তোমার মতো ভালো নাকি কেউ নেই।

– ওটা বেশি দিন বলে না। লম্বা বলে, চশমা পরি বলে, চুল ভালো করে আঁচড়ানো থাকে বলে হয়তো। কম গুণ্ডামি করেছি ছোটবেলায়?

– বলো কী? তুমি জানো গুণ্ডামি করতে?

– খুব জানি।

– এখন ভালো হয়ে গেছ?

– না।

– তবে যে সেদিন অচিন্ত্যকে কিছু বললে না?

– ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করি না।

সোবহান চা খেতে খেতে হাসে। গা ছমছম শুরু হয়ে গেছে সুরঞ্জনের। তবে কি এর ভেতরেও গলদ আছে?

সোবহানকে নিয়ে সাত রকম ভাবনা ভাবে। মানুষটার উদ্দেশ্য কী তার সঙ্গে মেশার? এমনি বন্ধুত্ব নাকি কোনও বদ-উদ্দেশ্য আছে? সংশয় সুরঞ্জনকে সোবহান থেকে দূরে রাখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিশপ থেকে ঘুরে আসার পর যে স্বপ্ন সে দেখতে শুরু করেছিল সুরঞ্জনকে নিয়ে, তা জুলেখার মনে হয়েছে ঠিক নয়। কার সঙ্গে সে সম্পর্ক স্থাপন করবে? যে কিনা তার ভীষণ রকম ক্রাইসিসের সময় সঙ্গে থাকলো না! এ কেমন প্রেমিক সুরঞ্জন যখন নিজ মুখে জুলেখা বললো যে মামার বাড়িতে তার থাকা দিন দিন অসম্ভব হয়ে পড়ছে, ও বাড়ি থেকে তো কালই বেরোতে হবে। যদি তার পার্কের বেঞ্চে কাটাতে হয়, গাছের তলায় কাটাতে হয়, তাও তাকে কাটাতে হবে, এ ছাড়া উপায় নেই। শুনে সুরঞ্জন নির্লিপ্ত। জুলেখা হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

কী ব্যাপার, কিছু বলবে না?

কী বলবো বলো।

কিছু বলার নেই সুরঞ্জন?

সুরঞ্জন চুপ করে থাকে। খুব স্বাভাবিক তার মুখ-চোখ। জুলেখা বোঝে না কী করে প্রেমিক হয়েও এত নির্লিপ্ত থাকতে পারে সুরঞ্জন। সুরঞ্জনের নীরবতা জুলেখাকে তপ্ত করতে থাকে। এক সময় সে বলে, তোমার বাড়িতে? তোমার বাড়িতে আমি থাকতে পারি না?

সুরঞ্জন চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ সেই চুপ থাকা মুখের দিকে তাকিয়ে অপমানে-লজ্জায় জুলেখার চোখে জল আসতে থাকে। জল আসুক সে চায় না, কিন্তু আসে। চায়ের দোকানে তর্ক করা যায় আর কতক্ষণ? চোখের জলও আর ঢাকা যায় কতক্ষণ? জুলেখা ওঠে। সুরঞ্জন শুধু বলে যে, সেদিন বিকেলেই জুলেখার জন্য একটা থাকার জায়গা খুঁজে বের করে সে ফোনে জানাবে। জুলেখা দুদিন অপেক্ষা করেছে। কোনও ফোন আসেনি। জুলেখার কোনও ফোন সুরঞ্জন ধরেওনি। শুধু তিনটে এসএমএস পেয়েছে সে। তিনটিতেই লেখা– আই লাভ ইউ। এই আই লাভ ইউ জুলেখাকে সুখ দিতে চেয়েও দিতে পারেনি। কী করে মানবে সে সুরঞ্জন তাকে ভালোবাসে, যখন তার দুঃখের দিনে সে অমন পালিয়ে বেরিয়েছে। বলে দিলে কী ক্ষতি ছিল যে, জুলেখা আমি তোমাকে কোনও রকম সহযোগিতা করতে পারবো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, বা এ ধরনের কিছু। সুরঞ্জনের হৃদয় বলে একেবারেই কিছু নেই তাও জুলেখা মানতে পারে না। যেভাবে ওই গণধর্ষণের পর সুরঞ্জন পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, হৃদয় না থাকলে কেউ পারে? জুলেখা আবার ভাবে, হয়তো সে সময় হৃদয়ের খুব একটা প্রয়োজন ছিল না। পাপবোধ-অপরাধবোধ থেকে সে পাশে এসেছিল। অবশ্য হৃদয় না থাকলে তো অপরাধবোধও থাকে না। কত হৃদয়হীন মানুষকে হত্যা করছে, মানুষের অনিষ্ট করে বেড়াচ্ছে, কোনও অপরাধবোধ তো তাদের মধ্যে নেই। অপরাধবোধ থাকা আর ভালোবাসা থাকা, জুলেখা বিশ্বাস করে যে দু জিনিস। হৃদয় থাকলে দুটোই থাকে। কিন্তু অপরাধবোধ থাকলে প্রায়শ্চিত্য করে মুক্ত হয়ে যায়, ভালোবাসা থাকলে ভালোবেসেই মুক্তি। কই! সুরঞ্জনের ভালোবাসা তো জুলেখা টের পায় না। 'আই লাভ ইউ' ওই তিনটে শব্দের মধ্যে ভালোবাসার চেয়ে প্রায়শ্চিত্তের গন্ধ পায় জুলেখা।

নিজে সে যত দুর্ভোগ আছে, একা একা সব পোহানোর পর, চার-পাঁচটা হোস্টেল দেখে একটিতে উঠে যাওয়ার পর, ফোনে সুখবরটা দেবে যে ভয় নেই, তার আর দরকার হবে না জুলেখার বিপদে পাশে দাঁড়ানোর, বিপদ সে কাটিয়ে উঠেছে। গলা শুনেই সুরঞ্জন খুশি খুশি ব্যস্ত স্বরে বললো, উৎসব হচ্ছে বাড়িতে, জন্মদিনের উৎসব।

কোথায়? জুলেখা জিজ্ঞেস করে।

সুরঞ্জন বলে, বেগবাগানে।

– কার বাড়িতে?

– ও, তুমি তো জানো না, বাড়ি পাল্টোছি আমরা। এখন বেগবাগানে থাকি।

– ও। তা তো জানতাম না।

– হ্যাঁ, তোমাকে জানানো হয়নি।

– তা কেমন আছো?

– ভালো?

– হ্যাঁ, খুব ভালো। ফোনটা রেখে দেওয়ার ইচ্ছে সুরঞ্জনের, ইচ্ছেটা কণ্ঠে উঠে আসে।

– ও বাই দ্য ওয়ে, এক রিয়েল জেন্টলম্যানের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব।

– কী বলছো?

– শোভন। ইউ মাস্ট মিট শোভন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলেখা বলে, আজেবাজে কথা বলছো। তুমি খুব ব্যস্ত বুঝি?

– হ্যাঁ, খুব।

– ঠিক আছে আনন্দ করো। আমি রাখছি।

জুলেখা রেখে দেয় ফোন। চায় না সে তার পরও তাকে দেখতে হয় চোখের জল। চোখ জ্বালা করে, বুক জ্বালা করে জল নামে। বারবার মুছে ফেলে জল। চায় অন্য কিছুতে মন দিতে। কোনও একটা ম্যাগাজিন টেনে নিয়ে পড়তে থাকে। কিছুই পড়া হয় না। চোখ ফেটে আবারও জল। এবার স্নান করে নেয়। অনেকক্ষণ ধরে স্নান।

স্বপ্ন কী প্রচণ্ড ছিল তার! পাহাড় থেকে এক পাহাড় স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল। আর এসেই কিনা শীতল সুরঞ্জনকে দেখতে হলো। তার দুঃসময়ে একবার পাশে এসে দাঁড়ালো না। কোনও প্রেমিক, পৃথিবীর কোনও বাজে প্রেমিকও কি এই আচরণ করবে? শহরে নিজের একটা বাড়ি আছে থাকার। সেই বিছানায়, যে বিছানায় তাকে নিয়ে কতবার শুয়েছে তার প্রেমিক, সেই ঘরে সেই বিছানায় সে যদি স্থান না পায় বাকি জীবনের জন্য, তবে অন্তত কিছুদিনের জন্যও কি সুরঞ্জন তাকে জায়গায় দিতে পারতো না? ভীষণ দুঃসময়ে প্রেমিকের কথা তো বাদই, বন্ধুর মতো কোনও কাজ সে কি করেছে! কী করে জুলেখা ভাববে এর সঙ্গে সম্পর্ক চালিয়ে যাবার! মহব্বত তাকে ভালোবাসতো না, মহব্বতের অশ্লীল ব্যবহার, অকথ্য গালিগালাজ, অমানুষিক মারের চেয়ে সুরঞ্জনের ঠাণ্ডা শীতল ব্যবহার জুলেখার কাছে অনেক বেশি অপমানজনক। সুরঞ্জনের সঙ্গে তার ভালোবাসার সম্পর্ক। মহব্বতের সঙ্গে তা ছিল না। ভালোবাসার মানুষ যখন পাশে দাঁড়ায় না, ডাকলেও যদি তাকে না পাওয়া যায়, অভিমান করলেও যদি সে অভিমান ভাঙায়, তাকে অকূলে ভাসিয়ে যে নির্বিকার বসে থাকতে পারে, তার সঙ্গে কী প্রেমের খেলা খেলবে সে!

প্রতিদিন সকাল-দুপুর-বিকেল-রাত সে ভেবেছে, সুরঞ্জন ফোন করবে, খবর নেবে কী হলো না-হলো, প্রতিদিন সকাল-দুপুর-বিকেল-রাত ভেবেছে সুরঞ্জন হয়তো কোথাও কোনও কাজে ভীষণ ব্যস্ত, কিন্তু মুক্ত হয়ে সে ছুটে আসবে। শুধু আশায় বসতি।

জুলেখা স্নান করতে করতে চোখের জল মুছে ভাবতে থাকে সম্পূর্ণ নতুন জীবন তাকে শুরু করতে হবে। হাজরার মোড়ে বিকেবিতে, মেয়েদের হোস্টেলে একটি জায়গা পাওয়া যেন বেহেস্ত পাওয়া। এর চেয়ে কাঙ্ক্ষিত তার আর ছিল কী! ল্যান্সডাউনে গিরিবালা হোস্টেল ছিল, ওটায় জায়গা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। অগত্যা বিকেবিতেই। দুজনের জন্য ঘর। সঙ্গে মুর্শিদাবাদ থেকে আসা একটা মুসলমান মেয়ে। চাকরি করছে ব্যাংকে। কলকাতায় থাকার জায়গা নেই, আত্মীয় নেই, অগত্যা হোস্টেল। মেয়েটার সঙ্গে সামান্য কিছু কথা হয়েছে। অবিবাহিত মেয়ে। নাম ময়ূর। নামটা শুনে মন ভালো হয়ে গেছে এবং মেয়েটার ওপর সদয়ও হয়েছে সে। একবার জিজ্ঞেস করেছিল জুলেখাকে, সে বিবাহিত কিনা। বলে দিয়েছে, না। ইচ্ছেও করেনি ছেলেটির কথা বলতে। ছেলে তার, এতকাল তাই মনে হতো। এখন জুলেখা বোঝে ছেলে আসলে তার নয়, ছেলে মহব্বতের। জন্ম দিয়েছে সে। এইটুকুই। জন্মের পর যত্ন করেছে, পায়খানা-পেচ্ছাব পরিষ্কার করেছে। কাঁথা-কাপড় ধুয়েছে। বুকের দুধ খাইয়েছে। হাঁটাচলা শিখিয়েছে, স্নান করিয়েছে. মুখে তুলে খাইয়েছে। সম্পূর্ণ বাবার মতো মন নিয়ে বড় হচ্ছে ছেলে। দেখতেও মহব্বতের মতো। মাকে ধীরে ধীরে ভুলে যেতে তার আপত্তি নেই। এক মা'র পরিবর্তে আরেক মা পেয়েছে। মায়ের অভাবও আর সে বোধ করছে না। আগের মা'টা হয়তো সে ভাবছে, বেশি ভালো ছিল। কিন্তু এই মা'র সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া বেশি বুদ্ধিমানের কাজ, এই বয়সেই তা সে বুঝে নিয়েছে। জুলেখার এখন নাড়ির টান থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ আত্মীয়স্বজনহীন, সম্পূর্ণই বন্ধুহীন সে। কেউ নেই তার, নিজেরই ধর্ষককে নিজের প্রেমিক করতে বাধ্য হয়েছিল এমনই অসহায় সে। ওই উদারতা দেখিয়েও তার কোনও লাভ হয়নি, প্রেমিক যাকে ভেবেছিল, সে আসলে প্রেমিক ছিল না।

সে জানে তাকে এভাবেই নিজের চেনা গণ্ডি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে একা আরও একা হয়ে যেতে হবে। যদি সেই নতুন জগতে কোনও নতুন বন্ধু আসে, আসবে। তা না হলে যেমন জীবন, তেমনই থাকবে। এই জীবনে দুর্যোগ আছে বলে আত্মহত্যা করতে হবে, মরতে হবে, কেঁদে ভাসাতে হবে তার কোনও মানে নেই। মন্দ লোকেরা মন্দ কাজ করবে, ঠগ বদমাশরা লোক ঠকাবে, জালিয়াতি করবে, মিথ্যে বলবে, তাই বলে তার জীবন নষ্ট করবে কেন সে? জুলেখা আবারও ভালো করে চোখ মোছে। এ কদিনে শরীরের মেদ তার অনেক ঝরেছে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে নিভিয়া ক্রিম মাখতে মাখতে সে লক্ষ করে। মুখটা এখন আগের চেয়ে ভালো দেখাচ্ছে। বিকেবির খাওয়া আরও মেদ ঝরাবে। মাসে বারো শ টাকায় থাকা-খাওয়া জুটবে এই মহিলা নিবাসে। মামার বাড়ির চেয়ে ঢের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢের ভালো। মামার বাড়িতে ছিল দোজখের পরিবেশ। ওরা আত্মীয় ছিল কি? ছিল রক্তচোষা জোঁক। ছেলেকে দেখার সুবিধে ছিল বলে মামার বাড়ির মেঝে কামড়ে পড়ে ছিল। কিন্তু বাড়িটিও যখন আরও বেশি কামড়াতে লাগলো, ছেলেরও বাঁধন ছিঁড়ে যাওয়া মন, তখনই তার এমন বেরিয়ে পড়া। নিজের একার পায়ে দাঁড়ানো। খোঁজখবর কেউ করেনি। জুলেখা মনে করে না পৃথিবীতে তার মতো স্বজনহীন আর কেউ আছে। কেউ তো কারও খোঁজ কখনও না কখনও করে। জুলেখা মরে গেছে, যারা তাকে চিনতো, হয়তো মনে করে। এ জীবনটা এখন শুধু তার। জীবনটা এমন কিছু জীবন নয়। একে আর সে বোঝা ভাবতে চায় না। মুখে নিভিয়া ঘষতে ঘষতে সে বারবার দ্যাখে নিজেকে। খুঁতে ভর্তি শরীর। যেখানে দাগ থাকা উচিত নয়, সেখানে দাগ। যেখানে তিল থাকলে ভালো হতো, সেখানে নেই। চোখ বড় কিন্তু পাঁপড়িগুলো বড় নয়। নাকটা আরও একটু খাড়া হলে ভালো হতো। চুল ঘন, কিন্তু রেশমি নয়। ঠোঁটটা সুন্দর। এই ঠোঁটে চুমু খেয়েছে কত কতবার সুরঞ্জন! শীর্ণ বাহু হলে নাকি বেশ লাগে। জুলেখার বাহুতেই মেদ জমে। খুঁতভর্তি শরীরটাকেই আজ তার ভালো লাগে। খুঁত থাকে মনে, শরীরে না। এই কথাটা আজ তার মনে হয়। কোনটা খুঁত, কোনটা নয়, তা কে বলে দেবে। যখন আয়নার সামনে সে, ময়ূর বললো, – আপনি খুব সুন্দর।

– আমি?

– হ্যাঁ, আপনি।

– আচ্ছা তোমার নাম ময়ূর কেন?

– আমার বুবু রেখেছিল নাম। বুবু একবার আজমীর গিয়েছিল, ওখান থেকে জয়পুরে ময়ূর দেখে পাগল বুবু। আমি তখন জন্মেছি। নাম রাখলো তাই ময়ূর। কেন, নামটা ভালো না?

– খুব সুন্দর। আমি এত সুন্দর নাম কোনও দিন শুনিনি।

জুলেখা অনুমান করে ময়ূরের সঙ্গে তার একত্রবাস অসহনীয় হবে না। হোস্টেল জীবন তো কেউ চায় না। সবারই স্বপ্ন থাকে স্বজনবেষ্টিত জীবনের। জুলেখার কাছে এই হোস্টেল জীবনটিই প্রার্থিত এখন। সুরঞ্জনের মতো ভীরু দ্বিধান্বিতর সঙ্গে জীবন জড়িয়ে কোনও লাভ নেই। এমন কনফিউজড ক্যারেকটার নিয়ে জীবন যাপন করা কোনও সুস্থ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাকরি একটা বোরিং চাকরি। দাঁড়িয়ে থাকো। কাস্টোমার এলে সুন্দর করে হেসে কথা বলো। প্রয়োজনে ইংরেজি বলো। হিন্দি বলো। তিনটে ভাষা জানে বলে সহজে জুলেখার চাকরিটা হয়েছে। বেতন পাঁচ হাজার। টাকা তো জীবনে সে কখনও রোজগার করেনি এর আগে। এই প্রথম তার নিজের রোজগার। নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়া। নিজের পায়ে দাঁড়ানো। কারও মার না খাওয়া। কারও গালিও না শোনা। কারও অবজ্ঞা আর অপমান না সওয়া। কারও ভিক্ষেয় বাঁচা নেই। কারও করুণায় জীবন কাটানো নেই। এই জীবনটা যদি দ্য বেস্ট জীবন না হয়, তবে কোনটা। চাকরিটা বোরিং, কিন্তু বিবাহিত জীবনটা কি খুব ঝলমলে ছিল? ওখানেও তো বোরিং জব করতে হতো, ঘর পরিষ্কার করো, খাওয়া তৈরি করো, পরিবেশন করো– ওসবের বিনিময়ে কোনও অর্থ তো জুটতো না। পেটে– ভাতে চাকরানি রাখে লোকে, ঠিক ও রকম, বেতনহীন চাকরানির কাজ ছিল মহব্বতের বাড়িতে। সুরঞ্জন স্বপ্ন দেখিয়েছিল। ওসব অলীক স্বপ্ন। সত্যিকার ভালোবাসা পাবার কপাল নিয়ে জুলেখা জন্মায়নি। এই সত্যটি মানতে খুব কষ্ট হয়, কিন্তু মানতেই হবে, এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। এ নিজের পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি উচ্চতার মতো, এটাকে মেনে নিতে হবে, হা-হুতাশ করলে হা-হুতাশই করা হবে, উচ্চতা বাড়বে না। পৃথিবীর কত কত মেয়ে কোনও প্রেম তো পায়ইনি, বরং জীবনভর নির্যাতন সয়ে গেছে। আজ, জুলেখা তার জীবনের ওই সব দুর্ঘটনার কাছে কৃতজ্ঞতাবোধ করে। তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া, একের পর এক তাকে ধর্ষণ করা, খোদ স্বামীর বাড়িতে সুরঞ্জনের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক, স্বামীর কাছে ধরা পড়া, স্বামীর মার, দ্বিতীয় বিয়ে, দেশের বাড়িতে বাবার ঘৃণা পাওয়া, আত্মীয়দের নিন্দা. রবিউল আর সুলতানার অবজ্ঞা, মামার বাড়ির অত্যাচার সবই তার জীবনে বয়ে এনেছে বিরাট সম্ভাবনা। জীবন যদি মসৃণ হতো, সে এই জায়গায় দাঁড়াতে পারতো না, যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে আজ। মানুষের ক্রুরতা হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, ধর্মান্ধতা, এসব না থাকলে সে আজ এই জগতে এসে দাঁড়াতে পারতো না, যে জগৎটা তার নিজের।

সে তো জানতো দুর্বল, ভঙ্গুর, পরাশ্রয়ী হওয়া ছাড়া তার আর উপায় নেই। তার ভেতরের সাহস আর শক্তিকে সে চিনতে পারতো না, যদি তাকে ঘাড় ধরে না বের করতো স্বামী। সুরঞ্জন যে তাকে শিখিয়েছে ভালোবেসে শরীর স্পর্শ করা, তাকে যে প্রেম দিয়েছে তার জন্য জুলেখা কৃতজ্ঞ নয়, কৃতজ্ঞ তাকে যে ধর্ষণ করার উদ্দেশ্যে কিডন্যাপ করেছিল তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য। ওই দুর্ঘটনাটি তার জীবনকে পুরো পাল্টে দিয়েছে। দুর্ঘটনা এবং সুরঞ্জনের কাছে সারা জীবন এই একটি কারণে সে কৃতজ্ঞ থাকবে। চাকরি থেকে হোস্টেলে ফিরে মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, হোস্টেলের পুরোনো বাসিন্দাদের কাছে আরও বেশি এই জীবনের কথা জানা, টেলিভিশন দেখা, ঘুমোনো, এ রকমই তার জীবন। হাত নিশপিশ করে সুরঞ্জনকে ফোন করার জন্য, কিন্তু বিচ্ছিরি একাকীত্বকে কাটানোর জন্য সে মন দেয় অন্য কোথাও। হাতটাকে, হাতের আঙুলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে।

সুরঞ্জনের ফোন আসে একদিন।

– চলে এসো সন্ধ্যেবেলা।

– কোথায়?

– কলা মন্দিরের সামনে এসো সাড়ে ছটায়। ওখান থেকে দুজন কোথাও যাবো।

– কোথায়?

– কোথাও।

– কোথাও মানে?

– কেন, তুমি চাও না?

– চাওয়ার কোনও কারণ আছে?

– এসোই না। আজ নতুন কিছু ঘটবে।

– কী নতুন?

– দেখবে। এখনই বলবো না। সারপ্রাইজ।

AMARBOI.COM

এই সারপ্রাইজটি জুলেখাকে হৃদকম্প দিতে থাকে। সারা দিন কাজে মন বসে না। ক্যাশে বসে তাকে মেশিনের বোতাম টিপতে হচ্ছে। মন অন্য কোথাও। বারবার ভুল করছে হাতের আঙুল, ভুল করছে চোখ। কী সারপ্রাইজ সে দিতে পারে? বলবে যে বিয়ে করবো চলো, বলবে যে এখন থেকে একসঙ্গে থাকবো? বলবে চলো এত দিন তোমাকে ছেড়ে থাকায় হাড়ে হাড়ে বুঝেছি তোমাকে কী ভীষণ ভালোবাসি! তোমাকে ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় ভালো থাকা। আর কী বলতে পারে? বলতে পারে, চলো বাড়ি চলো, মায়ার যে সমস্যা ছিল জুলেখাকে মেনে নেওয়ার, সেটি থেকে সে এখন মুক্ত, নাকি সুরঞ্জন কোনও মোটা মাইনের চাকরি পেয়েছে। কুড়ি হাজার টাকা মাইনে। নাকি তুমি তো রিশপ নিয়ে গেলে, চলো তোমাকে শিমলা নিয়ে যাই। বা দুজন চলো মন্দারমনিতে দুদিন থেকে আসি, বা আন্দামানে। কিছু একটা। সারপ্রাইজ আর কী হতে পারে সুরঞ্জনের?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘণ্টা দুই পর আবার ফোন।

– শোনো জিমিস কিচেনে চলে এসো, কলা মন্দিরের কাছেই।

– আচ্ছা।

– ছটায় দিকে আবার একটা ফোন, শোনো মার্কো পোলো চায়নায়। পার্ক স্ট্রিটে।

জুলেখা যায় ওই মার্কো পোলোয়। না খুব সাজেনি। পরেছে সাদা ব্লাউজ আর সাধারণ সুতির একটা নীল শাড়ি। মুখ যেমন আছে, নিভিয়া ক্রিমের ওপর আর কিছু বসেনি। ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক। যার সঙ্গে প্রতিদিন তার দেখা হতো, তার সঙ্গে প্রায় দু সপ্তাহ কোনও দেখা নেই। জুলেখার হু হু করা অন্তর সুরঞ্জনকে দেখে যতটা শান্ত হয়, তার চেয়ে বেশি অশান্ত হয়। কী যে ভালো লাগছে তাকে দেখতে! তারও পরনে নীল শার্ট। চুল অল্প এলো। এতে আরও ভালো লাগছে। গালের তিলটি ঠিক ও রকমই। কতবার সে চুমু খেয়েছে তিলটায়। ইচ্ছে করে ছুঁয়ে দেখে। চোখ দুটো হাসে সুরঞ্জনের তাকে দেখে, ঠোঁট হাসে। অপলক সেই চাহনি। কিন্তু কিছুক্ষণ। দ্রুত সে চোখ সরিয়ে নেয়, একটু দূরেই বসে জুলেখা। মুখোমুখি।

– বাহ্। সুরঞ্জনের উচ্চারণ।

– বাহ্ কেন?

– ভালো লাগছে।

– কী?

– তোমাকে।

সুরঞ্জনের পার্থক্যটা অন্য ছেলেদের চেয়ে এই এখানেই। অন্যরা বলবে, শাড়িটা সুন্দর তো। সুরঞ্জন বলবে তোমাকে সুন্দর লাগছে এই শাড়িতে।

জুলেখা বলে,– তোমাকেও ভালো লাগছে দেখতে।

– হুম।

– মানে?

– খুব স্মার্ট হয়েছো।

– ছিলাম না?

– এতটা ছিলে না।

– তাহলে তো ভালোই। উন্নতি হচ্ছে, অবনতি নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– তা তো নয়ই। তোমার সেন্স এসটিমটা বরাবরই বেশি। আমার মতো নয়।

– তা হঠাৎ আমাকে স্মরণ করার কারণ কী? যাকে ভুলে গেছো, তাকে ভুলে গেছো। ডাকলে যে! সারপ্রাইজ কী দেবে শুনি?

– দেখবে।

– দেখবো? নাকি বলবে কিছু?

– দেখবে।

– দেখাও।

– দাঁড়াও। অপেক্ষা করো।

এভাবেই আরও কিছুক্ষণ কথা চলতে থাকে। সুরঞ্জন হুইস্কির অর্ডার দেয়। জুলেখা ব্লাডি মেরি। পাহাড়ে সুরঞ্জনের কাছে ব্লাডি মেরিতে হাতেখড়ি জুলেখার। দুজনের গ্লাস সামান্যই শেষ হয়েছে, তখনই সোবহানের আগমন।

– এ হলো আমার বন্ধু, শোভন ওরফে সোবহান। মোহাম্মদ সোবহান।

জুলেখা একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে গ্লাসে চুমুক দেয়।

সোবহান বসে সুরঞ্জনের পাশের চেয়ারে। নিজের জন্য সে একটা স্প্রাইটের অর্ডার দেয়।

– ওর কথাই তোমাকে বলেছিলাম, জুলেখার কথা। খুব ভালো মেয়ে। জিরো থেকে উঠে এসেছে। এখন একটা চাকরি করে। এমন মেন্টাল স্ট্রেন্থ, ভাবাই যায় না। অমার পক্ষে তো এমন হওয়া সম্ভবই না। আর সোবহান তো বিশাল জিনিস। আমার আইডল বলা চলে। মনোবলের পাহাড়। ওয়েল এস্টাব্লিস্ট। তোমাদের দুজনের স্বভাব-চরিত্রে এত মিল। অ্যামবিশাস। কেরিয়ারিস্ট। ভাবলাম পরিচয় করিয়ে দিই।

এরপর সুরঞ্জনের সঙ্গে কথা কিছু বলে জুলেখা, বেশি বলে সোবহানের সঙ্গে। কোথায় বাড়ি, কোথায় ঘর, কী চাকরি, কী ব্যবসা। ফিডার রোডে নিজের ফ্ল্যাট, নাকি ভাড়া। নিজের শুনে চমকিত হয়।

সুরঞ্জন বলে, ভেবো না। ওর গাড়িও আছে। গাড়ি চালিয়ে তো এল আজ। পার্কিং পেলে কোথাও?

সোবহান ঘাড় নাড়ে। ওরও কি জুলেখার প্রতি আকর্ষণ? ঠিক বোঝা যায় না। সে শুধু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যায়। নিজে কোনও প্রশ্ন করে না। সুরঞ্জনের কাছে যেটুকু শুনেছে, সেটুকুকেই সে যথেষ্ট মনে করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলেখা কথায় কথায় বলে, আমি খুব ছোট চাকরি করি। আমার তো চাকরিবাকরি করার কোনও কথা ছিল না। কথা ছিল স্বামী-সন্তানের সেবা করবো। হঠাৎ একটা দুর্ঘটনায় সব এলোমেলো হয়ে গেল। দুঃসময়ে যারা সঙ্গে থাকে, তারাই সত্যিকার বন্ধু। আমার বন্ধু বলতে সত্যি বলতে কী, কেউ নেই। যা ছিল, তা সুরঞ্জনই। তিন কূলে যার কেউ নেই, আমার মতো জীবন তাদের। তবে যা আছে সামনে তা দেখতে চাই। জীবন আমাকে যেটুকু দেয়, যাই দেয়, সব গ্রহণ করতে চায়। আপনি?

সোবহান দেখতে সুরঞ্জনের চেয়ে অনেক ভালো। আধুনিক। বুদ্ধিমান। ধোপদুরস্ত। কী করে এর ঠিক উল্টো চরিত্রের ছেলে সুরঞ্জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো, তা বোঝা দুষ্কর। জুলেখা জানে, দেখতে ভালো ছেলের আসলে কোনও মূল্য নেই। মন কেমন, সেটিই বড় কথা। কথা বলতে সে ব্লাডি মেরি দুটো শেষ করে এবং বোঝে যে সোবহানের সঙ্গ তার ভালো লাগছে, সততা আর সভ্যতা দুটো জিনিস জুড়ে দিয়ে বানানো হয়েছে সোবহানকে। আপাতত তাই মনে হয়। আসলে কী, তা কি আর কম করে হলেও বছর না গেলে বোঝা যাবে? কিন্তু সোবহান যত মহানই হোক না কেন, জুলেখার তাতে কী! এইটুকু হলো, যে জানা হলো, সুরঞ্জনের একজন ভালো বন্ধু আছে। এর অর্থও এই নয় যে সুরঞ্জন একটু জাতে উঠলো, বন্ধুভাগ্য ভালো হলেও কারও মর্যাদা বেড়ে যায় না। মর্যাদা বাড়ে সে যদি মর্যাদা বাড়ানোর মতো কাজ করে। জুলেখার আবার চোখ জ্বালা করতে চায়, কিন্তু স্মৃতিকে সে ব্লাডি মেরি দিয়ে তাড়ায়।

আপনি খুব কম কথা বলেন।

সোবহান হাসে। বলে প্রথম দিনের পরিচয়ে খুব বেশি কিছু বলার তো কারও থাকে না।

প্রেম করে বিয়ে করেছেন?

এই প্রশ্নে একটু থতমত খায় সে। সময় নেয় উত্তর দিতে।

থাক, উত্তর দিতে হবে না। প্রেম এই শব্দটা মনে হয় আপনার কাছে একটু অস্বস্তিকর।

আপনার কাছে অস্বস্তিকর নয়?

মোটেও না। প্রেম একবারই এসেছিল আমার জীবনে। আর আসবে কিনা, জানি না। কারও কারও জীবনে একবারই আসে।

কেন? হৃদয় দুয়ার কি বন্ধ করে রেখেছেন নাকি?

বন্ধ ছিল না। বন্ধ করার কথা ভাবছি। আপনার কী? বন্ধ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবারও ঠোঁট টিপে লাজুক হাসি হাসে সোবহান। কোনও মেয়ের সঙ্গে এভাবে কথা বলতে সে অভ্যস্ত নয়। সুরঞ্জনের সঙ্গে হলে হয়তো কথা হতে পারতো।

আপনি সিনেমায় দেখা ভালো মানুষদের মতো।

কথা কম বলি বলে লোকে আমাকে ভালো মানুষ বলে।

আসলে কি ভালো নন?

আপনার টাকা আছে, কিন্তু অহংকার নেই, এই কারণেও হয়তো ভালো বলে।

আপনার সঙ্গে সুরঞ্জনের খুব মেলে?

কী রকম? আমি তো জানি ওর সঙ্গে আমার খুব কম মেলে। কী মেলে? দুজনই মদ খাই? আমার অবশ্য জীবনে এ দ্বিতীয়বার খাওয়া। ...

না, তা নয়।

তবে?

আপনারা দুজনই আমাকে খুব কম জেনে খুব প্রশংসা করছেন।

জুলেখা আর সোবহানের কথাগুলো খুব মন দিয়ে সুরঞ্জন শুনছিল এবং উপভোগ করছিল সে যে টেবিলে আছে, তা জুলেখা কি ইচ্ছে করে ভুলতে চাইছে নাকি মুহূর্তেই সোবহানের প্রেমে পড়ে গেছে, ঠিক বুঝতে পারছে না।

আলাপে রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি, জাত-পাত-ধর্ম কিছুই আসেনি। যা এলো প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রেম-আবেগ-ভালোবাসা সম্পর্ক বিচ্ছেদ। সুরঞ্জনের এই-ই ভালো লাগে, অন্য কোনও প্রসঙ্গ বিশেষ করে রাজনীতি আর অর্থনীতি হলে তো তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যায়, উঠে চলে যায় অন্য কোথাও। সে বলে দেয় এসব কঠিন জিনিস আমি বুঝি না। তাহলে কী ভালো লাগে, খেলার কথা বলো। আর কিসের কথা, ইতিহাস ভূগোল? ইতিহাস মোটেই না, ভূগোল বরং বলতে পারো। সংসার? ধুত। বইপত্র? বোরিং। গান, বাজনা? হ্যাঁ, সেটা চলে। নাটক? দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুরঞ্জন বলে, না। কেন? কী কেন? এত অনীহা কেন? ভাল্লাগে না। কী ভাল্লাগে? শুয়ে থাকতে, ভাবতে, কিছু না করতে, ঘুমোতে। প্রেম? ও আমার জন্য নয়। বাচ্চাদের পড়াতে ভাল্লাগে? লাগে। নিজের সম্পর্কে কী ভাবো? কিছুই না। সবচেয়ে বেশি কী ভালো লাগে? তামাশা। কারও সঙ্গে? নিজের সঙ্গে, অন্যের সঙ্গে। মনে মনে নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দেয় সুরঞ্জন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুটা বুদ্ধিদীপ্ত, কিছুটা অসংলগ্ন, কিছু অর্থবহ, কিছু অনর্থক কথোপকথন চলে আর রাত বাড়তে থাকে। সোবহান বিল মেটালো। সুরঞ্জন অনেকটাই মাতাল। জুলেখার কিছুই হয়নি। সোবহান ভালো ছেলে। ধবধবে সাদা শার্টেও একবিন্দু দাগ নেই। সুন্দর আঁচড়ানো চুল। দাড়ি-গোঁফ নেই। মুখে দাগ-গর্ত নেই। সাদা দাঁত। বাঁধানো নেই, হলদেটে নেই। ছ ফুট লম্বা। লিকলিকে নয়। ভারীও নয় শরীর। সুরঞ্জনের চেয়ে বয়স বছর কয়েকের ছোট। এমন যুবক তো প্রার্থনীয়, বিশেষ করে জুলেখার। সোবহান গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে যায় বেগবাগানে সুরঞ্জনকে, জুলেখাকে হাজরায়।

রাতে সুরঞ্জনের ফোন জুলেখাকে। তখন সে কাপড় পাল্টে মুখ-হাত ধুয়ে দাঁত মেজে রাতের পোশাক পরে সবে শুয়েছে।

সুরঞ্জন ওদিক থেকে বললো, কেমন লাগলো?

ভালো।

দারুণ না?

হ্যাঁ, দারুণ।

বলেছিলাম তোমাকে।

আসলে অনেক দিন ভালো খাবার খাই না তো। মামার বাড়ির অখাদ্য আর হোস্টেলের অখাদ্য গেলার পর এ রকম খাবার... দারুণ।

AMARBOI.COM

ধুত। আমি বলছি সোবহানকে লাগলো কেমন?

ও সোবহান। ভালোই তো।

খুব হ্যান্ডসাম না?

হ্যাঁ।

জুলেখা এবার বলে, যে কথাটি রেস্টুরেন্ট থেকেই সে ভাবছিলো বলবে, আচ্ছা তুমি আমাকে একটা সারপ্রাইজ দেবে বলে যেতে বলেছিলে। দিলে না কেন?

সারপ্রাইজ। তো দিয়েছিই।

জুলেখা অবাক, কখন দিলে? মদ খেয়ে খেয়ে তুমি শেষ হয়ে যাচ্ছো। কিছু আর মনে থাকে না।

আমার সারপ্রাইজ তো সোবহান। মোহাম্মদ সোবহান। সুরঞ্জন রহস্য ভাঙা কণ্ঠে বলে।

ও সারপ্রাইজ হবে কেন, ও তো তোমার বন্ধু।

তোমার সঙ্গে দেখা করালাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো করালে। তোমার রেপিস্ট বন্ধুদের সঙ্গে তো প্রথমদিন দেখা করিয়েছিল। রেপিস্ট ছাড়া আর কেউ যে আছে তা তো জানতাম না। আর এ যে রেপিস্ট নয়, তাই বা কী করে জানবো?

বাজে কথা বলো না। আমি তোমার কাছে অনেকবার ক্ষমা চেয়েছি প্রথম দিনের জন্য। ওই দিনটির কথা তুমি প্লিজ আর বোলো না।

তাহলে বলে দাও কী কী কথা বলবো। কী কথা তোমার শুনতে ভালো লাগে বলো।

সোবহানকে কেমন লাগলো বলো।

সোবহানকে আমার লাগা দিয়ে তুমি কী করবে শুনি?

নিজে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। চাকরি করছে না। ব্যবসা করছে। ও বোধহয় সল্ট লেকে নিজেই একটা কোম্পানি শুরু করবে।

খুব ভালো। দেখো ওখানে একটা চাকরি তুমি পেতে পারো কিনা। নিশ্চয়ই তুমি চাইলে দেবে। উদার বলেই তো মনে হলো। বিলটা নিজেই দিল।

হ্যাঁ, খুব উদার।

ভালো বন্ধু তুমি জানো না সুরঞ্জন, কখন দরকার লেগে যায়। আমরা তো আত্মীয় আত্মীয় করে মরি। দেখা যায় কোনও একটা বন্ধুই হয়তো সারা জীবনের সহায় হলো। এই যে মামার বাড়ি থেকে যেদিন আমার বেরিয়ে যেতে হয়েছিল, তুমি হেল্প করবে বলে ব্যস উবে গেলে। আমাকে কয়েক দিন থাকতে দিয়েছিল আমারই এক চেনা মেয়ে, তার বাড়িতে। মেয়েটা চেনা মাত্র, বন্ধু হয়নি তখনও। আমার কলিগ। ওইটুকু অল্প পরিচয়ে ওই উপকারটুকু করে ফেললো। বন্ধুর কাজটা করতে তুমি পারোনি। সুতরাং দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব থাকলেই যে সে তোমার সত্যিকার বন্ধু, তা নাও হতে পারে। দুদিনেই কেউ সত্যিকার বন্ধু হয়ে উঠতে পারে। বলতে বলতে জুলেখা চোখ মুছছে, কিন্তু গলাটা যথাসম্ভব শুকনো করে রাখছে। ভেজা কণ্ঠ সে আর যাকেই শোনাক, সুরঞ্জনকে শোনাবে না।

সোবহানের সঙ্গে দেখো..

কী দেখবো?

দেখ যদি একটা সম্পর্ক করতে পারো...

মানে?

মানে বলছি কী, একটা সম্পর্ক আমার চাইতে ওর সঙ্গে হওয়াই ভালো না কি?

কী বলছো কী তুমি? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলছি।

আজ তোমার মাথার ঠিক নেই। কাল কথা বোলো। আজ রেখে দিই।

সুরঞ্জন না না করে ওঠে। বলে,– তোমার সঙ্গে সোবহানের একটা সম্পর্ক হোক।

– কেন চাও?

চাই কারণ তোমার যোগ্য লোক আমি নই, যোগ্য সোবহান।

কিসের যোগ্য? কী সম্পর্ক চাও? সম্পর্ক তো কত রকম হয়। ভাই হয়, বন্ধু হয়। তোমার চাওয়াটা শুনি।

ওকে তোমার প্রেমিক করে নাও। ওকে বিয়ে করো।

বিয়ে?

হ্যাঁ, বিয়ে।

তুমি আর আমি বিয়ে করবো, এ রকমই না কথা হচ্ছিল।

না। সেটা ঠিক হবে না।

সুরঞ্জন, তুমি প্রেমিক না হতে পারো, না হও। কিন্তু ঘটক হওয়ার দায়িত্ব তো তোমাকে আমি দিইনি।

দাওনি। আমি নিজে নিয়েছি। তোমাকে ভালোবাসি বলেই তোমাকে এই উপদেশ দিচ্ছি। আমি একটা লম্পট, লোফার, আমি একটা রেপিস্ট, জীবন নিয়ে আমার হতাশা ছাড়া আর কিছু নেই। তোমার সঙ্গে যেটা হচ্ছিল, সেটা ক্ষণিকের। কিছুক্ষণ পরই আবার যেই সেই। আমি একটা বাজে। একটা হিন্দু।

মানে?

হিন্দু-মুসলমান– এসব তুমি কবে থেকে দেখা শুরু করলে? সোবহানকে নিয়ে এলে সে মুসলমান বলে?

জুলেখার বিস্ময় কাটতে চায় না।

ওর সঙ্গে তোমার মিলবে?

কী করে বুঝলে? মুসলমান বলে?

হ্যাঁ।

ছিঃ সুরঞ্জন। এ রকম যদি হতো, যে আমি ধর্ম বিশ্বাস করতাম। মুসলমানদের নিয়ে আমার কোনও আবেগ থাকতো, তুমি বলতে পারতে। তোমার আলসেমি, মদ খাওয়া, অসৎ সঙ্গ, তোমার উদাসিনতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, আপাদমস্তক তুমি তো একটা ইরেসপনসিবল ছেলে, তোমার ক্যালাসনেস এসবের অনেক সমালোচনা-নিন্দা আমি করেছি। কিন্তু তোমার ধর্ম নিয়ে আমি কোনও দিন তো কিছু বলিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ধর্ম আমার ধর্ম বলো না। আমার কোনও ধর্ম নেই।

ধর্ম না থাকলে আজকে তুমি সোবহানের কাছে আমাকে সম্প্রদান করতে চাইছো যে, সোবহান মুসলমান বলে।

তুমি সুখী হবে ওর সঙ্গে।

কী করে হবে ওর সঙ্গে?

কী করে জানো?

আমি জানি। আমি আরও জানি আর যার সঙ্গেই হও, আমার সঙ্গে তুমি সুখী হবে না।

তুমি কি জ্যোতিষী নাকি? জ্যোতিষ বিদ্যাতেও বোধহয় হাত পাকিয়েছো, কে জানে। আর শোনো, আমার বিয়ে নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন? আমি কি বলেছি এক্ষণি আমাকে বিয়ে করতে হবে?

তোমার দরকার।

সে আমি বুঝবো। তোমার সঙ্গে সম্পর্কটা তুমি বাদ দিচ্ছ। বাদ দিচ্ছ কি?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, কষ্টের মধ্যেও হাসে জুলেখা, সোবহান তো ম্যারেড, ওর বাচ্চাও আছে। তা কি ভুলে গেছ?

তাতে কী?

তাতে কী মানে? কী বলছো কী?

তোমাদের মধ্যে তো এক পুরুষের একাধিক ওয়াইফ থাকতে পারে।

কী বললে তুমি? আমাদের মধ্যে? আমাদের মধ্যে মানে কী? মুসলমানদের মধ্যে?

তা কি আর জানো না?

ছিঃ ছিঃ এতটা নিচে নেমেছো?

জুলেখা একটু থামে। ঠোঁট দুটো চেপে রাখে কিছুক্ষণ। তার কণ্ঠ ভাঙলে চলবে না। তার মনে রাখতে হবে, তার সঙ্গে সে কথা বলছে এখন, যে তাকে কোনও দিন ভালোবাসেনি। ঠকিয়ে গেছে। প্রথম দিন থেকে। এ রকম ভাবলেই কণ্ঠ থেকে কষ্ট দূর হবে। কিছুক্ষণ সে তাই ভেবে নিয়ে ঠোঁট বিযুক্ত করে।

– আমার মনে হয় সুরঞ্জন, ধীরে ধীরে বলতে থাকে জুলেখা, আমার লাইফ নিয়ে আমার হেডেক থাকলে বেটার হয়। তোমাকে আমি দায়মুক্ত করছি। সেই যে রেপ করিয়েছিলে লোক দিয়ে, সেটার প্রায়শ্চিত্ত, আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে তোমার শেষ হলো। তোমার ভগবান তোমাকে শাস্তি দেবেন না। দায়মুক্ত তুমি, পাপমুক্ত। সো, গো অন। ভালো দেখে একটা হিন্দু মেয়ে দেখে যা করার করো। নেড়ে মেয়ে আরেকটা নেড়ে ছেলে খুঁজে নেবে। তোমার অস্থির হওয়ার কিছু নেই।

জুলেখা চোখ মুছতে থাকে বাঁ হাতে। ঢল নামছে চোখে।

– এ রকমভাবে কথা বোলো না জুলেখা। ইচ্ছে হচ্ছে তোমার কাছে চলে যাই এখন। তুমি কি কাঁদছো?

না না। কাঁদবো কেন? আশ্চর্য তো! কাঁদবো কেন? কাঁদার কী ঘটেছে? হিন্দু মুসলমানের বিয়ে হলে পুরো সমাজ কচুকাটা করে। ফ্যামিলি যায়। কাজের জায়গায় অসুবিধে হয়। চাকরি যায়। জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। লোকে ছিঃ ছিঃ করে। অত ছিঃ ছিঃর মধ্যে বাস করবে কী করে কে! তুমি তো বন্ধুর মতো উপদেশ দিচ্ছ। কাঁদার তো কারণ নেই। তোমাকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। অনেক ধন্যবাদ। এবার রাখি ফোনটা। কাল সকালে উঠতে হবে।

জুলেখা ফোন কেটে দিয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করে। সারা রাত তার ঘুম আসে না। উঠে সে মোবাইলে পাঠানো পুরোনো এসএমএসগুলো পড়ে। ওই দিনগুলো চোখের সামনে, আবার যোজন যোজন দূরে। তাহলে এ কথাই সত্যি যে, একটা ভুল মানুষকে সে এত দিন ভালোবেসেছিল। ধর্ষক জেনেও, হিন্দু জেনেও। আত্মীয়স্বজন কোনও দিন তার মুখ দেখবে না, জেনেও। মহব্বত এত দিনে জুলেখা-গল্প ছড়িয়ে দিয়েছে জুলেখার যত চেনা জানা পরিচিত আত্মীয়স্বজন গ্রামে-শহরে যা ছিল, সবার কাছে। সে ব্রাত্য। অনেকটা বেশ্যা হয়ে যাওয়ার মতো। তাকে কেউ কোনও দিন খুঁজবে না। সোনাগাছিতে বিক্রি হওয়া মেয়েদের যেমন কেউ খুঁজবে না। সুরঞ্জনের পাঠানের এসএমএসগুলো, ওর কাছে তার পাঠানোগুলোও সে ইরেজ করে ফেলে। জীবন থেকে ইরেজ হয়ে গেল অনেক দিনের সম্পর্ক। এক বোতাম টিপেই। ভোর হবে। নতুন জীবনের নতুন একটি দিন শুরু করবে সে। সেখানে বন্ধু বলে, প্রেমিক বলে, আপন বলে কেউ নেই তার। কোনও রাগ বা অভিমানও নেই তার। সে একা। একটা বৃক্ষের মতো একা। নাকি একটা চারাগাছের মতো একা। জুলেখা কোনও ঝড়েই আর ভাঙতে চায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরদিন সকালে হু হু করা জীবনের দিকে তাকিয়ে একটা সিদ্ধান্ত সে নেয়, সে পড়াশোনা করবে, সেও প্রাইভেটে এম এ পরীক্ষা দেবে, অথবা যোগমায়া দেবী কলেজে রাতের ক্লাস করবে, বিএড-এর ক্লাস। ঠিক ময়ূর যেমন করছে। জুলেখা বহুদিন পর নিজের দিকে ভালো করে তাকালো। তাকিয়ে একটি জিনিস সে টের পায় যে, নিজের জীবনটার দিকে তাকালে, নিজের কথা একটু ভাবলে পুরুষ লোকের ভাবনা থেকে মন মুক্তি পায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক দিন ওদের কারও খবর নেই। জাননগরের বাড়িতে দুদিন গিয়ে ফিরে এসেছি। আসলেও হন্যে হয়ে খুঁজছি আমি। সুরঞ্জন ফোন ধরে না। এ সময় জুলেখার ফোন পাই আমি। ওর নম্বরটি অচেনা নম্বর। সাধারণত অচেনা ফোন আমি ধরি না। মাঝে মাঝে ওসব অত মনেও থাকে না যে অচেনা নম্বর আমার ধরা উচিত নয়।

জুলেখা একবার দেখা করতে চাইছে। হঠাৎ দেখা কেন, অনুমানও করতে পারি না। সুরঞ্জনের কথা জিজ্ঞেস করলে জুলেখা জানায় যে সে ভালো আছে। দিব্যি আছে।

– দিব্যি আছে?

– হ্যাঁ, দিব্যি আছে।

দিব্যি আছে বলায় জুলেখার কিছুটা অভিমান কিছুটা রাগ উপচে পড়ে। শান্ত কণ্ঠ আমার। রাগ অভিমানের চিহ্ন নেই কেবলই কৌতূহল।

– ফোন ধরছে না কেন?

– ধরছে না, কারণ ফোন ফেলে দিয়েছে।

– ফেলে দিয়েছে? কোথায়?

– কোথায় আবার, বালিগঞ্জের লেকে।

– লেকে? লেকের জলে।

বিড়বিড় করে বলতে থাকি। জুলেখা বলে যেতে থাকে তার নিজের কথা। তার এম এ, তার বিএড। তার ঘরের মেয়ে ময়ূর। ময়ূরের দিনলিপি। হোস্টেলের প্রতিদিনকার তেতো-মিঠে অভিজ্ঞতা। আমার হঠাৎ প্রশ্ন, কিরণময়ী, সুরঞ্জনের মা ভালো আছেন?

– আছেন।

– মায়ার খবর কিছু জানো?

– না। তবে ভালোই আছে। ওরা একসঙ্গে থাকছে এখন।

একসঙ্গে থাকছে। এর গল্প অনেক। এত গল্প ফোনে হয় না। জুলেখা বলে সে আসবে একদিন আমার কাছে। সামনে বসেই বলবে সব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরঞ্জনের সঙ্গে একটু কথা বলার দরকার ছিল বলাতে জুলেখাই আমাকে সুরঞ্জনের নতুন বেগবাগানের বাড়ির ঠিকানা দেয়। এবং আবারও বলে দেয় যে দেখা করতে সে এর মধ্যে একদিন আমার বাড়িতে আসবেই। তাকে কোনও একটা বিকেল বলে দিই আসার জন্য।

যে ছেলে এত দিন আমার খোঁজ নেয়নি, তাকে কেন খামোখা খুঁজতে যাবো আমি! তার চেয়ে কোনও একদিন কিরণময়ীর সঙ্গে দেখা হলে ভালো। ওঁর মধ্যে একটা কী যেন আছে, একটা মা মা। ওই মা মা ব্যাপারটা চুম্বকের মতো।

জুলেখা যেদিন এলো সেদিন রোববার। সন্ধ্যে হয় হয় করছে। বারান্দার বাগানে দুজন বসলাম। জুলেখা আগের দিনের চেয়ে অন্য রকম। খুব বিনীতভাবেই বললো, আপনার সময় নষ্ট করা আমার উচিত হচ্ছে না।

আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, ওকে 'তুমি' বলেই ডাকি আজ। কী খাবে বলো? চা?

যদি ব্লাডি মেরি হয়, ভালো হয়।

একটু চমকিত হই। মদখোরের সঙ্গে থেকে এই ব্যাপারটা হয়েছে জুলেখার, মদ খাওয়া শিখেছে। অ্যাবসোলুট ছিল, ওর মধ্যে লেবু আর লঙ্কা দিয়ে আমার এক বন্ধু বলেছিল, খেতে ভালো।

– ব্লাডি মেরি নেই। এটাই খেতে হবে।

– আপনি কিছু খাবেন না?

– আমি চা খাবো।

– আপনিও নিন এ রকম একটা গ্লাস। চা তো খাচ্ছেনই। ভদকা যখন আছে ঘরে, একটা নিন সঙ্গে। একা একা খেতে ভালো লাগে না।

– আমি হুইস্কি ভদকা এসব বিদেশ থেকে আসার সময় সব বন্ধুর জন্য নিয়ে আসি। কলকাতায় তো সবাই মনে হয় ড্রিংক করে। তোমার তো নিশ্চয়ই সুরঞ্জনকে ভালোই দেখা হয়েছে।

– সবাই ড্রিংক করে না। সোবহান ড্রিংক করে না।

আমি উঠে নিজের জন্য শেষ অবধি গ্লাসে ভদকা নিই। খুব প্রিয় কোনও বন্ধু হলে, খুব ভালো আড্ডা হলে, খুব ভালো খাবার থাকলে, খুব ভালো রেড ওয়াইন থাকলে তবেই আমি পান করি কিছু, নয়তো নয়। এ কথা তো জুলেখাকে বোঝানো যাবে না। সে যে আমার প্রিয় কোনও বন্ধু নয়, খুব ভালো আড্ডা দিতে যে আমরা বসছি না, সে কথাও তো বলা শোভন হবে না। অতএব অল্প ভদকায় বেশি ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে ফুরফুরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাওয়ায় এসে বসি। একখানা চুমুক দিই। জুলেখার তখন বেশ কটি চুমুক হয়ে গেছে।

– বলো, আছো কেমন?

– ভালো।

– হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে কেন?

খুব বড় যে কোনও কারণ আছে, তা নয়। অনেকদিন থেকে খুব মন চাইছিল। আমার মনে হচ্ছিল, এ মুহূর্তে কিসের মধ্য দিয়ে আমি যাচ্ছি, তা বোধহয় আপনি বুঝবেন।

– বলো তো।

– সুরঞ্জন আমার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে চায় না।

কেন?

জুলেখা থেমে থাকে। গ্লাসটি নাড়তে থাকে। দুজনে দুটো বেতের চেয়ারে। ঠিক মুখোমুখি না। সামনে আকাশের দিকে তাকানো দুচোখ। দল বেঁধে পাখিরা নীড়ে ফিরছে। পাখি থেকে আমার চোখ সরে না। এত পাখি, নীড় কি সবার এক!

– সুরঞ্জনের সঙ্গে কেন সম্পর্কটা নষ্ট হবে! কারণ কী?

– কারণ সে নিজে জানে। আমার পক্ষ থেকে কিছুই না। সম্পূর্ণ ওর সিদ্ধান্ত।

হঠাৎ এমন একটা সিদ্ধান্ত? ও তো বললো, সেদিনই বললো, রিশপ থেকে ফেরার দিন, বললো, তোমাকে নিয়ে সে একসঙ্গে থাকতে চায়।

– হ্যাঁ, বিয়ে করার কথা তো ও নিজেই বলেছিল। আসলে ব্যাপারটা তো একজনের ছিল না। দুজনের ব্যাপার। দুজনই আমরা চেয়েছি।

– তারপর?

– তারপর সে হঠাৎ অফ হয়ে গেল। আমার সঙ্গে আর দেখা করলো না, যোগাযোগ করলো না। ফোন নম্বরও তখন পাল্টে ফেলেছিল। ফোন তো সে পারতপক্ষে ব্যবহারই করতে চায় না। বললো তার মাকে নাকি দিয়ে দিয়েছে। সবকিছুই খুব স্ট্রেঞ্জ।

– তা, এসব আমাকে বলছো কেন? আমি কী করতে পারি তোমার জন্য?

– আপনি কিছুই করতে পারেন না। ও আমার পেছনে একটা ছেলেকে লেলিয়ে দিতে চাইছে। বলছে ছেলেটা মুসলমান, সুতরাং আমি যেন বিয়ে করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার বিশাল চমক আমার জন্য। হঠাৎ রকিং চেয়ার থেকে উঠতে গিয়ে ভদকা পড়ে গেল অনেকটা। সে পড়ে যাওয়ায় মন নেই, মন জুলেখার কথায়।

– আমি ভাবছি, মুসলমান ছেলের সঙ্গে প্রেম করবো আমি, ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে। রিলিজিয়াস বলতে যা বোঝায়, তা আমি কোনও দিনই না। ভেবেছিলাম ও-ও না। কোনও দিন পুজো-আর্চা করেনি। কোনও দিন দেখিনি ঠাকুর দেখে নমস্কার করতে। ওসব বলেইনি কোনও দিন, বরং মায়ার খুব নিন্দা করতো, মায়া মন্দির আর হাবিজাবি সব বাবা নিয়ে থাকে বলে। কিন্তু এত ভিতু ও, এত সংকীর্ণ মন ওর! ভাবলে কষ্ট হয়।

– তুমি ভেতরে রাগ পুষে রাখছো। ঠাণ্ডা মাথায় হয়তো অন্য রকম করে ভাববে।

– অত ঠাণ্ডা হয়েই বা সব জিনিস করতে হবে কেন? চাইছে যখন প্রেম করি, করবো।

– তোমার কি সব সময় প্রেম করতেই হয় জুলেখা? একজন চলে গেলে আরেকজন কি তৎক্ষণাৎ তোমার দরকার হয়?

জুলেখা একটু অপ্রস্তুত হয়। কী বলবে ঠিক বুঝতে না পেরে মাথা নেড়ে বলে, না।

– তাহলে এক্ষুনি তোমার কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হবে না। আরও সময় নাও চিন্তা করার, আরও ভাবো।

জুলেখা হাসে। হাসতে হাসতে বলে, –বেশি ভাবলে গণ্ডগোল হয়ে যায়। জীবনের সব ভালো সিদ্ধান্তগুলো আমি হুট করে নিয়েছি।

– কী রকম শুনি? কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ সিদ্ধান্ত তোমার মতে?

– বিয়ে করার ব্যাপারটা অনেক ভেবেছিলাম, ওটা খারাপ সিদ্ধান্ত। সুরঞ্জনের সঙ্গে সম্পর্কে যাবো কিনা এ নিয়ে ভেবেছিলাম বেশি। অবভিয়াসলি ভুল সিদ্ধান্ত। ভালো সিদ্ধান্তের মধ্যে আছে চাকরি নেওয়া, হোস্টেলে ওঠা, কলেজে পড়া। এগুলো হুট করেই নেওয়া।

– খুব ডিসিপ্লিন্ড তুমি জুলেখা। সুরঞ্জন বোধহয় একেবারে উল্টো?

– বাইরে থেকে মনে হয়। আসলে ভেতরে সে আমার চেয়ে অনেক বেশি ডিসিপ্লিন্ড।

– বলো কী? অবশ্য তুমি আমার চেয়ে বেশি মিশেছো, জানো বেশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– আপনি ওর ক্যারেকটার নিয়ে যা লিখেছেন 'লজ্জা'য়, ঠিক ও রকম না ও। পলিটিক্স নিয়ে আপনি লিখেছেন– ও খুব মেতে থাকে। আমার কিন্তু তা মনে হয় না।

– এখন হয়তো না। তখন ছিল। যে সময়কার কথা লিখেছি।

– আসলে ওর সঙ্গে পুরো ব্যাপারটাই আমার অ্যাকসিডেন্ট ছিল। ওর জন্য আমার ফিলিংস আছে। থাকবে না কেন? কিন্তু সেটা টিকিয়ে রাখার আমি কোনও কারণ দেখি না।

– হুট করে কি কাউকে ভুলে যাওয়া যায়? মন তো হু হু করবেই।

জুলেখাকে আরও ভদকা দিতে হয়। দিতে দিতে বলি,– তুমি কিন্তু আবার ওর মতো হয়ে ওঠো না। মদ আর খেও না।

– না বুবু, সুরঞ্জনের মতো হবো না। প্রমিজ।

– সুরঞ্জনের কি কোনও ভালো দিক নেই?

জুলেখার আবদার সোবহানের সঙ্গে দেখা করবে সে, করবে আমার বাড়িতে। বলে দিই, তাকে আমি চিনি না, জানি না, কী করে ডাকবো আমি তাকে!

সে পরম উৎসাহে বললো, আজই।

আমার একটু অবাক লাগে। জুলেখার কথাবার্তা-আচরণ খুব রহস্যময়। আমার বাড়িতে বসেই আমার কোনও অনুমতি না নিয়ে সে সোবহানকে ফোনে অনুরোধ করতে থাকে চলে আসার জন্য। ঠিকানা দিতে থাকে আমার বাড়ির। আমার ভীষণ রাগ হতে থাকে। এ উটকো ঝামেলাকে বেশ তো বসতে দেওয়া গেল। এদিকে প্রচুর লেখালেখির কাজ আমার। বাড়িতে প্রায় বছর হলো, আড্ডা বন্ধ করে দিয়েছি। ফালতু আড্ডায় সময় নষ্ট করার চেয়ে কোনও একটা বই পড়া বা একা বসে ভাবা অনেক ভালো। অথবা মিনুকে একটুও সময় দিতে পারি না খেলায়। ফুটবল সামনে নিয়ে বড় করুণ মুখে ও চেয়ে থাকে আমার দিকে। আজকাল এমন হয়েছে ও একা একদম খেলতে চায় না। দুজন না খেললে সে খেলবে না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে এত জোরে জোরে ও 'সোবহান প্লিজ, সোবহান প্লিজ' করতে থাকে যে পুরো ব্যাপারটা বড় বিচ্ছিরি দেখতে লাগে। এসব দেখে আমি আর বসে থাকতে না পেরে বলে দিই,

– শোনো, জোর করে এখানে কাউকে ডেকে এনো না তো! আর, আমি তাকে চিনি না, এখানে ডাকছো কেন? বরং...

– বরং কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– বরং তোমরা অন্য কোথাও দেখা করো। আমার নিজের অনেক লেখাপড়া আছে। খামোখা এখানে ভিড় করার দরকার নেই। আর কাকে ডাকছো? কে সে?

– আমার বন্ধু।

– তোমার বন্ধু? ভ্রুকুঞ্চনে সংশয় আমার।

– হ্যাঁ।

– নাকি ও সুরঞ্জনের বন্ধু। ওই যে বলছিলে একটা ছেলেকে ও লেলিয়ে দিতে চাইছে। আসলে তো তুমিই চাইছো নিজেকে লেলিয়ে দিতে।

জুলেখা মাথা নামিয়ে বলে, আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন।

– ঠিকটা কী বুঝবো বলো। একটা লোক আসতে চাইছে না, তাকে তুমি বারবার করে অনুরোধ করছো? সুরঞ্জন জানে এসব?

– ও চায় এসব।

– তুমিও তো চাও মনে হয়।

– আমি?

– তুমি কি বলতে চাও তুমি চাও না?

জুলেখা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমি কিন্তু আপনাকে পুরুষবিদ্বেষী হিসেবে ভাবি না, লোকে যাই বলুক।

খুব চালাকের মতো নাকি খুব বুদ্ধিমানের মতো উত্তর এটি, ভাবি। জুলেখাকে খুব অভদ্র অর্বাচীন মেয়ে বলে মনে হয়। খুব তাড়াহুড়ো করে আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করছে যেন। শাড়িটাও কেমন ক্যাটক্যাটে গোলাপি। কানে লম্বা দুল পরেছে। বড় একটা টিপ পরেছে কপালে। আমার অনেকবার ইচ্ছে করে, বলি, টিপটা খুলে রাখো, দুলগুলোও খুলে রাখো। কিন্তু বলি না। বলি না এই কারণে, তার যদি পছন্দ হয় ওসব পরতে, আমি বাধা দেওয়ার কে! বাধা না দিয়েও তো নিজের মত প্রকাশ করতেই বলি– তুমি তো খুব সাজো।

– সাজি?

– হ্যাঁ সাজো। আচ্ছা একটা কথা বললে তুমি আবার রিপিট করো খেয়াল করেছো?

– তাই!

– হ্যাঁ, তাই। অনেকটা সুরঞ্জনের মতো।

– করে নাকি? খেয়াল করিনি।

– করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– করে!

হঠাৎ জুলেখা উঠে বললো, একটু বাথরুমে যাবো। বলে গটগট করে হেঁটে যায় আমার স্টাডির দিকে। অচেনা লোকের ড্রইংরুম পর্যন্ত অ্যাকসেস। ভেতরে এভাবে ঢোকাটা আমার অপছন্দ। অভদ্রতা বলে মনে হয়। বাথরুম আমি নিজে দেখিয়ে দিতে পারতাম। বাড়িতে তিনটে বাথরুম। আমার ব্যক্তিগতটিকে অতিথির আনাগোনা নিষিদ্ধ। তাছাড়া অতিথিদের ঢোকাতে গিয়ে দেখেছি আমার একটাও শ্যানেল ফাইভ অবশিষ্ট নেই। আপন বলে যাদের আমি মনে করি, তারাই আমাকে না বলে আমার শ্যানেলকে আপন ভেবে পকেটে বা ঝোলায় ঢুকিয়ে ফেলে। দু-একজন মন্দ লোক এই কাজ করে, সন্দেহ জাগে সবার ওপর। তাই আমি চাই না ও ঘরে কেউ যাক। আমার শ্যানেলের জন্য নয়, মনটাকে আমার সংশয়মুক্ত করার জন্য।

জুলেখা বসে বসে মায়ার নিন্দা প্রাণভরে করতে থাকে। মায়ার কারণে সুরঞ্জন বউ ছেড়েছে। মায়ার কারণে জুলেখাকেও ছাড়লো। এই দজ্জাল বোন যত দিন আছে, তত দিন সুরঞ্জন শান্তি পাবে না। জুলেখার কথার ধরন আমার পছন্দ হয় না। ওর সঙ্গে সুরঞ্জনের সম্পর্ক আমি কোনও দিনই খুব উদার মনে নিতে পারিনি। আমার সব সময়ই মনে হয়েছে, এই সম্পর্কটা যেটার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা খুব শক্তিশালী কিছু নয়। যদিও দুজনের কেউই আমাকে বলেনি, কী সেই ভিত্তি। অনুমান করে নিতে আমি বরাবরই খুব পারি। কিন্তু অনুমানের জন্য যে আগ্রহটা দরকার, সেটা, সত্যি বলতে, নেই আমার। জুলেখাকে আমি একবার বলিও,– শোনো পুরনো সম্পর্ক শেষ হয়, নতুন শুরু হয়। তাই বলে তোমার নিন্দা করতে হবে একজনকে। তা কেন?

– কারণ কি জানেন? আমি আপনার মতো উদার হতে পারি না।

– এর মধ্যে উদারতার কিছু নেই। জাস্ট চরিত্র। এক-একজনের চরিত্র একেক রকম।

– আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন আমার চরিত্রে অন্যের নিন্দা আছে।

জুলেখা কি সুরঞ্জনের বদনাম করার উদ্দেশ্যে আমার কাছে এলো! আর, হোস্টেলে থাকা মেয়ে যেহেতু কোনও বাড়িঘর পাচ্ছে না প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করার, তাই আমার বাড়িই ভরসা। আর কী থাকতে পারে কারণ! সুরঞ্জনের জন্য আমার মায়া হতে থাকে। নিশ্চয়ই এমন সব কাণ্ড জুলেখা করেছে যে, তার পক্ষে সম্পর্ক চালিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ যখন ভীষণ রকম রাজনৈতিক-সামাজিক-পারিবারিক অস্থিরতার মধ্যে কাটায় তখন বোধহয় ভালোবাসা-প্রেম খুব তুচ্ছ হয়ে ওঠে তাদের কাছে। নাকি উল্টো?

বাথরুম থেকে বেরিয়ে সে বলে, আরও খাবে সে ভদকা। আমার ইচ্ছে করে 'না' বলে দিতে। ইচ্ছে করে জুলেখার মতো অভদ্র অসভ্যকে বের করে দিই বাড়ি থেকে। বলি– তোমার নতুন প্রেমিক নিয়ে অন্য কোথাও যাও। আমার বাড়ি কোনও পাবলিক মিটিং প্লেস নয়। বলতে পারি না, কিন্তু আমার আচরণে এক নির্লিপ্তি পেঁচার মতো বসে থাকে।

এক সুদর্শন পুরুষ এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। সোবহান। জুলেখাকে চায়। সোবহানকে সম্ভাষণ জানিয়ে বাইরের ঘরে ওদের কথা বলার সুযোগ দিয়ে ভেতরে স্টাডিতে চলে যাই। সুজাতা ওদের চা-বিস্কুট দেয়। কিছুক্ষণ পর জুলেখা সোজা ঢুকে পড়ে স্টাডিতে।

– আপনি আসুন দিদি, ওর সঙ্গে ভালো করে পরিচয়টাই তো হলো না।

– তোমাদের নিশ্চয়ই কোনও কথা আছে, সেটা সারো।

– কী আর কথা? কথা তো ফোনেই হতে পারে। অনেক দূর থেকে এসেছে আপনার বাড়িতে। যদি কথা না বলেন, মানুষটা কী ভাববে বলুন তো! এত নামিদামি আপনি। এ রকম ব্যবহার কি আপনার শোভা পায়?

– আশ্চর্য তো! কী ব্যবহার করলাম? তুমি ওর সঙ্গে একা কাটাতে চাইছো বলে আমি চলে এলাম। আর এখন ব্যবহারের দোষ।

– আপনি আমাকে একটুও পছন্দ করেন না। অথচ...

– অথচ কী?

– অথচ আপনাকে এত ভালোবাসি।

জুলেখা আমার একটা হাত টেনে তার হাতে নেয়। জুলেখাকে মোটেও অকৃত্রিম মনে হয় না।

মুখোমুখি বসি দুজনের। আমার বাড়িতে মুসলমানের আসা-যাওয়া অবাধ নয়। কার মনে কী আছে, বলা যায় না। পুলিশ দুটো বসে আছে, আর অচেনা এক মুসলমান দিব্যি ঢুকে গেল। কী কাণ্ড, বাড়িতে কে আসবে না আসবে, সেটা নিয়ন্ত্রণ করারও কি অধিকার আমার হঠাৎ হারিয়ে গেল? অসহায় বোধ করি। জুলেখাকে কতটুকু চিনি যে লোক ডাকছে বাড়িতে?

– সোবহানের মতো মানুষ হয় না বুবু।

– কী করে বুঝলে? ওঁকে কবার দেখেছো তুমি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– দুবার। বলে সোবহানের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসলো সে। হাসিটা প্রশ্রয়ের নাকি সৌজন্যের হাসি, ভাবি।

সোবহান বললো, সুরঞ্জনের কাছে আপনার কথা শুনেছি।

– সুরঞ্জন আছে কেমন?

– বেশ আছে।

– কী করছে?

– যথারীতি টিউশনি। ভালোও বাসে এটা করতে। ওর স্টুডেন্টদের যা দেখলাম, খুব ফ্যান ওর। সেদিন ওর বাড়িতে দেখলাম, দুটো মেয়ে এসেছে পড়তে। সিক্সে বোধহয় পড়ে। ওদের সঙ্গে নিয়ে দাবা খেলছে।

– খুব মুডি বোধহয়? আমার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় না।...

– আপনার কথা সেদিন বলছিলো। পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্টুরেন্টে খাচ্ছিলাম, অনেকক্ষণ বললো আপনার কথা...

কী বললো?

– বললো আপনি খুব ভালো। খুব উদার। আপনার কাছে আসবে বললো।

সোবহানের মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝি সে বানিয়ে বলছে।

ক্লিন শেভড, ক্লিন ম্যান চা খেতে খেতে বললো,– আজকাল তো আবার ওর জলের নেশা হয়েছে। প্রায়ই বিকেলের দিকে লেকের ধারে যায়।

– জগিং করছে নাকি? আমি জিজ্ঞেস করি।

সোবহান বলে, জগিং করার অভ্যেস ওর নেই। অভ্যেস নতুন করে তৈরিও করবে না।

আমার মন লেকের ধারে। ওখানে কী করতে যায় সুরঞ্জন?

– আচ্ছা, ওর বাবা কী করে মারা গেছে? হঠাৎ প্রশ্ন করি।

দুজনের উদ্দেশ্যে প্রশ্নটা ছুড়ে দিই। সোবহান বললো,– শুনেছিলাম শংকর ঘোষ নামের একটা লোক, ওদের আত্মীয়, ওকে ধাক্কা দিয়ে লেকে ফেলে দেয়।

– কারণ কী?

প্রচুর নাকি দেনা হয়ে গিয়েছিল।

জুলেখা বললো– আমার মনে হয় কারণটা ভিন্ন। আসলে এই খবরটা ওরা খুব সিক্রেট রাখতে চায়। কিন্তু যতদূর জানি ওদের বাড়ির কাছের একটা লেকের জলে, সেদিন অমাবস্যা ছিল, আত্মহত্যা করেছেন। মায়াকে নিয়ে বোধহয় কিছু হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– কী হয়েছিল? আমি উত্তেজিত।

– সুরঞ্জন বলছিল, মনে হয় এ রকমই যে, মায়ার কারণে আমাদের সবাইকে ভুগতে হয়েছে অনেক। দেশ ছাড়তে হলো, নিজের বাবাকে হারাতে হলো।

জুলেখার এই স্মৃতিচারণা আমাকে গভীর মগ্নতা দেয়। আমি যে রকমভাবে সুধাময়ের মৃত্যুকে নিয়ে চিন্তিত, লক্ষ করি অন্য কেউ নয়। ওদের কাছে যে কোনও মৃত্যুসংবাদের মতো এটাও একটা মৃত্যু সংবাদ। সুধাময়কে ওরা তো কেউ চেনে না। তার স্বপ্নের খবরাখবর কেউ রাখেনি। তার কষ্টগুলো কেউ রোদে মেলে দিয়ে দেখেনি। নেপথলিনের ঘ্রাণে ডোবানো তার শৈশব-কৈশোরকে ছুঁয়ে দেখার যারা ছিল, তারা কেউ নেই।

সোবহান কি বিবাহিত? জুলেখা একটু ঘনিষ্ঠ হয়েই বসেছিল। প্রশ্ন শুনে ছিটকে সরে যাওয়ার মতো শরীর না হলেও মন হয়।

সোবহান মাথা নাড়ে, হ্যাঁ বিবাহিত।

বাচ্চা-কাচ্চা আছে?

হ্যাঁ, একটা মেয়ে।

বয়স কত?

তিন।

নাম কী?

মন।

মন? বাহ্। সুন্দর নাম তো!

পুরো নাম কী?

দিলরুবা পারভিন।

আপনার স্ত্রী কি কিছু করেন? চাকরি-বাকরি?

সোবহান ম্লান হেসে বলে, না।

কেন? বউদের ঘরে বসিয়ে রাখার পক্ষপাতী আপনি? লেখাপড়া করেনি?

করেছে। কিন্তু মনে হয় না ও বাইরে কাজ করতে চায়।

এ তো শুধু মনে হওয়া। কণ্ঠে আমার সামান্য শ্লেষ।

জুলেখা ভাবছে সুরঞ্জন তাকে লেলিয়ে দিয়েছে সোবহানের পেছনে। সুরঞ্জনের ওপর প্রতিশোধ তাকে আলো দিচ্ছে, সোবহানের প্রতি মুগ্ধতা তাকে পায়ের তলায় মাটি দিচ্ছে, সুতরাং আহ্লাদে পথ চলছে সে। আর এই বাঙালি সমাজে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ককে নরমাল বলে ভাবা হয়। জুলেখা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর সোবহান মুসলমান হলে কী, এই সমাজেরই তো মানুষ। নাহয় পুজোটা করে না, শাঁখা-সিঁদুর পরে না, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তো জন্ম এবং বেড়ে ওঠা, মানসিকতা তো এই সমাজই গড়ে দিয়েছে। সব পুরুষই, লক্ষ করেছি, কোনও মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে যখন, তখন তাকে প্রেমিকা বলে পরিচয় দিচ্ছে, কিন্তু তার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর তাকে আর প্রেমিকা বলে মনে করছে না। সে এখন স্ত্রী, অন্য কোনও মেয়ে হবে প্রেমিকা। যে প্রেমিকা সে-ই যে স্ত্রী হতে পারে এবং একই সঙ্গে সে-ই যে প্রেমিকা –এটা অনেক বন্ধুকে বোঝাতে গিয়েও দেখেছি ওরা ব্যাপারটা ধরতেই পারে না।

সোবহান একটা প্রশ্নও আমাকে করেনি। নিজে শুধু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। কিছু জানতে ইচ্ছে হয় না লোকটার? মানুষকে বিশ্বাস করে অনেক ঠকার পরও আমার স্বভাব সেই মানুষকেই বিশ্বাস করা। সোবহানকে দেখেই দশে দশ দিতে ইচ্ছে করে না আমার। আপাতত, বুঝি যে, সোবহান মহা আহ্লাদে আছে, বেশকিছু নারী-পুরুষ তাকে বেশ খাতির করছে। খাতির কার না ভালো লাগে? কিন্তু সুরঞ্জনের সঙ্গে এর বন্ধুত্ব কী করে হলো, তা আমার কাছে অজানা। যেটুকু দেখা হলো, বুঝলাম যে সোবহান নতুন বন্ধু হলেও সুরঞ্জনের বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ও কি আমাকে দেখাতে চাইছে যে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা মুসলমান, যেহেতু আমি বলেছিলাম, সে কট্টর হিন্দু হয়ে উঠছে? সুরঞ্জন আমার সঙ্গে খেলছে। নাকি ও নিজের সঙ্গে খেলছে?

ভোরবেলা উঠে সেদিন সোজা চলে যাই বেগবাগানে। তখন ছটা বাজে। দোকানপাট সব বন্ধ। আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কার করছে কজন, পাশে নোংরা ট্রাক। ফুটপাতে কালিঝুলিমাখা ন্যাংটো পাগল শুয়ে আছে। হেরোইন টানছে। এক হাতে নাক চেপে আরেক হাতে গাড়ি চালাই। জুলেখার কাছে পাওয়া ঠিকানা আমার। দরজায় কড়া নাড়ছি। ভেতর থেকে কর্কশ একটা পুরুষকণ্ঠ। কণ্ঠটি যে সুরঞ্জনের না খুলে দিলে বুঝতে পারতাম না। খালি না, লুঙ্গি পড়া। ভেতরে ভ্যাপসা গরম। মাথার ওপর একটা ফ্যান চলছে, একটা ক্যাম্প খাটে অল্পবয়সী একটা ছেলে ঘুমোচ্ছে। মশারি টাঙানো দু বিছানাতেই। সুরঞ্জন চোখ কচলে তাকালো। সামনে যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, যেন সে চিনতে পারছে না।

চল।

চল মানে? বিরক্তি সুরঞ্জনের কণ্ঠে।

প্যান্ট শার্ট পরে নাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন?

আগে বেরোও না। পরে বলছি।

সুরঞ্জন বেরোতে যে সময় নেয়, তার অর্ধেকের অর্ধেক সময় লাগতো আমার বেরোতে। সুরঞ্জনকে গাড়িতে উঠিয়ে, পাশে বসিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশ দিয়ে বিদ্যাসাগর সেতুর ওপর দিয়ে শহর ছাড়ি।

সুরঞ্জন বললো, কোথায় যাচ্ছেন?

গাড়িতে রমা মণ্ডলের গান ছেড়ে দিই। খালি গলায় গান। রমা মণ্ডলের নমি নমি চরণের সিডি থেকে অসাধারণ গানগুলো এক এক করে বাজতে থাকে। নমি চির মঙ্গল হে, নমি চির সম্বল হে...। রবীন্দ্রনাথের পূজার গানগুলোকে আমি কোনও দিন পুজার গান বলে মনে করতে পারিনি। সবই অন্তরে প্রেমের গান হিসেবে বরণ করেছি।

কোথায় যাচ্ছেন এর উত্তরে যেখানে দুচোখ যায় বলি।

কিন্তু আমি তো যেখানে দুচোখ যায়, যেতে চাই না।

কোথায় যেতে চাও? বলবে কোথাও না। ওই বেগবাগানের বাড়ির মধ্যে বসে থাকতে চাও, অথবা সন্ধ্যেবেলা মদ খেতে চাও কোথাও বসে, এই তো?

তাই যদি আমার ভালো লাগে!

ভালো লাগে না, তা বলছি না। আজ আমার ভালো লাগছে তোমাকে নিয়ে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যেতে।

পাগল হয়েছেন?

হেসে বলি, পাগল তো চিরকাল ছিলামই।

সুরঞ্জনের পরনে একটি ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি আর কালো প্যান্ট। পায়ে কালো চটি। গাড়ির ভেতর এসি চলছে। কোনও সুগন্ধি মেখেছে কি সে? মনে হয় না। হয়তো মুখ ধুয়েছে কোনও লাক্স সাবান দিয়ে, সেটির ঘ্রাণ বেরোচ্ছে।

কী বলবেন?

কিছু না।

সুরঞ্জন এবার হাসতে হাসতে বলে, এ রকম ছিনতাই করে নিয়ে আসছেন। মেয়েরাও এ রকম করে তাহলে, শুধু পুরুষই নয়।

হেসে বলি, ইকুয়ালিটির কথা কি শুধু শুধু বলি!

দুজনের হাসি পরিবেশকে রহস্যমুক্ত করে। হালকা করে। সুরঞ্জন শ্বাস নেয় নিশ্চিন্তে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্চর্য সুন্দর সকাল, আশ্চর্য সুন্দর গান। কতকাল ভোর দেখিনি। কতকাল গান শুনি না।

কেন? কী হয়েছে তোমার?

সুরঞ্জন ঠোঁট উল্টে বলে, জানি না।

'চিরসখা হে, ছেড়ো না মোরে' গানটা যখন বাজছে, আমাদের এক রকম স্তব্ধ করে রাখলো। এই গানটা কণিকাও গেয়েছেন। রমাও কম ভালো গাননি।

সুরঞ্জনকে উঠিয়ে নিয়ে আসার আমার অনেকগুলো কারণ। ও ঝিলের ধারে গিয়ে বসে থাকে, এই খবর আমাকে স্বস্তি দিচ্ছে না। ও কি সুধাময়ের মতো কিছু করতে চাইছে। যে ছেলে প্রেমে ডুবে আছে, প্রেমিকা নিয়ে চমৎকার সময় কাটাচ্ছে, যখন সামনে অফুরান স্বপ্ন, এমন সময় প্রেমিকাকে বিদেয় করে দিচ্ছে আশ্চর্য নির্লিপ্তি নিয়ে, সে হয় মাথার অসুখে ভুগছে, ভীষণ ডিপ্রেশনে, যে কোনও মুহূর্তে আত্মহত্যা করে ফেলতে পারে। কোনও ভরসা নেই। ঝিলের পাড়ে বসে থাকা খুব ভালো লক্ষণ নয়। আমার কোনও উদ্দেশ্যই নেই জুলেখার সঙ্গে তার সম্পর্ক চালিয়ে যেতে বলা। চালিয়ে গেলেই যে তার ডিপ্রেশন চলে যাবে তা আমি মনে করি না। আমার উদ্দেশ্য ওর একঘেয়ে জীবন থেকে একটু ছুটি দেওয়া। দূরে কোথাও, দূরে দূরে কে না যেতে চায়? ডিপ্রেশন কাটিয়ে ওঠো বললেই কেউ কাটাতে পারে না। স্যাঁতসেঁতে জীবনটায় একটু রোদ্দুর চাই। একটু যা ইচ্ছে তাই চাই। কেউ কেয়ার করে, কেউ ভালোবাসে চাপও, চাই। কোনও সম্পর্ক কি আছে, মুক্তির সম্পর্ক, এমন কিছু আজ দিতে চাইছি সুরঞ্জনকে। আকাশ দিতে চাইছি। যেদিকে দুচোখ চাইছি দিতে। সব ভুলে সব ফেলে হারিয়ে যাওয়া চাইছি দিতে। আমার আচরণে আমার ইচ্ছের কতটুকু কী প্রকাশ পায় আদৌ পায় কিনা কে জানে।

আটটার দিকে একটা চায়ের দোকানের কাছে থামিয়ে চা খাই দুজন। সামনে বিস্তৃত সবুজ ক্ষেত। প্রচুর তালগাছ এ দিকটায়। নারিকেল গাছ তো আছেই। গ্রাম চিরকালই আমাকে টানে। যখনই ঘন সবুজ আর নির্জনতার কাছে আসি, ভাবি প্রায়ই আসবো, প্রায়ই আর আসা হয় না। হয় না হয় না, কত হয় না নিয়ে বাঁচতে হয়? হওয়ালে এভাবেই হওয়াতে হয়। সাত সকালে তুড়ি। চল। যাই। যেদিকে দুচোখ যায়। যেদিকে দুচোখ যায় আমার ছোটবেলা থেকেই আমার রক্তে। কলেজ থেকে ফিরে ইয়াসমিনকে রিকশায় তুলে বেরিয়ে পড়তাম। রিকশাঅলা জিজ্ঞেস করতো, কোথায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবেন? বলতাম, যান। বলতো, যাবো কোথায়? যেদিকে আপনার ইচ্ছে সেদিকে চলুন। রিকশাঅলা অবাক, বলে, মানে? তখন খোলাসা করে বলতাম, যেদিকে দুচোখ যায়, যান। তখন সে পায়ে প্যাডেল মারতো। এই জিনিসটা রিকশঅলারাও পছন্দ করতো। নিজের পছন্দমতো জায়গা দিয়ে চলা ওদের মনে ফুর্তি জাগাতো।

বিদায় দাও খেলার সাথি, গেল যে খেলার বেলা ... গানটা যখন বাজে, তখন সামনে অনন্ত পথ আর ঘিরে ধরা দুধারের সবুজ। কেউ কোনও কথা বলি না অনেকক্ষণ। এক সময় বলি সুরঞ্জনকে, কথা বলো।

কী কথা?

যা ভালো লাগে তাই। যা ইচ্ছে করে।

সুরঞ্জন বলে না কিছু।

কী ইচ্ছে করে? রাজনীতি নিয়ে বলবে?

সুরঞ্জন হা হা করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে, না।

অর্থনীতি?

না।

মেজরিটি মাইনরিটি রিলেশন?

না।

হিন্দু-মুসলমান? একটুও না?

সজোরে মাথা নাড়ে সুরঞ্জন।

তোমার বাবা-মা-বোন, বোনের বাচ্চাগুলো?

না।

বন্ধুবান্ধব?

না।

জুলেখা।

মাথা নাড়ে সুরঞ্জন। না।

নিউ ফ্রেন্ড সোবহান?

সুরঞ্জন চোখ ছোট করে হাসে। বলে, না।

বেগবাগান? বেলঘরিয়া? টিউশনি? স্টুডেন্টস?

না।

বাংলাদেশ?

না।

ওরে বাবা। তাহলে তো কিছুই বলবে না তুমি সুরঞ্জন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবকিছুতে ওর অনীহা বলে কথা বলবে না। আমাকে বলতে হয় সিট বেল্টের কথা। সিট বেল্ট সে বাঁধতে না চাইলেও বাঁধতে বাধ্য করি। আমাকেও সে বাধ্য করে আধ ঘন্টা পর পর গাড়ি থামাতে। তার সিগারেটের তৃষ্ণা। গাড়ির ভেতর খাওয়া নিষেধ। সুতরাং গাড়ি থামাও।

পাঞ্জাবি ঢাবায় সকালের নাস্তা হয়। বর্ধমানের কাছে গিয়ে দুপুরের খাবার। না, ওসব নিয়ে আমরা কিছু কথা বলি না। সবই যা দেখছি চোখের সামনে, যা খাচ্ছি, যা শুনছি, তা নিয়ে। অতীত নেই। ভবিষ্যৎ নেই। আমাদের তখন শুধু বর্তমান। আমরা দুটি মানুষ জন্ম নিয়েছি সকাল ছটায়। তার পর থেকে জীবন কাটাচ্ছি। কেবল কি সুরঞ্জনের জন্য, এই বেরিয়ে পড়াটি আমার জন্য দরকার ছিল না কি! ছিল।

খামোখা পথ ভুল করে আবার পথ চিনে চিনে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসি। কোপাই-এর ধার ধরে হাঁটি দুজন। অনেকক্ষণ। কোনও গাছের এলিয়ে পড়া, নদীর ভেঙে পড়া দেখলে দাঁড়াই। রাঙামাটির পথে হাঁটা পাশাপাশি। গাইতে গাইতে গান। গানগুলো ছিল ভেতরে। স্রোতের মতো বেরিয়ে আসে যেন। সাঁওতাল এলাকায় হেঁটে বেড়াই। মাটির বাড়িগুলোর ভেতরে ঢুকে ওদের জীবন যাপন দেখি। সুরঞ্জন কোনও দিন সাঁওতাল পল্লিতে আসেনি। অবাক হয়ে দেখে সব। সোনাঝুরি বনে হাঁটতে থাকি আর বলতে থাকি সাধারণ কথা। অনেকক্ষণ হয়তো হাঁটছি বা বসে আছি, বা শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখছি, কথা বলছি না। নৈঃশব্দ্যও যে আশ্চর্য সুন্দর হতে পারে। শুধু পাখির আওয়াজ শুনি দুজন বসে বসে। ধীরে ধীরে, একটু একটু করে, অন্ধকার যেমন পড়ে আমাদের ওপর, একই সঙ্গে আলো পড়তে থাকে। এ কী! আকাশ আমাদের দিকে বড়, মায়ার তাকিয়ে থাকে। যেন গোটা আকাশটা জুড়েই চাঁদ, এমন চাঁদ। আজ যে পূর্ণিমা, কে জানতো? সোনাঝুরি বনে সাঁওতাল রমণীরা আগুন জ্বেলে হাড়িয়া খেয়ে নাচছে। ওদের কাছ থেকে চেয়ে হাড়িয়া নিয়ে খেল সুরঞ্জন। ওদের সঙ্গে নাচলোও। হাড়িয়া খাওয়া সুরঞ্জন আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে আগুনের সামনে দাঁড় করিয়ে বললো, তুমিও নাচো।

এ সুরঞ্জন নয়, এ হাড়িয়া। সুরঞ্জন আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করে না।

কী ব্যাপার, তুমি আমাকে তুমি বলছো কেন?

পাশে দাঁড়িয়ে রমণীদের তালে তালে নাচতে নাচতে বললো, তুমি আমাকে তুমি বলো কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোধ নিচ্ছ?

হ্যাঁ, শোধ নিচ্ছি।

সুরঞ্জন হা হা করে জোরে প্রাণ ফাটিয়ে হাসতে থাকে। এও কি হাড়িয়া? সুরঞ্জন নয়? আমার বিশ্বাস হতে থাকে এ প্রাণ খুলে হাসছে ছেলেটি সুরঞ্জন।

আমার খুব ভালো লাগতে থাকে। সোনাঝুরি বনটা পূর্ণিমায় দিনের মতো দেখতে লাগে। চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় এ জগৎটাতে বুঝি নেই আমি। যেন অন্য কোনও অপরূপ দেশে কারও ডানায় করে উড়ে এসেছি। সুরঞ্জন একটা সাঁওতাল মেয়ের সঙ্গে এলিয়ে পড়েছে। সে কি চুমু খেতে চাইছে কাউকে? থাক, আজকের এই অসাধারণ চাঁদের আলোয় যা ইচ্ছে তাই করা যায়। রাত একটার দিকে ফাঁক হয়ে আসে সব। বাড়ি ফিরে যায় ওরা। আমি আর সুরঞ্জন চাঁদের আলোয় শুয়ে থাকি সাদা বালিতে। চারদিকে গলে পড়তে থাকা চাঁদ আর হু হু হাওয়া। কেউ আমরা ঘরে ফেরার কথা উচ্চারণ করি না। যেন এ জীবনের বাইরে আমাদের আর কোনও জীবন নেই। চোখ যখন মেলি, ভোর হবে হবে করছে। তখনই গাড়িতে স্টার্ট দিই। সোনাঝুরি বনের পাশ দিয়ে রাঙামাটির পথ ধরে কলকাতার দিকে। পথে সূর্যোদয় পড়লো। সবুজের ওপর রক্ত চুয়ে চুয়ে পড়লো, সাক্ষী হয়ে রইলাম। পথে সুরঞ্জন একবারও জিজ্ঞেস করে না, কেন তাকে নিয়ে এসেছিলাম। কোনও জরুরি কথা ছিল কিনা।

চল চা খেতে থামি।

ওদিকটা কী সুন্দর সবুজ। চল দাঁড়াই।

এ রকম আমরা কলকাতার বাইরে পলুশানের বাইরে ঘিঞ্জি গলির স্যাঁতসেঁতে জীবনের বাইরে, একটানা যাপন করা একঘেয়ে জীবন থেকে বাইরে বেরিয়ে একটু শ্বাস নিয়ে আসি। এর মানে এই নয়, আমাদের জীবন পুরোপুরি পাল্টে গেল। আমাদের জীবনে সামান্য একটু হাওয়া বইলো। সুরঞ্জনকে সুখ দিয়ে, এই হাওয়া দিয়ে আমার কী লাভ, যে কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে। নিজেকেও শুধোতে পারি, কেন?

এই কেনর উত্তর খুব জটিল কি? সুরঞ্জনকে আমার খুব আপন মনে হয়। আপন কেন মনে হবে? সুরঞ্জন তো আমার সৃষ্ট কোনও চরিত্র নয়। ওর একটা অস্তিত্ব আছে। আমি তাকে তার চলাফেরা, তার কথা, তার চিন্তা– কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। তার পরও মনে হয় তার ওপর আমার অধিকার আছে। উপন্যাস লেখার কারণে সেটা হয়তো জন্মেছে। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরঞ্জনের প্রতি আমার যে ভালোবাসা, যে পক্ষপাত, তাকে অন্তর দিয়ে বোঝার যে চেষ্টা সেটাকে একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না।

কলকাতায় ঢোকা মানে একশহর দূষণের মধ্যে, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, আর অশ্লীল ট্রাফিকের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেলাম, যেখানে হাওয়া ঢোকার কোনও জায়গা নেই। বেগবাগানে সুরঞ্জনকে নামিয়ে দিয়ে বলি, অ্যাই শোনো, একদিন বালিগঞ্জ লেকের পাড়ে যাবো তুমি আর আমি। ঠিক আছে?

– হঠাৎ লেক?

– হ্যাঁ, লেক। ওখানে সাঁতার কাটা যায় না? সাঁতার কাটবো।

– সাঁতার?

– হ্যাঁ, সাঁতার।

সুরঞ্জন মাথা নাড়ে। হ্যাঁ বা না, কিছু হবে একটা। আমি আর জানতে চাই না। গাড়ি ঘুরিয়ে নিই।

জীবন কী সুন্দর! চল বেঁচে থাকি। ঝিলের ধারে যাও কেন? মরতে? এসব বলে কোনও সমস্যার সমাধান হয় না। আমার মাঝে মাঝে মরতে ইচ্ছে করতো। জীবন আমার কাছে একটা ফালতু জিনিস হয়ে উঠেছিল। আত্মহত্যারও ইচ্ছে হতো আমার। তখন কে যেন, খুব আপন কেউ যে তার নয়, কাঁধে হাত রাখলো ভালোবাসা, স্নেহে। ওই কাঁধে হাত রাখাটা আমাকে বড় বিহ্বল করে তুলেছিল। জীবন যে কত সুন্দর! ওই স্পর্শটুকু না পেলে হয়তো বোঝা হতো না আমার।

এরপর কয়েক দিন সুরঞ্জনের সঙ্গে আমার কথাও হয় না। দেখাও হয় না। সুরঞ্জন এখন আর মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে না। যেটা ছিল, সেটা সে একবার শুনি মায়াকে দিয়ে দিয়েছে, আরেকবার শুনি কিরণময়ীকে দিয়েছে। এত ধোঁয়া আমি সরাতে পারি না। একটা চরিত্রে এত অপরিচ্ছন্নতা থাকলে কী করে চলে?

একদিন জুলেখার কাছে সুরঞ্জনের খোঁজ নিতে গিয়ে শুনি সে নাকি বাংলাদেশে গেছে। বাসে। কার নাকি দুটো কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে। হাসপাতালে আছে। খবর পেয়েছে কী করে তা জুলেখা জানে না।

কে? কী নাম? আমার কণ্ঠ কাঁপছে।

জুলেখার সঙ্গে কোনও কথা হয়নি। সে শুনেছে সোবহানের কাছ থেকে।

বন্ধুটি কে? পুলক?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না।

কাজল?

না। এ রকম নাম না।

রত্না?

উহু।

কে? অঞ্জন? সুভাষ?

জুলেখা ওপাশ থেকে বলে, আমি সোবহানের কাছ থেকে জেনে তোমাকে জানাচ্ছি।

দশ মিনিট পর সে ফোন করে।

ওর বন্ধুর নাম হায়দার।

হায়দার?

জুলেখার শান্ত কণ্ঠস্বর। হ্যাঁ, হায়দার।

ফোন রেখে দেওয়ার পর আমি অনেকক্ষণ যেখানে বসে ছিলাম, বারান্দায়, বসেই থাকি। সামনে বিশাল একটা আকাশ ছাড়া আর কিছু থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোবহান ঠিক বোঝে তাকে লেলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে সুরঞ্জন। কিন্তু লেলিয়ে কি সত্যিই কাউকে দেওয়া যায়? সুরঞ্জনকে সোবহান বোঝে, আবার বোঝেও না। এই চরিত্রকে যত সে বুঝতে চায়, তত দুর্বোধ্য রয়ে যায়। আর যত দুর্বোধ্য, তত তার আকর্ষণ বাড়ে। সুরঞ্জনের বাড়ি গেলে এ রকম হয় তার, ফিরতে ইচ্ছে করে না। কোথায় ফিরবে সে! বাবা-মা বিয়ে করিয়েছে আপন ফুপাতো বোনের সঙ্গে। নায়লা তার থেকে কুড়ি বছরের ছোট। ছোট হলেই যে বন্ধু হওয়া যায় না, প্রেম করা যায় না, তা নয়। কিন্তু নায়লার সঙ্গে তার ক্লিক করে না। দুজন দু'জগতের মানুষ। দু'জগতের মানুষ হলেই সোবহান মনে করে না আলোচনার কিছু থাকে না। এক জগতে খাবি না খেয়ে বরং দুই জগতের অভিজ্ঞতা ভাগ করা যায়। কিন্তু নায়লার সঙ্গে সে দেখেছে খুব মামুলি কিছু কথা ছাড়া তার আর কথা হয় না। এতে যে নায়লা ক্ষুব্ধ তাও নয়। স্বামী-সন্তান, শ্বশুর-শাশুড়ির সেবাকে সে পরম ধর্ম হিসেবে নিয়েছে। সোবহান কয়েক দিন বলেছে, চল সিনেমা দেখতে যাই, রেস্টুরেন্টে যাই। এসবে তার আগ্রহ নেই। ওসব নাকি পুরুষ মানুষের ব্যাপার। আর বাইরে গেলে সে বোরখা পরে বেরোতে চায়। বোরখা পরা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সোবহান চলবে না। বোরখা জিনিসটা তার কাছে বড় বিরক্তিকর ব্যাপার বলে মনে হয়। বাড়িতে যতক্ষণ কাটায় সোবহান, কিছু তার করার থাকে না। নায়লা বাচ্চা নিয়ে ব্যস্ত। তার দুদণ্ড সময় নেই। আর সময় যদি সোবহানের জন্য থাকতো, সেই সময় নিয়েই বা কী করতো সে। শাড়ি-কাপড়-প্রসাধন নায়লার নেশা। সোবহান বলে এত যে শাড়ি কেনো, গয়না পরো, মেকআপ করো, তুমি তো সব বোরখায় ঢেকে রাখো। কী লাভ।

নায়লা বলে, আমি কি আর লোককে দেখানোর জন্য করি?

তবে?

তুমি দেখলেই তো হলো।

AMARBOI.COM

সোবহান আর দেখে কত! দেখেই বা কী লাভ? একটা মেয়ে প্রচুর জিনিসপত্র দিয়ে সেজেছে, তা দেখে কী হয় কার? বাচ্চাকে একটু গাল টিপে আদর, নায়লার সঙ্গে খুব যদি মধুর কিছু ঘটে, সে খুনসুটি। বাইরে কী ঘটলো, না ঘটলো তা নিয়ে তার উৎসাহ নেই যে সে বলবে। অগত্যা কম্পিউটার, বাড়ি ফিরেও কম্পিউটার। এ কারণে সুরঞ্জনরা যখন ডাকে, সে ছুটে যায়। তার বন্ধু বিশেষ নেই। না থাকায় আফসোস নেই। সোবহানের বিশ্বাস, একশোটা খারাপ বন্ধুর চেয়ে একটা ভালো বন্ধু থাকাই ভালো। সুরঞ্জনকে সে ভীষণ ভালো বন্ধু হিসেবে বিশ্বাস করে।

সোবহান বরাবরই অতি ভালো ছেলে সংসারের। ছোটবেলা থেকে একটাই নেশা ছিল, বইয়ের নেশা। চোখে চশমা পরা ফার্স্ট বেঞ্চের গুডবয় ছেলে সে। কোনও মেয়ের দিকে তাকায়নি। প্রেমে পড়ায় সুযোগ-সময় কোনওটাই হয়নি। খড়গপুর আইআইটি থেকে পাস করেছে। বাড়ি বাইরের লোকেরা তাকে চেনে শোভন বলে। শোভন, ওরফে গোবরে পদ্মফুল। সোবহানের ঠাকুরদা এসেছিল মেদেনীপুর থেকে। হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছিল বলে মেদেনীপুরে আর থাকতে পারেনি। বেলঘরিয়ার ফতুল্লাপুরে এসে বাসা বেঁধেছিল। কাপড়ের দোকান চালাতো ঠাকুরদা, বাবা। সোবহানই লেখাপড়া করেছে, বাকিরা সব বোন, সতেরো-আঠারো বছর বয়স হলেই টুপটুপ করে যার-তার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে ওদের সবার। এখন বাবা-মার সঙ্গে সোবহানই থাকে। সল্ট লেকের কম্পিউটার কোম্পানির চাকরিতে মোটা অংকের মাইনে পায়। ফিডার রোডে একটা ফ্ল্যাট কিনেছে, ফ্ল্যাটের তলায় কম্পিউটারের দোকান দিয়েছে। সল্ট লেকে নিজের একটা কোম্পানি চালু করার কাজ এগোচ্ছে।

সোবহান বিয়ে করেছে না বলে বরং বলা যায় বিয়ে তাকে দেওয়া হয়েছে। নায়লাকে মেদেনীপুর গ্রাম থেকে কদিন বাড়িতে রাখা হল, এরপর ধুমধাম না করেই বলা যায় ধুম করে বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হল। 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'র মতো কবুল বলেছিল সোবহান। নায়লাকে এর আগে তিনবার দেখেছে সে। বেড়াতে এসেছিল তাদের বাড়িতে। বাবা-মা তলে তলে তার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য ওকে ঠিক করে রেখেছিল, তা বিয়ের পনেরোদিন আগে জেনেছিলো সে। মেয়েকেও অনেকটা জোর করে ধরে বেঁধে বিয়ে দেওয়া। মেয়েও, সে শুনেছে, হাত পা ছুড়ে কেঁদেছে, কী করে নিজের ভাইয়াকে বিয়ে করবো। শরমে সে নাকি চোখ খুলতে পারেনি। সোবহান নিজের কাজ নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত। বাবা-মার ইচ্ছের বিরুদ্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়নি। বিয়ে যখন জীবনে করতেই হবে, বয়স যখন হয়েছেই, তখন করে নেওয়াই সম্ভবত ভালো। এভাবেই একদিন সোবহানের মতো ওয়ার্কোহলিকের সঙ্গে নায়লা খাতুনের বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ে হয়, এক বিছানায় রাত কাটানো হয়, পাশে একটি তাজা শরীরের ঘ্রাণ পাওয়া হয়, শরীর শরীরের দিকে হাত বাড়ায়। সন্তানের জন্ম হয় কোনও একদিন।

ঘরের সোবহান, বাইরের শোভন, শোভনদা, শোভন বাবুকে লেলিয়ে দেওয়া হলেও সে জুলেখার সঙ্গে জড়াবে না। জুলেখার জন্য সোবহানের সহানুভূতি কাজ করে। যতটুকু দেখেছে-শুনেছে সে তাকে, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর একটা মেয়েই বলে মনে হয়েছে। সোবহান খুব ভালো করে টের পায় জুলেখা আসলে ভালোবাসে সুরঞ্জনকে। সে চায় ওকেই। চাওয়াটা তীব্র বলে আঘাত সইতে পারে না। অভিমানটা তীব্র হয়, ওর অভিমানের দিকে সুরঞ্জন এখন আর ফিরে তাকায় না। একটা পাথর ছেলে, আবার গলে নদী হওয়ারও ছেলে। সকাল সকাল বাড়ি ফিরে যাওয়ার চেয়ে আজকাল সোবহান বন্ধুর সঙ্গে সময় পার করতে চায়। তার একঘেয়ে জীবন থেকে অনেকটাই মুক্তি সে পায়। মুক্তির ধারণাটাও তার নতুন। একটানা একঘেয়েমির কাজ যে সে করে, আগে বুঝতোও না। জীবন সম্পর্ক অদ্ভুত সব ধারণা সুরঞ্জনের, একঘেয়েমি তারও আছে। সোবহানও তার জন্য বড় এক মুক্তি। বাইরের জগতের সবকিছু নিয়ে সোবহানের প্রচণ্ড আগ্রহ আর সুরঞ্জন সব কিছু সম্পর্কে অসম্ভব নিস্পৃহ। সোবহান একটু একটু বাইরে ফুটছে, আর সুরঞ্জন দিন দিন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। দুজনের বন্ধুত্ব হওয়ার কোনও কথা নয়, কিন্তু হয়। সম্ভবত দুজন দুজনের অতীতকে চোখের সামনে দেখতে পায় বলে। এতে একধরনের নিরাপত্তা বোধ করে দুজনই ! যেন নিজের কাছেই নিজে রইলো। অচেনা কোথাও নয়।

সেদিন জুলেখা যখন ডেকেছিল তসলিমার বাড়িতে যাওয়ার জন্য, সোবহান প্রথম দ্বিধায় লজ্জায় ভয়ে আসতে চায়নি। মুসলমান নামের ছেলেদের তসলিমা কী চোখে দেখেন, তা সে জানে না। আর তা ছাড়া, লেখক-লেখিকার সামনে গিয়ে কথা বলার অভ্যেস তার কোনও দিন নেই। কিন্তু জুলেখা সেই ভয় তার ভেঙে দিয়েছে। তসলিমাকে দেখে তার উগ্রবাদী কিছু মনে হয়নি। সাধারণ মানুষের মতো, চা খাওয়ালো, কথা বললো। অত্যন্ত সংবেদনশীল বলেই মনে হলো, বিশেষ করে যখন সুরঞ্জনের খোঁজ নিচ্ছিল। সোবহানের মনে হয়, সুরঞ্জন ঠিক জানে না তসলিমা কী ভীষণ কেয়ার করে তাকে। আর কেয়ার করলেই উল্লুকগুলো ভাবে বুঝি প্রেম করতে চায়। সুরঞ্জন মানুষকে ভুল বুঝতে ওস্তাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলে বা মেয়ে যারা খুব স্ট্রাগল করে বড় হয়, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য, আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচার জন্য যারা বদ্ধপরিকর, সেই মতো যা কিছু করার প্রয়োজন করে, তাদের জন্য শ্রদ্ধা জাগে সোবহানের। চোখের সামনে আজেবাজে লোকদের সঙ্গে নিজের বোনগুলোর বিয়ে হয়ে গেল, বাধা দিতে পারেনি। কোনও বোনের হয়তো মেয়ে জন্মেছে, স্বামী দোষ দিচ্ছে তাকে, দ্বিতীয় বিয়ে করবে বলে হুমকি দিচ্ছে। কেউ বলছে যৌতুকের টাকা নিয়ে আয়, তোর ভাইজান তো এখন বিরাট বড়লোক। আবার আরেকজন তো প্রতি রাতে স্বামীর মার খায়। সবগুলো বোনই পরনির্ভর। মাঝে মাঝে সোবহান বলে ওরা সব চলে আসুক এখানে। কিন্তু স্বামীকে ছেড়ে আসুক কেউ, তা তাদের বাবা-মাই চায় না। বরং মুখ বুজে সহ্য করাই নাকি মেয়েদের উচিত। মায়াকে যখন দেখে সোবহান, মনে হয় তার বোনও ইচ্ছে করলে পারতো মায়ার মতো হতে। মায়া চলে এসেছে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে, চলে আসা তো নিষ্ঠুরতা নয়, মায়া নিষ্ঠুর নয়। যখন সোবহান যায় সুরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে, মায়া এমন কোনও রাত নেই, যে বলে না, শোভনদা, খেয়ে যাবেন কিন্তু। সোবহান বলেছে, এতকাল জানতাম বাঙালরা খেয়ে আর খাইয়ে আনন্দ পায়, খাওয়া আর খাওয়ানোর গল্পই শুনেছি। এখন নিজের চোখে দেখা হচ্ছে। নিজেই ভিকটিম আমি।

ভিকটিম? চোখ কপালে তোলে মায়া।

সোবহান হাত জোড় করে বলে, ক্ষমা করবেন। বলতে চাইছিলাম, লাকি।

তা বলুন। মায়া হেসে ওঠে।

বেশ কিছুদিন খেয়েছে সে মায়ার হাতের রান্না। মায়া এখনও জানে না তার শোভনদা হিন্দু নয়। একবার তো বিপদ হয়েছিল। মায়া বলছে, আপনাকে সামনের রোববার মাংস খাওয়াবো, কী মাংস খেতে পছন্দ করেন, শোভনদা? সোবহান বললো, সবই করি, চিকেন, মাটন, বিফ...

– বিফ? ছিটকে সরে এলো মায়া।

সঙ্গে সঙ্গে সুরঞ্জন বললো, আজকাল সবাই দেখো গিয়ে বিফ খায়। তোর মতো কটা ধর্মান্ধ বসে আছে বিফ খাবে না বলে? আমি খাই না? বাবা খেত না? দেশে থাকার সময় তুই তো খেতি। বাড়িতে রান্না হতো। মা খেতো না হয়তো, আমরা তো সবাই খেতাম। মায়া দম নিয়ে স্বীকার করে। হ্যাঁ, হতেই পারে এ রকম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোবহান জানে যে শোভন নামে পরিচিত হয়ে অনেক জায়গায় অনেক সুবিধে হয়। শোভন। শোভনদা। শোভন বাবু। তাই বলে সুরঞ্জনের মতো ভালো বন্ধুর বাড়িতে তাকে একটা হিন্দু পরিচয়ে ঢুকতে হবে, তা সে মানতে চায় না। সুরঞ্জনকে আসল পরিচয় উন্মোচনের কথা বললে বলে, তাহলে এ বাড়িতে তোমার আর আসা হবে না। দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধ করবে মায়া। মায়া মুসলমানদের সহ্য করতে পারে না।

মুসলমানকে হিন্দু বলে বা হিন্দুকে মুসলমান বলে পরিচয় করানো–এ সুরঞ্জন যেমন পছন্দ করে না, সোবহানও করে না। তাদের বাইরে দেখা হতে পারে, আড্ডা হতে পারে। কিন্তু বসলে কোনও বারে-রেস্তোরাঁয় বসতে হয়। ওসব জায়গায় বসলে বিল মেটানোর ক্ষমতা সুরঞ্জনের নেই। সোবহানের কাছ থেকে পাঁচ-ছদিন খেতে পারে সে, প্রতিদিন খাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। নীতি নামক জীর্ণ যে জিনিসটি এখনও তার অবশিষ্ট আছে, সেটিতে ভীষণ আঁচড় পড়ে।

আগে সোবহানকে সুরঞ্জন ডেকে আনতো, এখন সে নিজেই চলে আসে। এমনকি বলছে ফিডার রোডের কম্পিউটারের দোকানটা সে পার্ক সার্কাসে নিয়ে চলে আসবে। এতে তাল দিয়ে যাচ্ছে সুরঞ্জন।

সুরঞ্জনের সঙ্গে দেখা তো হবেই সোবহানের। কিন্তু মায়ার সঙ্গে সোবহানের দেখা হয়, ঘরে তো দেখা হয়ই, বাইরেও দেখা হয়। একবার সল্ট লেকে অফিসের কাজে গিয়েছিল মায়া। ওখান থেকেই ফোন করে সোবহানকে।

– শোভনদা, আমি তো সল্ট লেকে। তোমার অফিস কোথায়?

– কোথায় আছো তুমি, বলো তো!

মায়া বললো, রিতা স্কিন ফাউন্ডেশনে সামনে। ডাক্তার সুব্রত মালাকারের ক্লিনিক।

– ঠিক আছে। ওখানেই থাকো। আমি দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসছি।

ঠিক ঠিক আসে মায়ার প্রিয় শোভনদা, গাড়িতে তুলে তাকে নিয়ে যায় সিটি সেন্টার। সিটি সেন্টারের নাম শুনেছিল মায়া, কোনও দিন আসেনি। বাচ্চা মেয়ের মতো উচ্ছ্বাস তার। জিনিস কেনার বায়না নেই তার, কোথাও বসে কথা বলা শুধু। হ্যাঙ্গ আউট নামের একটা রেস্তোরাঁয় দুজন বসে খাবার খায়, অনেকক্ষণ গল্প করে। সোবহানের অফিসে কাজ ছিল, ফোন করে বলে দেয় তার দেরি হবে ফিরতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ার জীবনের যেটুকু সে শোনে, তাতেই কষ্ট পায়। অনেকটা তার বোনদের জীবনের মতো। মায়াকে স্বামী রাতে রাতে মারতো, মদ খেয়ে পড়ে থাকতো রাস্তায়। অন্য মেয়ের সঙ্গে বাড়ির বাইরে থাকতো। এসবের খুঁটিনাটি সে বসে বসে শোনে। এই যে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে মায়া চলে এসেছে, স্বামী নামক পদার্থটি কোনও দিন খোঁজও নেয় না। ওকে জানিয়ে দিয়েছে সে, জীবনে আর ফিরবে না।

– বাচ্চা দুটোকে ও বাড়িতে দিয়ে দাও।

– সে আমি পারবো না। মায়া বলে, ওরা ওদের মেরে ফেলবে। কেউ যদি দেখার থাকতো, দিয়েই হয়তো দিতাম।

– তুমি ওকে ডিভোর্স করছো না কেন? কেন তুমি শাঁখা-সিঁদুর পরে থাকো মায়া?

মায়া এর কোনও উত্তর দেয় না।

– এত স্ট্রং তুমি। কোনও অবিচার সইছো না। আর শাঁখা-সিঁদুরের কাছে এসে হেরে যাও। ওই স্বামী থাকার কী অর্থ তোমার জীবনে! আমার বোনগুলো তোমার চেয়ে আরও ভীরু। আমি তো ওদের বলি ফোর নাইনটি এইট করতে। করবে না।

মায়ার চোখে জল উপচে উঠছে। সোবহান খুব অপ্রতিভ বোধ করে। তার হয়তো অনেক কিছু বলা উচিত হয়নি। কী বলতে হয়, কী হয় না সে জানে না। সোবহান ক্ষমা চাইতে থাকে নিজে যদি সে কোনও দোষ করে থাকে।

এত নরম কণ্ঠে কথা বলতে, এত হৃদয় থেকে কথা বলতে কাউকে সে দেখেনি। মায়া, ওপরে ওপরে, জানে সে, একটা তেজি রাগী অসন্তুষ্ট মেয়ে হয়ে থাকে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে রাতে রাতে সে বালিশে মুখ গুঁজে তার মার জন্য, তার দাদার জন্য, তার অভাগা সন্তানদের জন্য কাঁদে। নিজের জন্য অনেক কেঁদেছে, এখন আর কাঁদে না।

সোবহান অনেক কিছু জানতে চায় মায়ার কাছে। কী করে যাও তোমার অফিসে? কী কাজ করো ওখানে? এমন প্রশ্ন তার দাদা সুরঞ্জনও কোনও দিন তাকে করেনি।

– বন্ডেলগেট-এ র‍্যানবেক্সি। বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে অটো করে কুষ্টিয়ায় নেমে রিকশা করে চলে যাই। কাজ অ্যাসিসটেন্ট ডিপো ম্যানেজারের। গোডাউন সামলানো কাজ। কী মাল আসছে, কী যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মার্কেটিংটাও দেখতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– বাহ্! অনেক কাজ। খুব কঠিন, তাই না?

মায়া হেসে বলে, একটুও কঠিন না। আমার খুব কঠিন কাজ করতে ইচ্ছে হয়।

– কখনও কান্না পায়? এই যে একা এত সামলাতে হচ্ছে। কখনও খুব ভয় হয় হয়তো পারবে না? হয়তো পিছলে যাবে? নিজে একা থাকলে তো মিটে যেত। দুটো বাচ্চার দায়িত্ব তো নিজেকেই নিতে হবে। কান্না পায় মাঝে মাঝে? যখন তোমার নিজের জীবনটা এনজয় করার কথা, ঘুরে বেড়ানো, আনন্দ-সুখ করার কথা, তখন টাকা কামানো, দায়িত্ব আর দায়িত্ব বয়ে বেড়ানো। মনে হয় না দুচ্ছাই?

মায়া মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে সোবহানের দিকে, ভাবে এভাবে কেউ তার কাছে জানতে চায়নি। সোবহানকে খুব আপন বলে মনে হয় মায়ার।

খেতে খেতে সোবহান জিজ্ঞেস করে, পুজোয় এবার কী করবে?

কী আর! ছেলেমেয়েদের জামা-জুতো কিনে দেব।

আর তোমার নিজের জন্য?

আমার জন্য?

হ্যাঁ, তোমার জন্য?

মায়া হেসে বলে, আমার জন্য কিছু না।

কিছু না কেন? নিজের জন্য কিছু করো মায়া।

সোবহানের কথায় এত মায়া ছিল যে মায়ার চোখে আবার জল আসে। জল মুছতে মুছতে বলে, নিজের কথা ভাবতে ভুলে গেছি শোভনদা।

সোবহান বলে, বাচ্চাদের দিদিমার কাছে রেখে চলো সমুদ্রে যাই। মন্দারমনি চমৎকার জায়গা। ওখানে দেখবে চোখের সামনে আকাশ এসে ডুবে গেছে সমুদ্রে। কাছেই তো। গাড়ি করে চলে যাবো। মাত্র তিন-চার ঘণ্টায় পৌঁছে যাবো।

মায়ার হৃদয়ের দখিন দুয়ার খুলে যায় হাট করে। আনন্দধ্বনি বাজে বুকের ভেতরে কোথাও।

– শোভন দা, আমার নিজের দাদা কোনও দিন, এই যে এত দিন আছি আমি এ বাড়িতে, বলেনি, মায়া তুই ভালো আছিস কি? কোনও দিন জানতে চায়নি। একটা রোবটের মতো চলি। সেই সকালে অফিস যাই। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে পার হয়ে যায়। একটিবার কোনও দিন বলেছে, চল তোকে কোথাও নিয়ে যাবো? অথচ... ছোটবেলায় কত ভালোবাসতো...। জানি না আসলে আদৌ ভালোবাসতো কিনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলেখার প্রসঙ্গ সোবহান উঠাতে চেয়েও উঠায় না। শুনেছে জুলেখাকে একটুও পছন্দ করে না মায়া। এত সরল-সুন্দর-সংবেদনশীল মেয়েটার কেন মুসলিম বিদ্বেষ জন্ম নিল! জগতে মানুষ যে সব এক, তাদের ভালোলাগা মন্দ লাগাগুলো, তাদের সুখ-দুঃখগুলো সব যে এক কেন মায়া বুঝবে না! তারা যে সবাই ভালোবাসা চায়, এ কেন মায়া বুঝবে না? না বোঝার তো কিছু নেই। কেউ তো ভালোবেসে বোঝায় না। গালাগালি দিয়ে, হিংসে দিয়ে, রোষ দিয়ে, অশ্লীলতা দিয়ে বোঝালে কেউ কি শেষ পর্যন্ত কিছু বোঝে? আইন দিয়ে বোঝালেও তো বোঝা ঠিক ঠিক হয় না।

সেই হ্যাঙ্গ আউটে বসে থাকা বিকেলেই সোবহান মায়াকে বলে দেয় সে হিন্দু নয়, তার নাম শোভন চক্রবর্তী নয়। সে সোবহান। মোহাম্মদ সোবহান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহর নিয়ে দিন দিন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। বাড়ি থেকে বেরোলেই যানজটে আটকা পড়তে হয়। এক ঘণ্টা দুঘণ্টা কেটে যায় শুধু চার নম্বর ব্রিজের কাছে বা বাইপাসেই। এ শহর দিন দিন ঠিক কী হয়ে উঠছে বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। মানুষের হাতে টাকা আসছে। টাকা এলেই গাড়ি আসে। গাড়ি এলেই রাস্তার দরকার হয়। কিন্তু কলকাতা শহরে তো রাস্তা নেই যথেষ্ট। এত কম রাস্তায় এত বেশি গাড়ির চলাচল সম্ভব হয় না। তাই সব থমকে থাকে। এত দোষ কলকাতার, তবুও কলকাতাই আমার প্রিয় শহর।

পলুশনের শহর কলকাতাই প্রিয় আমার। অতিষ্ঠ গরমের এই শহর আমার প্রিয়। এ শহরে আমি যে নিজের ভাষায় কথা বলতে পারছি তা আমার কাছে অনেক বড় একটা ব্যাপার। এখানকার মানুষ তা বোঝে না। ইউরোপ ছেড়ে এখানে কেন এসেছি মরতে, তা এখানকার মানুষদের বোঝানো আমার পক্ষে শক্ত। ওরা ভাবে ইউরোপে আমার বোধহয় ভয়ংকর খারাপ অবস্থা ছিল, তাই চলে এসেছি। ওখানে খুব ভালো অবস্থা থাকলেও যে চলে আসে কেউ কেউ, আসতে পারে তা কারও জানার মধ্যে নেই। বেশিরভাগ লোকের বিশ্বাস, ইউরোপ-আমেরিকায় কেউ খারাপ থাকে না। ওখানকার সকলেই যেন ধনী, সকলেই সুখী।

আত্মীয় নেই, স্বজন নেই, ভাষা নেই, সংস্কৃতি নেই, আমি কী করে থাকবো বিদেশ বিভূঁইয়ে। এসবের যে এত কাঙাল আমি, তা নাকি অনেকে জানতো না। কাঙাল বলে আমার সম্পর্কে খুব উঁচু কোনও ধারণা কারও জন্মায় না।

আমার জীবনে আমার বন্ধুরাই আমার আত্মীয়। আমাকে যারা ভালোবাসে, তারাই আমার স্বজন। এই মুহূর্তে কিরণময়ীই আমার মায়ের মতো, সুরঞ্জন আমার বন্ধুর মতো বা ভাইয়ের মতো, মায়া আমার বোনের মতো। আত্মীয়হীন জীবন কাটাতে কাটাতে কাউকে কাউকে অবচেতন মনেই হয়তো আত্মীয় বানিয়ে বসে থাকি। যাদের আত্মীয় মনে করি, তারা হয়তো এ খবর একবিন্দু জানেই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরঞ্জন বাংলাদেশে গেছে এ খবরটা আমাকে একবারও জানানোর প্রয়োজন সে অনুভব করেনি। মানুষ এত নির্মম হতে পারে কী করে, বুঝি না। ও দেশটা সুরঞ্জনের দেশ, আমারও তো দেশ। দেশটায় আজ সুরঞ্জন যেতে পারে, আমি পারি না। ও দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরও, নাগরিকত্ব বাতিল করার পরও ভারতের নাগরিকত্ব নেওয়ার পরও সুরঞ্জনের যাওয়ার অনুমতি মেলে। আর আমি ও দেশের নাগরিক, ও দেশে ফেরার জন্য এক যুগ অপেক্ষা করেও ওদেশে পা রাখতে পারি না। একটু মায়া হয় না সুরঞ্জনের আমার জন্য? একবার সে অন্তত মুখের বলাটুকু পারলো না বলতে যে দেশে যাচ্ছি।

বুঝি আমি, যে, আমাকে হয়তো দূর থেকে শ্রদ্ধা করে মানুষ, কিন্তু ভালোবাসে না। যারা ঘৃণা করে, তারা দূর থেকেও করে, কাছ থেকেও করে। ভালোবাসা পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা আমার নেই। সবার কপালে সব কিছু থাকে না। আমার যেমন অনেক পাওয়া হয়েছে, কেবল ভালোবাসাই পাওয়া হয়নি। পাওয়া হলে জানতাম যে সুরঞ্জন বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসেছে। এ খবরটাও আমি জুলেখার কাছ থেকে পাই। আমাকে এড়িয়ে চলছে কেন সুরঞ্জন, এর কারণটাও জুলেখা আমাকে জানায়, তার নাকি সন্দেহ হচ্ছে আমি তাকে নিয়ে আরেকটা উপন্যাস লিখতে যাচ্ছি। এ কারণেই নাকি এত খোঁজ করি তার। এ কারণেই তাকে এত দরকার আমার।

খুব আহত হই শুনে। লেখার ঘরটির জানালায় বাড়িঘরের ওপর দিয়ে আকাশের যেটুকু দেখা যায়, ওই আকাশটুকুই সম্ভবত আমার মুক্তির জায়গা, মনে মনে ওই আকাশের বিশালতা আর সীমাহীনতার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে পালকের মতো উড়িয়ে দিই, তুচ্ছ কিছুই আমাকে আর স্পর্শ করতে পারে না। সুরঞ্জনকে নিয়ে আমি যা লিখেছি, তা কি খারাপ কিছু লিখেছি? তার ভালোর জন্যই তো লিখেছি। শুধু তার নয়, সবার ভালোর জন্য। যেন মানুষ মানুষকে মানুষ বলে মনে করে। মানুষের পরিচয় যেন মানুষ হয়, মানুষের পরিচয় যেন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান না হয়। যা কিছুই লিখেছি, সবই তো মানবতার জন্য, মানবাধিকারের জন্য। যা-ই করেছি, সুরঞ্জনের জন্য ভালো করতে চেয়েছি। আর যেন কোনও সুরঞ্জনকে নিরাপত্তার অভাবে গুটিয়ে থাকতে না হয়, উন্মাদ হয়ে যেতে না হয়। আর যেন কোনও সুরঞ্জনকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য না হতে হয়। এত বোঝে ছেলে, এ কথাটা বোঝে না? তাকে নিয়ে যদি আমি উপন্যাসই লিখি এখন, তার আপত্তি কেন! আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি অধিকার নেই তাকে আমার উপন্যাসের চরিত্র করা! অবশ্য তারও অধিকার আছে চরিত্র না হওয়ার জন্য চেষ্টা করা, তারও অধিকার আছে আমাকে ভুলে যাওয়া।

এরপর আমার সঙ্গে কারওই আর কোনও যোগাযোগ থাকে না। ইচ্ছে করেই আর রাখি না। অভিমান কি আমার নেই? এত যে ভালোবেসেছি, ভালোবাসা কি সামান্যও কেউ দিয়েছে? আমি কোথায় থাকি, আমার বাড়ি, ফোন নম্বর কিরণময়ীও তো জানেন, তিনিও তো কোনও দিন খবর নেননি। আমার কী দায় পড়েছে ওদের দরজায় কড়া নেড়ে ওদের ভালো থাকা না থাকার খবর নিতে যাবো? আমিই হয়তো দেখে দেখে চমকে উঠি। নিজের অবস্থার সঙ্গে ওদের অবস্থার তুলনা করে কেঁদে বুক ভাসাই, ভাবি ওরা খারাপ আছে, আসলে ওরা খারাপ থাকে না। যে করেই হোক, যে কোনও অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেয়। আমিও কি ভালো নেই? আমিও তো মানিয়ে নিতে পারি। আমাকে দেখেও তো লোকে বলে আহা আমি কত কষ্টে আছি, এভাবে বিদেশ বিভূঁইয়ে, একা একা। যতটা ওরা ভাবে কষ্টে আছি, তত কষ্টে তো নেই। হাহাকারের সঙ্গে বসবাসটা এক রকম মানিয়ে নিয়েছি। ভালোবাসলেই এই দরদটা আসে। অন্যের কষ্টে কষ্ট পাওয়ার হৃদয় কজনের আর আছে। এই মানুষটাই তোমাদের কারও দায় নেই, একা আমার কী এমন দায় পড়েছে খবর নেবার, বলে অভিমানে কাটিয়ে দিই মাসের পর মাস।

এর মধ্যে ইউরোপ ঘুরে এলাম। অনেকবারই শিউরে উঠেছি সুরঞ্জন আবার কোনও ঝিলের ধারে বসে থেকে থেকে একদিন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরে যায় কিনা ভেবে। আমার কেন জানি না মনে হয় আত্মহত্যা খুব সংক্রামক। আত্মহত্যা দেখলে আত্মহত্যা করার ইচ্ছে জাগে। সুরঞ্জন বেঁচে আছে কিনা জানার জন্য, যেহেতু সুরঞ্জনের পুরনো ফোনটি ব্যবহার করছে মায়া, যেহেতু আমি মায়ার চক্ষুশূল, তাকে আর না জ্বালিয়ে জুলেখাকে ফোন করি। জুলেখা আমার ফোন পেয়ে ভীষণ খুশি। বললো, সে আগের জায়গাতেই চাকরি করছে। আগের হোস্টেলেই আছে। জীবন আগের চেয়ে সুন্দর। প্রাইভেটে এম এ পরীক্ষা দেবার প্রস্তুতি চলছে তার।

বাচ্চা?

বাচ্চা তার বাবার কাছেই আছে। ভালোই আছে। ভালো থাকলেই ভালো। ছেলে বড় হলে কোনও দিন যদি মার কাছে আসতে চায়, আসবে।

আর ওদিককার খবর কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদিককার খবর? জুলেখা হেসে বললো, সুরঞ্জন আগের মতোই আছে। হোপলেস অবস্থায়। তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে। অনেকটা বন্ধুর মতো।

কেন, প্রেম সব উবে গেল?

জুলেখা হেসে বললো, যা হয়েছে ঠিকই হয়েছে। আমারও কি পোষাতো?

আজকাল বুঝি প্রেমের ব্যাপারেও পোষাবে কি পোষাবে না বিচার করা হয়? আমি জিজ্ঞেস করি, হেসে হেসেই।

ও আসলে সবকিছুতেই হয়। রিলেশনশিপের বেলায় এটা ভেতরে ভেতরে থাকে, কিন্তু থাকে।

হুম। আর সোবহান? ওর সঙ্গে কি গাঁটছড়া বাঁধলে?

জুলেখা হাসতে হাসতে বললো, ও এখনও আমাকে আর সুরঞ্জনকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় যায়। তবে তার আর সময় কই? সে তো মায়াকে নিয়ে ব্যস্ত।

মানে? আমি আকাশ থেকে পড়ি।

বললো, মায়া আর সোবহানের বিয়ে হচ্ছে আগামী মাসের ছ তারিখ।

জুলেখা বললো তার সঙ্গে মায়ার এখন দেখা-সাক্ষাৎ হয়। মায়াই নাকি বলেছে নিজে সে আমার বাড়িতে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র দিতে আসবে।

– বলো কী? ঠিক বলছো?

জুলেখা ঠাণ্ডা গলায় বলে, হ্যাঁ। বেঠিক কী কারণে বলবো বলুন?

– কী করে মায়া আর সোবহানের বিয়ে হবে? মায়া তো...

– মায়া তো কী?

– মায়া তো কেমন যেন বদলে গিয়েছিলো না? তুমি জানো না? জুলেখা বললো সে মায়ার কোনও বদল সম্পর্কে সে জানে না। যতটুকু জুলেখা দেখেছে মায়াকে, মুগ্ধ। খুব হাসিখুশি মেয়ে। খুব সরল-সহজ-উদার মেয়ে। জুলেখা বলতে থাকে, খুব ইনডিপেনডেন্ট, কনফিডেন্ট, খুব হার্ড ওয়ার্কিং, স্পনটেনিয়াস।

– সত্যি বলছো?

– হ্যাঁ।

– তোমার মনে হয় না, ও ভেতরে ভেতরে অন্য রকম?

– অন্য রকম কী রকম?

– মুসলিম বিদ্বেষী...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– মুসলিম বিদ্বেষী? প্রশ্নই ওঠে না। কেন বলছেন এমন কথা...

– আসলে ওর ওপর তো একটু অত্যাচার হয়েছিলো...

– হ্যাঁ, আমি জানি এসব আপনি লিখেছেন। কিন্তু একটা মেয়ে সম্পর্কে ওভাবে লেখা আপনার উচিত হয়নি।

– কেন? উচিত না হওয়ার কী আছে? আমি তো মিথ্যে কিছু লিখিনি।

– সব সত্যই তো আর প্রকাশের মতো নয়।

– ও কি এ নিয়ে কিছু বলেছে?

– না, ও বলেনি। এটা আমার কথা। ধরুন আপনি যদি লেখেন যে আমি কারও দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছিলাম কোনও দিন, এটা কি আমার ভালো লাগবে? সারাক্ষণ তো মনে হবে, যে-ই আমার দিকে তাকাচ্ছে, বুঝি ও কথাই ভাবছে। ধর্ষিতা পরিচয় ছাড়া আর কোনও পরিচয় আমার থাকবে না।

– আমি কি সত্য কথাটা লিখবো না?

– সত্য কথা বলার সমাজ কি এই সমাজ?

– সমাজের মতো করে আমরা চলবো। নাকি সমাজটাকে গড়বো?

– সমাজকে আপনি একা গড়তে পারবেন না। কজন আর আপনার সঙ্গে আছে? আর সমাজ গড়া সমাজ গড়া স্লোগান, আই অ্যাম স্যরি টু সে দ্যাট— এসব খুব রোমান্টিক ব্যাপার। এসব বলে সত্যিকার কিছুই হয় না।

আমি হাঁ হয়ে বসে থাকি। জুলেখা মায়ার হয়ে তর্ক করছে। ওদিকে মায়া এক মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। সবই কেমন যেন অস্পষ্ট, সবকিছুর আমূল বদল হয়ে গেল, নাকি আমি আস্ত একটা বোকা?

– ওরা বিয়ে করছে, কী রকম যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না।

– হ্যাঁ, ওরা বেশ জাঁকজমক করে বিয়ে করছে। আপনার কিন্তু আসতেই হবে বিয়েতে।

– জুলেখা, তুমি কি সত্যি বলছো?

এবার ও জোরে হাসে। মিথ্যে বলবো কেন?

তাই তো। মিথ্যে বলবে কেন জুলেখা? বলি, আচ্ছা তোমার কাছ থেকেই ওদের সব গল্প শুনবো তো। এসো একদিন।

– নিশ্চয়ই যাবো।

– তোমার জন্য ভদকা এনেছি বিদেশ থেকে।

– তা-ই।

আমার আমন্ত্রণ পেয়ে জুলেখা খুশিতে লাফায়। বললো কালই আসবে সে। আসবেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নটে গাছটি মুড়োলো গল্প আমার ফুরোলো, সোবহান আর মায়া বিয়ে করছে, অতঃপর তারা সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগলো—ব্যাপারটা এ রকম নয়। ঘটনাটি ঠিক এভাবে ঘটবে বলে আমি অন্তত বিশ্বাস করি না। নাহয় দুজনের গভীর প্রেম হলো। বিয়ে করার সিদ্ধান্ত তারা নিল। নিতেই পারে। কিন্তু সোবহানের বউ-বাচ্চার কী হবে? নায়লা যদি স্বনির্ভর একটা মেয়ে হত, স্বামীর কীর্তিকলাপ দেখে নাহয় তাকে ত্যাগ করতে পারতো। নায়লা তো আর জুলেখা নয়। সবাই জুলেখা হতে পারে না।

সারা দিন অন্য কিছুতে আমার মন বসে না। সুরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে প্রবলতর হতে থাকে। অভিমান-রাগ কখন যে ধুয়ে-মুছে যায়। সুরঞ্জনের মতো অপমান আমাকে আজ অবধি কেউ করেনি। সে স্পর্ধা দেখিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন আমাকে অবজ্ঞা করে যাওয়ার। এই একটি মানুষ, যাকে আমি ছাড়তে পারি না, আবার একে নিয়ে বেশিক্ষণ টিকে থাকাও অসম্ভব। সুরঞ্জন বদলেছে অনেক। একটা মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ কী রকমভাবে বদলে যায়, তার এই বিবর্তনটি আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে, যেহেতু, সত্য কথা বলতে কী, তাকে নিয়ে 'লজ্জা' উপন্যাসটি আমি লিখেছিলাম বলেই। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রকে ব্যাখ্যা করা যায়, সুরঞ্জনকে ঠিক করতে পারিনি বলেই তার জন্য আগ্রহ আমার আজও কমেনি। আমি নিশ্চিত নই সুরঞ্জন তার বাকি জীবন এভাবেই কাটাবে কিনা যেভাবে কাটাচ্ছে এখন। জুলেখার সঙ্গে সুরঞ্জনের প্রেমের সম্পর্কটা যে শেষ অবধি টিকবে না, তা আমি ভাবতেও পারিনি। মুসলমান বিদ্বেষী মায়া একটা মুসলমান ছেলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছে, এটা একটা বিরাট চমক। অনেকটা কমিউনিস্টের মৌলবাদী হয়ে যাওয়ার মতো চমক। এক মেরু থেকে আরেক মেরুতে লম্ফ দেওয়া। সুরঞ্জন কোনও চমক দেয় না। ওর ভেতরের ভাঙনগুলো নিভৃতে ঘটতে থাকে। সুরঞ্জন এমন এক যুবক, যাকে খুব সাধারণ বলা যায় না, আবার খুব অসাধারণও বলা যায় না। ব্যক্তিজীবনে খুব উদাসীন সে, আবার উদাসীনও নয়। এমন চরিত্র খুব একটা চোখে পড়েনি আমার। আমার আশঙ্কা হঠাৎ হঠাৎ জেগে ওঠে যে, সুরঞ্জন হয়তো কোনও লেকের জলে একদিন আত্মহত্যা করবে, এই আশঙ্কা হয়তো সম্পূর্ণই অমূলক। আত্মহত্যা, আমার সব সময় মনে হয় কিছুটা সংক্রামক। ডাক্তার সুধাময় করেছেন এবং এই আত্মহত্যার সাক্ষী যারা, তাদের ভেতর খুব মন খারাপ করা বিকেলে খুব একা যখন, চারদিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ নেই কিছু নেই, হু হু করা নিঃসঙ্গতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে বুকের ভেতরটা, তখন একবারও কি আর মনে হবে না– কী দরকার বেঁচে! তখন খুব দূরে নয় তো লেকের জল! এখনও সুধাময়ের মৃত্যু আমাকে কাঁপায়। এখনও নিশ্চিত নই কী কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। বলা হয় তো অনেক কিছু, কোনটা যে সত্যি, তা কি কেউ জানে, যে নিজেকে হত্যা করে, শুধু সে ছাড়া?

সুরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেকে কী করে রোধ করবো আমি জানি না। চিরকালই কি কারও কোনও ইচ্ছে মনে রয়ে যেতে পারে? একদিন, জানি না সেদিন কোন দিন, যেদিন আমি জানতে চাইবো না সুরঞ্জন কেমন আছে, বেঁচে আছে কিনা, মায়া বা কিরণময়ী ভালো আছে কিনা। তবে যেভাবেই বেঁচে থাক ওরা, ভালো থাক, চাই। একটা দায়িত্ব অনুভব করি ওদের প্রতি। আমার যেন আত্মীয় ওরা। অথবা আত্মীয়ের চেয়ে বেশি। ভাবা উচিত নয়, তবু মাঝে মাঝে ভাবনায় চলে আসে আমার যে, ওরা আমারই সৃষ্ট কিছু চরিত্র। সুতরাং আমার সুরঞ্জন যেন জলে ডুবে না মারা যায়। আমার কিরণময়ী যেন তার ছেলেমেয়ে নিয়ে স্বস্তিতে থাকেন। আমার মায়াকে আর যেন কোনও কষ্ট সইতে না হয়। সবাই যেন সুখে থাকে। যেখানেই থাক তারা, ফুলবাগান, বাবুবাগান বা বেগবাগান, যেন নিরাপদে থাকে।

আমার সঙ্গে কোনদিনই কারোরই আর দেখা হবে না, এ আমার ভাবতেই কষ্ট হয়। এক শহরে যখন বাস করি, নিশ্চয়ই মাঠে-ময়দানে, সিনেমা-থিয়েটারে, অলি-গলিতে হঠাৎ কখনও দেখা হয়ে যাবে। কুশল বিনিময়ের মতো সাদামাটা কিছু একটা তো হবেই, অন্য কিছু না হোক।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন তো কারও সঙ্গে দেখা হওয়া বা না হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জীবন আরও অনেক বড়। সে জীবন যেমনই হোক। এক খেয়ালেই জীবন যদি চলতো, জীবন থেমে পড়তো জীবন শেষ হওয়ার অনেক আগে। মায়া কখনও কারও সঙ্গে প্রেম করেনি। বাংলাদেশে দু-একটা ছেলেকে তার ভালো লাগতো। ইচ্ছে হয়েছিল ওদের একজনকে বিয়ে করার। কিন্তু ছেলেরা মিশেছে তার সঙ্গে, বন্ধুর মতো মিশেছে, প্রেম করতে কেউ চায়নি। ও দেশে যে হিন্দু-মুসলমানে বিয়ে হয় না, তা নয়। খুব হচ্ছে। কিন্তু তার ভাগ্যেই তেমন ঘটেনি। সুরঞ্জনের যেসব বন্ধুদের তার ভালো লাগতো খুব, তাদের সবাই মুসলমান। হায়দারকে খুব পছন্দ হতো মায়ার। মায়া কাউকে বুঝতে দেয়নি এ কথা। হায়দারকেও দেয়নি। কিন্তু হায়দার মায়ার দিকে নিজের ছোটবোনের দিকে যেভাবে তাকায়, সেভাবেই চিরকাল তাকিয়েছে। মাঝে মাঝে বলেছে, কীরে ছেমড়ি তুই এত বড় হয়ে যাইতাছস কেন রে! শুনে ভালো থাকতো না তার। হিন্দুরা, মায়া যা দেখেছে, কী রকম যেন ভিতু, মুখে দুশ্চিন্তার দাগ। খুব অকপট আর সাহসী কাউকে সে দেখেনি। মুগ্ধ করার মতো চরিত্র, না কাউকে সে পায়নি। হয়তো আসল মানুষটার সঙ্গে তার আসল সময়ে দেখাটা হয়নি। কাজল দেবনাথকে ভালো লাগতো, কিন্তু সে তো বিবাহিত ছিল। মায়া দেখেছে, যাদের দেখে খুব ভালো লাগে, তাদের কিছু না কিছু সমস্যা থাকেই। হয় বিয়ে করে ফেলছে, নয় প্রেম করছে, নয় পড়াশোনা করেনি, নয় সমকামী বা এ রকম কিছু। একেবারে শুদ্ধ-সুন্দর কারও সঙ্গে তার দেখা হয়নি। কোনও খুঁত নেই, এমন কোনও পুরুষ কি জগতে আছে কোথাও, মায়ার বিশ্বাস হতে চায় না।

মায়া এই যে শোভনকে পছন্দ করলো, শোভন বা সোবহান হিন্দু কী মুসলমান তা দেখলো না, তার একটাই কারণ, ভেতর থেকে সে টের পেয়েছে যে, ওই দেখাটা অর্থহীন। মানুষ হিসেবে একজন ভালো হতে পারে, আরেকজন মন্দ হতে পারে, এই ভালো-মন্দ হওয়াটা ধর্ম বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে না। নিজে সে পুজো আচ্চা কিছু বাদ রাখছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না করতে। সোবহান একবারও বলেনি পুজো, কেন করছো। সোবহান নিজে ধর্ম মানে বলে তার মনে হয় না। যদি মানতোও, মনে হয় না মায়া কোনও আপত্তি করতো।

আপাতত মায়ার তাই মনে হচ্ছে, সত্যি সত্যি যদি মানতো তাহলে মায়া এখনও ঠিক জানে না ঠিক কী হতো। ধর্ম মানা মুসলমান আর কারও জন্য না হলেও, মায়ার জন্য কোনও বিস্ময় নয়। মায়া বাংলাদেশে বেড়েই উঠেছে ওদের মধ্যে। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা প্রায় সবাই ধর্ম মানতো। ধর্ম মানা বলতে যা সে দেখেছে, বছরে দুটো ঈদে নতুন পোশাক পরে হৈচৈ করা, ভালো খাবার খাওয়া, বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া। আর রোজার সময় দু-একটা রোজা রাখা শখ করে। ব্যস। মায়ার বন্ধুদের ধর্ম পালন ওইটুকুই। তার কোনও বন্ধুকে সে নামাজ পড়তে দেখেনি, বোরখা তো নয়ই, মাথায় ওড়না তুলতে দেখেনি। ওইটুকু ধর্ম পালন করেই তারা নিজেদের মুসলমান বলতো। ওই বন্ধু মেয়েগুলো হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবার সঙ্গে সমানভাবে মিশতো। মায়া নিজেও তাই করতো। কোনও দিন পার্থক্য করেনি। পার্থক্য করার মানসিকতা নিয়ে সে বড় হয়ে ওঠেনি।

বাড়িতে একটা পরিবেশ বরাবরই ছিল, যেখানে ধর্ম কোনও বিষয় ছিল না। মানুষের মতো মানুষ হওয়াই ছিল সবচেয়ে বড় কাজ। মানুষের মতো মানুষ তো হয়েই ছিল মায়া। কিন্তু কী প্রতিদান সে পেয়েছে? কী দিয়েছে তাকে বাবলু, রতন, বাদল, রুবীর, সুমন, ইমন, আর আজাদের দল, ওই মুসলমানের বাচ্চাগুলো! সবকটাকে চিনতো মায়া। পাড়ার ছেলেই তো সব। না, তার বেঁচে থাকার কথা ছিল না। মায়ার শীররটাকে নিয়ে ওরা যা-ইচ্ছে তাই করেছে। এক শরীর-মাংস হাতের কাছে পেয়ে গেছে একদল হায়েনা। লজ্জায়-ঘৃণায় মায়া কুঁকড়ে ছিল। কুঁকড়েই ছিল। কেন যে সে বেঁচে উঠলো? বেঁচে ওঠার পর তার ইচ্ছে হয়েছে, এখনও ইচ্ছেটা আছে মায়ার, যে, ওদের সে একটা একটা করে খুন করবে। ধর্ষণ-গণধর্ষণ অহরহই হচ্ছে, পৃথিবীর সর্বত্রই হচ্ছে। বাংলাদেশে যেমন হয়, ভারতেও তেমন হয়। পুরুষ বদমাশ এবং শক্তিধর; নারী নিরীহ এবং শক্তিহীন—ধর্ষণের কারণ এ-ই। কিন্তু মায়াকে যে ধর্ষণ মুসলমানরা করেছে তা শক্তি-শক্তিহীনের ঘটনা নয়। তা মুসলমান আর হিন্দুর ঘটনা। মায়ার জায়গায় সেদিন কোনও শক্তিহীন রাবেয়া বা রোকেয়া যদি থাকতো, ওদের ধর্ষিতা হতে হতো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা একটি মেয়েকে ধর্ষণ করেনি, ওরা একটি হিন্দুকে ধর্ষণ করেছে। হিন্দু, যে শব্দটি ছিল না কোনও দিন মায়ার অভিধানে, ওরাই শরীরে খোদাই করে লিখে দিয়ে গেল শব্দটি। শব্দটি মায়ার জন্য আর শব্দ থাকেনি। ওটি ক্ষোভ, জেদ, অপমান, লজ্জা, ঘৃণা, মৃত্যু, ধর্ষণ, রক্ত, বিষাদ আর হাহাকার হয়ে উঠলো। মায়া মানুষ ছিল, তাকে ওই কটা মুসলমান ছেলে আপাদমস্তক হিন্দু করে দিয়ে গেল। সেই থেকে হিন্দুত্বের যা কিছু আছে জগতের, মায়া মাথা পেতে বরণ করেছে। মায়া হিন্দু হয়ে জন্ম নেয়নি। হিন্দু ছিল না সে, সেদিন, সেই ধর্ষণের দিন সে হিন্দু হয়েছে। সে একটা আপাদমস্তক হিন্দু, দেশের শৈশব-কৈশোরের সব স্মৃতি পায়ে ঠেলে চলে আসতে এতটুকু দ্বিধা করেনি। তার মনে হয়েছে, তার ওই মুসলমান ভালো বন্ধুরা সবাই ধর্ষক, সবাই প্রতারক, সবাই হিন্দুবিদ্বেষী।

তার নিজের দেশকে আর নিজের দেশ বলে মনে হয়নি, মনে হয়েছে মুসলমানের দেশ। আর কী-ইবা মায়া করতে পারতো? মায়ার পক্ষে সম্ভব হয়নি ক্ষতে আর অন্য কোনও মলম লাগাতে। এ ক্ষত সারার নয়। মনে যদি হানড্রেড পারসেন্ট বার্ন ঘটে যায়. জগতে কোনও চিকিৎসা নেই তার। যে মন পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সে মনকে উড়িয়ে দিতে হয়। মায়ার শরীর পোড়া ছাই বাংলাদেশের আকাশে ওড়েনি, উড়েছে মন পোড়া ছাই। সে ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে তার জন্মের শহরে। দিতে দিতে প্রতিজ্ঞা করেছে সে, কোনও দিন এই নরকে ফিরবে না। দ্বিখণ্ডিত জীবন তার। নতুন করে সেদিন সে জন্ম নিয়েছে। সে হিন্দুর দেশে, নিজের দেশে ফেরার জন্য ছটফট করেছে। এ অনেকটা এমন, নকল মাকে এত দিন মা বলে জেনে এসেছিল। বুদ্ধি হবার পর সে জেনেছে, তার আসল মা অন্য কোথাও। সেই আসল মার কোলে মায়া এত দিন পর সমস্ত নকলকে পায়ে ঠেলে ফিরে আসছে। চোখ বুজেছিল প্রশান্তিতে, যেদিন ভারতের মাটিতে সে প্রথম পা দিয়েছিল।

অনেক বছর হয়ে গেল।

কোথায় সেই মায়া এখন! চোখের সামনে সোবহান দাঁড়িয়ে। সোবহানের চেয়ে ভালো কোনও যুবকের সঙ্গে তার দেখা হয়নি ভারতবর্ষে। না, এ হিন্দু যুবকদের দোষ নয়, যে, তাদের সঙ্গে দেখা হয়নি, এ তারও দোষ নয়। পারফেক্ট ম্যাচ-এর দেখা না হওয়ার দোষ কাউকে দেয়া যায় না। মায়া কপাল মানে না। কিন্তু মাঝে মাঝে তার মনে হয়, কপাল মানলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক হতাশা থেকে মুক্তি জোটে। কপাল বা ভাগ্যের ওপর দায়িত্ব দিয়ে বেশ নিশ্চিন্তে থাকা যায়। সোবহানকে তার ভালো লাগে। যদি সে প্রথম থেকে জানতো যে শোভন আসলে শোভন নয়, তবে হয়তো শোভনকে এত ভালো লাগতে নিজেকে সে দিত না। না দিয়ে জানে না সে নিজে কী মঙ্গল করতো। কী আছে তার জীবনে আর! মেয়েদের জীবনে স্বামী আর সংসারই পরম ধন। সেই ধন সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ ওই ধন থেকে তার মন পুরোপুরিই উঠেছে। কোনও সুস্থ মানুষ ওই ধন নিয়ে জীবন কাটাতে পারে না। মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ হওয়ার আগেই মায়া নিজেকে সে সরিয়ে এনেছে। এ বোধহয় জীবনে তার শেষ পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়া। নিজের বাচ্চা-কাচ্চা শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে মায়ের বাড়িতে বেড়াতে নয়, একেবারে তল্পিতল্পা নিয়ে এসে– যতই মায়া ভাব দেখাক না যত দিন ইচ্ছে মা-দাদার বাড়িতে থাকার তার সেই অধিকার আছে, ভেতরে ভেতরে বোঝে সে, এই সমাজটা তাকে সেই অধিকার দিচ্ছে না। মায়া কোথায় বাস করবে, কোন বাড়িতে বাস করলে তাকে মানায়, যেন চোখে আঙুল দিয়ে প্রতিদিন দেখিয়ে দিচ্ছে না, যে যাই বলুক, কারও কথা সে আর মানবে না। সে ডিভোর্স চাইছে। ডিভোর্স চাইছে ভয়াবহ মৃত্যু থেকে মুক্তি পেতে। শোভন বা সোবহানের সঙ্গে কোনও সম্পর্কের কারণে নয়।

সোবহানকে যদি ফুঁ মেরে সে হিন্দু করে দিতে পারতো। সত্যিকার শোভন করে দিতে পারতো। ভেতরের সেই ক্ষোভ তার কিছুটা হলেও মিটতো। সোবহানের সম্পর্ক আরও দূর এগোলে দিন দিন মায়া কোন গহ্বরে যাবে, ঠিক জানে না। সোবহান এত ভালো না হলেও পারতো, মায়া ভাবে। সোবহান থেকে মুক্তি পেতে সে তাকে অপমান করেছে কম নয়। সেদিনের কথা মনে পড়ে তার।

বিয়ে তো করেছো। বউকে তো ভালোবাসো, বাসো না?

সোবহান চুপ করে থেকেছে।

বউ-এর কাছে তো ফিরে যাও প্রতি রাতে। যদি বলি, যেও না। পারবে না গিয়ে থাকতে?

সোবহান চুপ।

আজকে বউ ছেড়ে আমার কাছে এসে বসে থাকো। আমাকে একদিন না দেখলে নাকি তোমার অস্থির লাগে। আমার সঙ্গে বিয়ে হলেও তো তুমি তাই করবে। অন্য কাউকে না দেখলে অস্থির লাগবে।

সোবহান চুপ করে শোনে সব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলে সে, তোমার বউ তো আমার চেয়ে কমবয়সী। কমবয়সী মেয়ে ছেড়ে বেশি বয়সী মেয়ের দিকে ঝুঁকেছো কেন? পুরুষরা তো কমবয়সী খোঁজে। ওতে নাকি অঙ্গের আরাম হয়।

এবার সোবহান ধমক দিয়ে বলে, তুমি থামবে?

— কেন, থামবো কেন?

— থামবে, কারণ বাজে কথা বলছো।

— বাজে কথা, তা ঠিক। কিন্তু সত্যি কথা তো?

— না। সত্যি কথা নয় এসব।

— তাহলে সত্যি কথা কোনগুলো বলো। আমার খুব সত্যি কথা শুনতে ইচ্ছে করে।

— কেন?

— কারণ, সত্যি কথা কোথাও শুনি না। কেউ বলে না।

— তুমি বলো?

— হ্যাঁ, আমি বলি।

— কী রকম শুনি।

— সত্যি শুনবে?

— শুনবো না কেন?

— আমি মায়া।

— সে জানি, তুমি মায়া।

AMARBOI.COM

— আমাকে পাঁচটে মুসলমান ছেলে ধর্ষণ করেছিলো। তোমার জাতের পাঁচটে ছেলে। আমি মরেই যাচ্ছিলাম, কী করে বেঁচেছি জানি না। আমি সেদিন থেকে দুনিয়ার তাবৎ মুসলমানদের হেইট করি। এই হলো সত্যি কথা।

— আমাকেও হেইট করো? সোবহান শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে।

মায়া বলে, যেদিন জানলাম তুমি মুসলমান সেদিন থেকে তোমাকে ঘৃণা করার চেষ্টা করেছি। পারিনি।

— কেন?

— জানি না কেন। আরও শোনো। আরও সত্য শোনো। সত্য বলতে যদি অপ্রিয় সত্য বুঝে থাকো তবে শোনো। যে বাড়িতে আমরা থাকতাম একসময়, দেশ থেকে চলে আসার পর, সেই বাড়ির লোক রাতে রাতে আমার গায়ের ওপর চড়ে বসতো।

— তাই নাকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– হ্যাঁ, তাই। আরও শোনো, আমি বাধা দিইনি।

– কেন?

– বাধা দিইনি, ভয়ে। আমি খুব ভিতু। খুব জঘন্য ভিতু। আমার মন ভাঙা, শরীর ভাঙা। একজন ভাঙা, ভঙ্গুর, দুর্বল মানুষ কাউকে বাধা দিতে পারে না।

সোবহান মাথা নিচু করে শোনে।

– আরও শুনবে?

মায়ার স্বর সপ্তমে ওঠে। স্বরে কাঁপন আসতে থাকে। শ্বাস পড়তে থাকে দ্রুত। চোখ ফেটে জল বেরোতে থাকে। বুকের মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা হতে থাকে। বুকের যন্ত্রণা সারা শরীরে ছড়াতে থাকে। হাত-পা কাঁপতে থাকে।

– আরও শোনো। রাস্তায় দাঁড়িয়েছি বেশ্যারা যেভাবে সেজেগুজে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, সেভাবে দাঁড়িয়েছি। কারণ এই শরীরটা যখন পুরুষদের, বদমাশদের, শয়তানের লুটেপুটে খাওয়ার জন্যই, যখন আমার বাধা দেওয়ার শক্তিই নেই, তখন শরীর বিক্রি করার চল যখন আছে, কেন করবো না বিক্রি? টাকার অভাবে পুরো পরিবার ভুগছি। বাবা-মা নিরীহ। দাদাটার থাকা না থাকা সমান। একটা অপদার্থ। সে কারণেই বাধ্য হয়েছি, শরীর বিক্রি করেছি। কেন করবো না? শরীরকে পুতপবিত্র রাখবো কার জন্য? আর পূতপবিত্রের সংজ্ঞাটাই বা কী? তোরাই ঝাঁটিয়ে পড়বি, টাচ করবি, তোরাই আবার আনটাচড শরীর চাইবি, এ কেমন কথা? এ কেমন আবদার, বলো তো, মোহাম্মদ সোবহান, তোমার কাছে উত্তর আছে এর?

সোবহান মাথা নিচু করে বসে থাকে। কপালের শিরায় আঙুল চেপে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বসে থাকা।

– কী গো? মাথাব্যথা করছে বুঝি? মাথাব্যথা এই তো তোমার শুরু হলো। আমার থেকে দূরে সরে থেকো। তা না হলে ব্যথা হতে হতে তোমার মাথাটাই একদিন ছিঁড়ে পড়বে। বাঁচতে চাইলে এই ধর্ষিতা, এই বেশ্যা, এই মুসলিমবিরোধী, হিন্দু ফ্যানটিক থেকে সরে যাও। বাঁচো সোবহান। কবে না জানি ওই রেপিস্টদের শোধ নিতে গিয়ে আমি তোমাকেই খুন করবো। মুসলিম ব্রাদারহুড বলে তো তোমাদের একটা ব্যাপার আছে। আছে না? তবে এক ব্রাদারের কৃতকর্মের শাস্তি আরেক ব্রাদার ভোগ করুক। বাবরি মসজিদ এখানকার হিন্দুরা ভেঙেছে, তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমরা কি বাংলাদেশে দিইনি? রেপড হয়ে, মরে, পালিয়ে, পালিয়ে বেঁচে, একে বাঁচাই বা বলি কী করে, পালিয়ে মরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোবহানের নত মুখটা দু'হাতে ওঠায় মায়া। উঠিয়ে ঠোঁটে একটা চুমু খেয়ে বলে, কেন তুমি একটা হিন্দু মেয়ের প্রেমে পড়েছো বলো। তুমি তো প্রেমে পড়োনি। তুমি এমনি এমনি মজা করছো। কারণ তোমার জীবনে এ রকম কোনও মজা তুমি পাওনি। দেখেছো বোরখা পরা মুসলমান মেয়েদের। শিক্ষা-দীক্ষা নেই। থাকলেও কনজারভেটিভ। তাই সুরঞ্জনের সূত্রে চান্স পেয়ে হিন্দু সোসাইটিতে ঢুকে গেছো। দেখছো একটা ইনডিপেনডেন্ট মেয়ে। পুরুষের সঙ্গে সমান তালে চলছে। নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিচ্ছে। এক তুড়িতে স্বামী ছেড়ে দিয়েছে। তাকে খুব স্মার্ট মনে হচ্ছে তোমার। আনস্মার্ট আনকুথ মুসলিম মেয়ের সান্নিধ্যের চেয়ে এ মেয়ে অন্য রকম তাই। ওদিকে আবার সেবা-যত্নের ব্যাপারটাও আছে। এ মেয়ে আবার রাঁধেও বাড়েও। বিজ্ঞান নিয়েও কথা বলতে পারে। ইতিহাস-ভূগোলও বেশ জানে। তাই না? তাই মজা পাচ্ছো তুমি। ভালো বাসছো না। ভালো তুমি তোমার জাতের লোকদেরই বাসবে। আমার মতো। আমি যেমন আমার জাতের ছাড়া আর কাউকে মানুষ বলে মনে করি না। অবশ্য ঠিক বলছি না। ঠিক বলছি না কেন বলো তো? কারণ যে বদমাশকে বিয়ে করেছিলাম, তাকে আমি একই রকম হেইট করি, যে রকম হেইট আমি ওই মুসলিম রেপিস্টদের করি। কিন্তু এ কথা বলি না। বলি না হিন্দু বলে। কারণ কোন না কোনভাবে হিন্দুদের আমি প্রটেক্ট করি। করতে চাই।

সোবহানের চোখ দুটো লাল দেখাতে থাকে। সে হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে মায়ার দিকে।

মায়া বলতে থাকে, মুসলমানরা এ দেশে থাকে কেন? কেন থাকে আমাদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করার জন্য? ওদের জন্য তো দেশ দেওয়া হয়েছে। দু দুটো দেশ দেওয়া হয়েছে। সব মুসলমান ওখানে গিয়ে বাস করুক না। একটা হিন্দু মেজরিটি দেশে মাইনরিটি হিসেবে বাস করে কী মজা পাচ্ছে? নিশ্চয়ই মজা পাচ্ছে, তা না হলে থাকছে কেন? ওদের মজাটা আমার সহ্য হয় না। তবে আসল কী জানো। পুরুষ সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, সমান। তারা সমান শয়তান। মেয়েদের তারা ভোগাবেই। তোমার বউ ভুগছে মুসলমানের বউ হয়ে। আমি ভুগেছি হিন্দুর বউ হয়ে। ভুগছো না তুমি। ভুগছে না আমার দাদা সুরঞ্জন। ও হিন্দু বউ ছেড়ে দিয়ে একটা মুসলমান মেয়ের সঙ্গে লীলা করে বেড়াচ্ছে। তুমিও ওর পথ ধরেছো, তুমিও মুসলমান বউকে ঠকিয়ে হিন্দুর সঙ্গে লীলা করছো। আমার দাদাও মজা পাচ্ছে। দাদার তো সেক্যুলার হিসেবে নাম হচ্ছে। তোমারও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম হচ্ছে। এখানকার মুসলমান ছেলেরা তো আবার বেশ সেক্যুলার সাজে হিন্দু মেয়ে বিয়ে করে। কারও নাম আবদুর রহমান। সে তার নাম বলার আগে বলে, আমার বউ-এর নাম মৌসুমী মিত্র। বউকে ব্যবহার করে জাতে ওঠার জন্য। জাতে উঠে গেলে বউ-এর সঙ্গে সেই একই ব্যবহার করে, পুরুষেরা যেমন করে। যতই হোক, পুরুষ তো! তোমার আর জাতে ওঠার দরকার কী? তুমি তো তোমার পড়াশোনা-বিদ্যাবুদ্ধি, ভালো চাকরি, ভালো ব্যবসা এসব দিয়ে উঠেছোই জাতে। তোমার আর হিন্দু বিয়ের কী দরকার পড়েছে? আই অ্যাম নট গোয়িং টু ম্যারি আ মুসলিম, টেররিস্টের জাতকে বিয়ে করে মরবো নাকি? তার চেয়ে বেশ্যা হয়ে যাওয়া ভালো। তার চেয়ে মরে যাওয়া আরও ভালো।

এরপর সোবহান দ্রুত উঠে বেরিয়ে যায়। ভেতরের ঘরের জানালা দিয়ে কিরণময়ী সোবহানের প্রস্থান দেখে মায়ার কাছে এসে বলে, কী ব্যাপার, শোভন যে চলে গেল! চা খেয়ে গেল না?

না।

কেন, চা টা তো দিতে পারতি।

– না, মা। ওর আর এ বাড়িতে কিছু খেতে হবে না। এ বাড়িতে কি খেতে হবে না। এ ওর শেষ আসা। ও আর আসবে না এখানে।

– কেন?

অত কথা জিজ্ঞেস করো না।

কিরণময়ীকে জোরে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় মায়া।

রাত দুটো তেরো মিনিটে একটা এসএমএস, বালিশের কিনারে রেখে মোবাইলটা, মায়া ঘুমোচ্ছিল। শব্দ শুনে উঠে এসএমএসটা পড়ে সে। সোবহানের পাঠানো। ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি।

মোবাইলটা বুকের ওপর ধরে মায়া চোখ বোজে। চোখের ধার বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে জল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়ের কথা উঠছে কেন? বিয়ের কথা না উঠতেই পারে। জুলেখা তো বিয়ের কথা তুলছে না। সে তো বেশ আছে। মায়ার কেন বিয়ে করতে হবে? বিয়ে করতে কে চাইছে? সোবহান? নাকি মায়া?

সুরঞ্জনের সঙ্গে আবারও শহর ছাড়িয়ে যেতে যেতে কথা হয় আমার। সুরঞ্জনের উত্তর, মায়া।

— বলো কী? মায়া তো দুচোক্ষে দেখতে পারে না মুসলমানদের।

— ধুত।

— ও-ও আমার মতো। আমারই বোন তো। সব ক্ষোভ ওপরে ওপরে।

— তাই নাকি?

হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে সুরঞ্জনের দিকে স্থির চোখে তাকাই।

—কী বললে? তোমার সব ওপরে ওপরে?

নদী আর সমুদ্রের মোহনায় এসে আমাকে একবার দাঁড়াতেই হয়। গাড়িতে হেলান দিয়ে ফুটপাতের চায়ের দোকান থেকে চা খাই। চিনি-দুধ মিশিয়ে মাটির ভাঁড়ে চা। দুধ-চিনির চা আমার খাওয়ার কথা নয়। কিন্তু খেতে আপত্তি করি না।

জলে রোদ পড়ে চিকচিক করছে। তিরতির করা রুপোলি জলের দিকে তাকিয়ে মন ভালো হয়ে ওঠে আমার। সুরঞ্জনকে আজ খুব কাছের মানুষ বলে মনে হয়। ওপরে ওপরে ক্ষোভ, ভেতরে সে মানবিক একজন, এ কথা আজ স্বীকার করছে সে নিজ মুখে। কিন্তু কিছুটা সংশয় তো থেকে যায়। যে সংশয় দূর করতে প্রশ্ন করি, তাহলে জুলেখার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলে কেন?

– সেটা সাম্প্রদায়িক কারণে নয়।

– কী কারণে?

– একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের যে কারণে মেলে না, সেই কারণে।

– তুমি ঠিক বলছো না।

AMARBOI.COM

সুরঞ্জন চুপ করে থাকে।

– তোমার সঙ্গে জুলেখার এমন কিছু হয়নি, যে কারণে সম্পর্ক শেষ করে দিতে পারো তুমি।

– ওর যোগ্য নই আমি।

– বাজে কথা। এ কথা ভেতরে ভেতরে তুমি ভাবছো না।

– কী ভাবছি, তবে বলো।

– সে তো তুমি বলবে। কী ভাবছো না সেটা শুধু বলতে পারি।

– সেটা বলতে পারলে, কী ভাবছি সেটাও বলতে পারতে।

– এ রকম কোনও কথা নেই।

– কথা আছে।

– যে কোনও মেয়ের সাথে, সে জুলিয়া হোক, জুলেখা হোক, জয়া হোক সম্পর্ক ভাঙতে পারে। আসলে মেয়েই বা বলছি কেন, ছেলেদের সঙ্গেও তো ভাঙে। বেলঘরিয়ায় আমার যারা বন্ধু ছিল, এখনও কি তারা আমার বন্ধু আর?

– একসঙ্গে বেড়াতে গেলে...।

– হ্যাঁ, গেলাম। তাতে কী?

– কী সেটা, যেটার কারণে সম্পর্ক ভাঙতে পারে?

– সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুরঞ্জন উদাসীন গলায় বলে।

– হ্যাঁ, তাই তো! নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

– উফ।

উফ-এর পর আমরা আরও দু কাপ চা নিই। গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রুপোলি জলের মোহনাকে সামনে নিয়ে কথা বলতে থাকি। সে যেমনই কথা হোক, উত্তপ্ত, হচ্ছে তো সুরঞ্জনের সঙ্গেই, যাকে এই মুহূর্তে কাছের মানুষ বলেই ভাবছি।

এবার সুরঞ্জন শুরু করে, তোমার একটু মুসলিমপ্রীতিটা বেশি। আমি চমকে তাকাই ওর দিকে।

– মানে?

– মানেটা বেশ বুঝতে পারছো।

– না, বুঝতে পারছি না।

– বুঝতে পারছো, কিন্তু তুমি জানতে চাইছো আমি কী ভাবছি না ভাবছি। আমি ভাবছি যে এই ভারতবর্ষে এসে তোমার মুসলিমপ্রীতিটা বেশি বেড়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাঁ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলি, মুসলিমপ্রীতি? এটা আবার কী ধরনের শব্দ? বলতে চাইছো ভারতবর্ষে আসার আগে আমার হিন্দুপ্রীতিটা বেশি ছিল?

হ্যাঁ, তাই বলতে চাইছি।

– কেন? 'লজ্জা' লিখেছি বলে?

– হ্যাঁ, তাই।

– শেষ পর্যন্ত তুমিও? সুরঞ্জন?

কিছুক্ষণ থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, –আমার কী মনে হয় জানো? তুমি ইচ্ছে করেই, জেনে বুঝেই আমাকে এমন কথা বলছো, যেন আমি বিরক্ত হই। আমাকে বিরক্ত করে তুমি তো আনন্দ পাও।

– বাজে কথা।

– বাজে কথা নয়। তুমি আমাকে দিনের পর দিন অপমান করো।

– অপমান করি?

– হ্যাঁ করো। করো না? সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে বসে থাকো। সেটা কেন? বারবার এ রকম হচ্ছে। তুমি বোঝাতে চাও যে তুমি কেয়ার করো না। যে কেয়ারটা তুমি পাচ্ছো, যে মানুষ অপেক্ষা করছে তোমার একটা ফোনের জন্য, তাকে বোঝাতে চাও তুমি তাকে মোটেও পাত্তা দাও না। তোমার কিছু যায়-আসে না। তুমি একটা স্যাডিস্ট। মানুষকে কষ্ট দিতে তুমি ভালোবাসো।

– মানুষকে কষ্ট দিতে ভালোবাসি?

সুরঞ্জন জোরে হেসে ওঠে।

ওর বিদঘুটে হাসির দিকে তাকিয়ে থাকি। ও বলে, তুমিও কষ্ট পাও?

– কী মনে হয় আমাকে? মানুষ না?

– জুলেখারও এত টান আমার জন্য নেই। আমার জন্য যত টান তোমার।

– বলো, আরও বলো। বলো যে তোমার প্রেমে আমি এমন হাবুডুবু খাচ্ছি যে, তোমাকে ছাড়া আমি মোহনায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে পারি।

সুরঞ্জন চোখ নাচিয়ে বলে, তা করতেও পারো কিন্তু হেসো না।

– ধরো, তোমার সঙ্গে যদি প্রেম করতেই চাই আমি, করবে না?

সুরঞ্জন মাথা নাড়ে, সে করবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– কেন? অহংকার? কী আছে তোমার এত, যে, আমাকে ফিরিয়ে দেব?

– কিছু নেই বলে ফিরিয়ে দেব।

– কিছুটা কী শুনি? কী কী কিছু বলে মনে করো।

– যার কিছু নেই, সেই জানে কিছু মানে কী। যার অঢেল আছে, সে বুঝবে না।

– অবশেসন। আবারও সে-ই অবশেসন। টাকা টাকা টাকা। ধন-দৌলত। এ ছাড়া আর কিছু বোঝো না তুমি সুরঞ্জন? কী রকম যে পুঁজিপ্রিয় ছেলে তুমি। ভাবা যায় না।

– আমি তো টাকার কথা বলিনি।

– তাহলে কী ইঙ্গিত দিতে চাইছো তুমি? কী তোমার নেই আমার আছে?

– হার্ট আছে।

– তোমার নেই?

সুরঞ্জন ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়ে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। প্রায় দিগন্ত ছোঁয়া জলের দিকে উদাস তাকিয়ে বলে, জুলেখা যেভাবে ভালোবাসে আমাকে, সেভাবে আমি পারি না। আর ওর সঙ্গে সম্পর্কটাও, একসময় লক্ষ করেছি, যেন কেবলই শারীরিক সম্পর্ক হয়ে উঠছে। মন দূর হচ্ছে।

– তোমার মন, না ওর মন?

– দুজনেরই। অথবা শুধু আমার।

– তাহালে কি এ রকম কাউকে পেয়েছো, যার থেকে মন দূর হবে না?

– কাউকে আমি খুঁজছি না।

– কেন?

– কেনই বা সব সময় জুটি নিয়ে থাকতে হবে? প্রেম ছাড়া, সেক্স ছাড়া কি বাঁচা যায় না? বেশ তো আছি আমি। কোনও বোর ফিল করছি না তো! তোমার জীবনেও তো এসব কিছুই এখন নেই। তাই না?

মাথা নাড়ি, হ্যাঁ নেই।

– তাতে কি তুমি হাহাকার করে মরছো? ইমোশন তো তোমার কিছু কম নেই, তুমি তো আর মরে যাচ্ছো না।

– অনেক কিছু আমাদের প্রয়োজন। অথচ অনেক কিছু ছাড়াই আমরা বাঁচি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– আসলে খাবারটা ছাড়া আমাদের কিছু দরকার নেই। বস্ত্র-বাসস্থানেরও দরকার নেই। খাবারটা না খেলে মরবো, তাই বেঁচে থাকতে হলে খেতে হবে। কাপড়-চোপড় না পরলে এই গরম দেশে মরবো না। এ দেশে শীতকালের শীতে আগুন জ্বালিয়ে দিব্যি কাটানো যাবে। আর আকাশের নিচেই দিব্যি বাস করা যায়, বাসস্থানের দরকার হয় না।

– ফলমূল খেয়েই তো বেশ বাঁচা যায়, রান্নাবান্নার দরকার কী?

আমার এই উক্তি বিদ্রূপ নয় তা বুঝতে সুরঞ্জন আমার দিকে চোখ ছোট করে তাকালো।

– গাছের ছাল পরে আমরা সেই আদিকালে ফিরে যাবো, অতীতের বনমানুষদের মতো বাস করবো। তাই না?

সুরঞ্জন সম্ভবত এবার বুঝতে পারলো ওকে আমি সমর্থন করছি না।

– যা বলছিলে বলো, আমার ইমোশন আছে, তার পরও প্রেম ছাড়া আমি বাঁচি। তোমার নেই, তোমার তো আরও ভালো বাঁচার কথা।

– রাইট।

– রাইট।

দুজনে এবার গাড়িতে উঠি। সামনের দিকে আর না গিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে রাইচকের দিকে যেতে থাকি। ওখানে র‍্যাডিসন হোটেলের রেস্তোরাঁয় বসে খাবো দুজন। খুব বেশি কিছু না হলেও চা, টা। র‍্যাডিসনে নেমে সুরঞ্জন বলে– তোমার টাকা খরচের বাতিক আছে। এসব ছাড়ো।

– প্রিয় মানুষের সঙ্গ থাকলে ইমোশানাল হয়ে পড়ি। টাকা-পয়সা তখন তুচ্ছ। তোমাকে নিয়ে একটা ভালো জায়গায় বসবো, এতে কিছু টাকা না হয় গেল, আনন্দ হলো তো অনেক।

– বড়লোকেরা এভাবেই কথা বলে। প্রচুর টাকা দিয়ে পরিবেশ কিনতে চায়।

– না। এর সঙ্গে বড়লোকের সম্পর্ক নেই। ভালোবাসার সম্পর্ক।

– ভালোবাসা থাকলে ওই ফুটপাতের চায়ের দোকানে বসেও আরাম পেতে। টাকা খরচ করে বোঝানোর দরকার নেই তুমি আমাকে ভালোবাসো, বা পরোয়া করো। যে বোঝার এমনিতেই বোঝে।

– তাহলে কী বোঝো তুমি, শুনি?

– বুঝি যে তুমি আমাকে খুব ভালোবাসো।

মুহূর্তে আমার ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

– জুলেখা যত বাসে, তার চেয়েও বেশি বাসো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– এটা ঠিক না। জুলেখা তোমাকে খুব মিস করছে। আমি চাই, তোমাদের সম্পর্কটা আবার আগের মতো হোক।

– মুসলমানপ্রীতি ছাড়ো বলছি।

– বাজে কথা বোলো না। বল যে মানুষপ্রীতি। আমি হিন্দু-মুসলমান দেখি না। আমার কোনও ধর্ম মানি না। ফতোয়া দেওয়া হচ্ছে আমার বিরুদ্ধে, মুসলমানদের জন্য নাকি আমার প্রীতি নেই। আর তুমি নতুন ফতোয়া দিলে। আমি মেয়েদের কথা ভাবছি সুরঞ্জন। জুলেখা আমার কাছে একজন অপ্রেসড মেয়ে। মায়াও ঠিক তেমন। জুলেখা আর মায়াকে কি আমি আলাদা করি? আমার কল্পনার মধ্যেও তো কোনও দিন আসে না এসব। তোমার আসে বলে তুমি ভালো। এখনও নাইনটি নাইন পারসেন্ট লোক ভাবতে পারে না, সত্যিকার ধর্মমুক্ত হওয়া ঠিক কী জিনিস। তোমাকে আমি যতবারই ভাবি তুমি বুঝি ধর্মমুক্ত, দেখি তুমি নও।

– ধর্মমুক্ত তো আরও অনেকে আছে এ শহরে। তাদের সঙ্গে সময় কাটাও। আমার সাথে কেন? কেন এই মোহনা? আমার মতো একটা অপদার্থ, অযোগ্যকে নিয়ে।

– তা ঠিক সুরঞ্জন। মাঝে মাঝে ভাবি এটা আমিও। কেন যে করি...। সম্ভবত এই জন্য করি, যে, ধর্মমুক্ত হলেই যে আমার সবকিছুতে মিলবে তা তো নয়। ধর্মমুক্ত হয়েও মানুষ প্রচণ্ড পুরুষতান্ত্রিক হতে পারে। জানো তো?

আমিও তো। আমিও তো প্রচণ্ড পুরুষতান্ত্রিক। সুরঞ্জন বলে।

– হ্যাঁ, তুমি ধর্মমুক্ত নও এখনও। এখনও পুরুষতান্ত্রিক। তার পরও তোমার সঙ্গ আমার ভালো লাগে।

চা খেতে খেতে সুরঞ্জন ওপারে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বলে, –আমাকে তো খুব উপদেশ দিতে পারো, তাই ভালো লাগে সঙ্গ। ঠিক তোমার দর্শনের সঙ্গে মিলে গেলে তো উপদেশ দেওয়া সম্ভব হতো না।

— হয়তো সে-ই আমাকে তখন উপদেশ দেবে এবং আমার ইগোতে তা লাগবে। কারণ অন্যের উপদেশ সওয়ার মতো উদারতা আমার নেই।

– রাইট।

– রাইট।

এবার দুজনে একটু হেসে নিই। সুরঞ্জনের হাস্যোজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি, চোখে আমার মুগ্ধতা খেলা করার আগেই সুরঞ্জন বলে, দেখ দেখ আবার যেন প্রেমে পড়ে যেও না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেসে উঠি জোরে। হাসতে হাসতে বলি, প্রেমে পড়লে কী হবে শুনি?

– সে একা একা পড়বে। আমি ভাই তোমার প্রেমে পড়ছি না।

– কেন? তুমি অযোগ্য বলে?

– ও তো বিনয়।

– তাহলে কী?

– দেশে থাকাকালীন কী যে সুন্দরী ছিলে! একে ডাক্তার, তার ওপর জনপ্রিয় লেখিকা, তার ওপর সুন্দরী। তোমার দিকে হাঁ করে সমস্ত পুরুষ তাকিয়ে থাকতো। ছিলে স্বপ্নের রানি। আর এখন কী বীভৎস হয়ে উঠেছো! সেই তুমি যে এই তুমি, ভাবতে পারি না। রিয়েল ফেমিনিস্ট হয়ে উঠছো। ফেমিনিস্টরা তো শরীরের দিকে তাকায় না। অসুন্দরী হলে, ছেলেদের কাছ থেকে পাত্তা না পেলে মেয়েরা বেশি বেশি ফেমিনিস্ট হয়।

– ইউ আর এ মিসোজিনিস্ট। এত নারীবিদ্বেষী লোক আমি জীবনে দেখিনি। তুমি যে ভাবো আমার সঙ্গে আর যোগাযোগ করবে না, কারণ তুমি একটা সাম্প্রদায়িক বলেই ভাবো। আমিও কিন্তু মাঝে মাঝেই তোমাকে কমিউনাল ভেবে যোগাযোগ না রাখার কথাও ভাবি।

– কমিউনাল বলছো কেন? তুমি কোন কমিউটিনিটিতে বিলং করো?

– তুমি হিন্দু কমিউনিটিতে করো। সেটা জানি।

– আর তুমি?

– হয়তো ভাবছো যে আমি ভাবছি আমার কমিউনিটি মুসলমান কমিউনিটি। আমার কমিউনিটি সেক্যুলার হিউম্যানস্টদের কমিউনিটি। ধর্মের স্থান সেখানে নেই। সেখানে ধর্মমুক্ত মানবতার স্থান আছে।

সুরঞ্জন মাথা নাড়ে। বুঝে, নাকি না বুঝে— বুঝি না।

হঠাৎ তারপর আমাকে চমকে দিয়ে বলে, চলো আজ রাতে এই হোটেলে কাটিয়ে দিই। রুমগুলো মনে হচ্ছে ভালো।

– গাড়ি আছে। বাড়ি চলে যেতে পারি সহজেই। এ তো জঙ্গল নয় যে, আটকে পড়ে গেছি, যে রাত কাটাতে হবে।

– কেন, বন্ধুর মতো ভালোবেসে রাত কাটানো যায় না, নাকি?

– দুজনে ভদকা খাবো বারান্দায় বসে। সারা রাত গল্প করে কাটিয়ে দেব।

– চমৎকার প্রস্তাব।

– তাহলে হয়ে যাক। সুরঞ্জনের চোখে জলের চিকচিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– না।

– না, কেন?

– আগে মেয়েদের শ্রদ্ধা করতে শেখো। তারপর যত রাত কাটাতে চাও তত রাত কাটানো যাবে।

– শ্রদ্ধা তো করিই। মাকে করি না শ্রদ্ধা?

– সে কী করো, কতটুকু করো, সে তুমি জানো। কিন্তু শ্রদ্ধা তোমার আমার জন্য নেই। জুলেখার জন্য নেই। আরও অনেকের জন্য নেই নিশ্চয়ই।

– তোমাকে শ্রদ্ধা করতে হবে কেন? বয়সে বড় বলে?

– বয়স কোনও কথা নয়। মেয়েদের ওপর মানুষ হিসেবে যে শ্রদ্ধাটা থাকা উচিত সেটা তোমার তো নেইই, তোমার মতো ছেলেদের কাররই নেই। সেটাই হলো সবচেয়ে বড় সমস্যা। জুলেখার প্রতি একটুও কি শ্রদ্ধা তোমার আছে? নেই।

– ওকে শ্রদ্ধা করবো কেন? ও তো আমার প্রেমিকা। ওকে ভালোবাসি।

– রেসপেক্ট না করলে কিছু করা যায় না। রেসপেক্ট নেই, তাই ভালোবাসা টেকে না। রেসপেক্টটা হলো ফাউন্ডেশন, যার ওপর তুমি ভালোবাসার ইমারত গড়বে। রেসপেক্ট না থাকলে সবই তোমার টেমপোরারি, আর্টিফিশিয়াল।

সুরঞ্জনকে তাড়া দিয়ে উঠিয়ে নিই। পথে যেতে যেতে বলি,– তাহলে সোবহানের সঙ্গে মায়ার বিয়ে হচ্ছে। অবিশ্বাস্য!

– কী হবে জানি না। তবে মায়ার জন্য বিয়েটা বোধহয় খুব দরকারি। ওর মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ও একটা ইমোশনাল সাপোর্ট চায়। যা গেছে ওর জীবনে, একজন ওর খুব পাশে না থাকলে ও বোধহয় আর পারবে না চালিয়ে যেতে। এদিকে দুটো তো আবার বাচ্চা করে নিয়েছে। ওদের দেখবে, নাকি নিজের জীবনটা দেখবে?

– সোবহান কি এই ভুলটা করবে? জেনেশুনে?

– সোবহান ফেঁসে গেছে। সুরঞ্জন হেসে বলে।

– বন্ধু হিসেবে তোমার কী মত? কী পরামর্শ দেবে তুমি সোবহানকে?

– বলবো বিয়ে না করতে।

– বলো কী? তোমার বোন চাইছে।

– বোন হলেই কি আমি আরেক ছেলের সর্বনাশ চাইবো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– সো মিসোজিনিস্ট ইউ আর!

– সোবহানের লাইফ শেষ হয়ে যাবে। সে না তার বাড়ির কারও সঙ্গে থাকতে পারবে। না থাকতে পারবে মায়ার সঙ্গে। মায়া তার দুই বাচ্চার স্বার্থটা সবার আগে দেখবে। সোবহানকে সে চায়, সোবহানের টাকা আছে বলে। আর অন্য কিছুর জন্য, আমার মনে হয় না।

– প্রেম-ট্রেম কিছু নেই?

– আছে। সে সোবহানের আছে। জীবনে বোধহয় প্রথম প্রেমে পড়লো। আমি জুলেখার সাথে চাইছিলাম ওর প্রেম হোক।

– কেন? দুজনে মুসলমান বলে?

– হ্যাঁ।

—কবে মানুষ হবে সুরঞ্জন?

সুরঞ্জন জানালা খুলে দূরে তাকিয়ে থাকে নদীর দিকে। হু হু হাওয়া এসে ওর চুল উড়িয়ে দিতে থাকে। সেই হাওয়া ভাসিয়ে নিতে থাকে তার স্বর, মানুষ হওয়া বুঝি এ জীবনে আমার আর হবে না।

– একটা ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্সে ভুগছো তুমি। দেখো, হঠাৎ আবার যেন সুইসাইড করে বোসো না।

– করতেও পারি।

– রিলেশনগুলোর মূল্য যখন কোনও মানুষের কাছে থাকে না, তখন সে যে কোনও সময় হয় যে কাউকে খুন করতে পারে, নয়তো নিজেকে খুন করতে পারে।

সুরঞ্জন মিষ্টি হেসে বলে, তোমাকে মারবো না কোনও দিন, মাই ডিয়ার। মারলে নিজেকেই মারবো।

– ডোন্ট ডু দ্যাট।

– হোয়াটস ইওর প্রবলেম? না হতে দেবার তুমি কে?

– আমি অনেক কিছু। জোরেই বলি। কমপ্লেক্স ফ্রাসট্রেশান এসব দূর করো, সুরঞ্জন। না হলে তোমার বিপদ হবে।

সুরঞ্জন বলে, আমাকে নিয়ে একটু কম ভাবো প্লিজ! আমি কে?

আমি কেউ না। কিছু না। আমার জীবনের কোনও মূল্য নেই। সাধারণও এত ব্রাডি সাধারণ নয়। তুমি অসাধারণ। তুমি সেলিব্রেটি। তুমি আমাকে নিয়ে ভেবে ফালতু সময় নষ্ট করছো। তাই তোমার সঙ্গে আমি দেখা করি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনের ভিড়, নোংরা আর দারিদ্র্যের মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে বলি, তাই বুঝি তুমি হারিয়ে যাও অমন বারবার?

– ধুত এখনই বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না।

– তাহলে যাবে কোথায়?

– সুন্দরবন চলো।

– পথ চিনি না।

– চিনিয়ে নেব।

– ইচ্ছে করছে না।

– তুমি তো আবার ইচ্ছের দাস।

সুরঞ্জনের এই কথা আমার ঠোঁটে এক চিলতে হাসি এনে দেয়।

– শোনো, অন্যের ইচ্ছের দাস হওয়ার চেয়ে নিজের ইচ্ছের দাস হওয়া ঢের ভালো।

– আমার গাড়ি থাকলে, আমার হাতে স্টিয়ারিং থাকলে তোমাকে আমার ইচ্ছের দাস হতে হতো।

– কী করতে?

– সুন্দরবন গিয়ে বাঘের জঙ্গলে তোমাকে নিয়ে শুয়ে থাকতাম?

– বাঘ এলে?

– বাঘ এলে তুমি পড়ে থাকবে জানি, আমি গাছে উঠে যাবো।

সুরঞ্জন হাসলো না। আমি হাসতে হাসতে বললাম, এটা বোধহয় সত্যিই তোমার চরিত্র।

– সত্যিই তো। এটাই আমার চরিত্র। না হলে জুলেখাকে ডাম্প করি? তোমাকে এই চরিত্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই। তোমাকে ডাম্প করা আমার প্রাণে সইবে না। তার চেয়ে এই ভালো, বছরে দু-চারবার দেখা হবে। যার যার ইচ্ছের দাস হব। ব্যস।

– ব্যস। কাল থেকে সব যোগাযোগ বন্ধ।

– রাইট।

– রাইট।

পথে যেতে যেতে আবার মায়ার কথা ওঠে। বিয়েতে সুরঞ্জন বাধা দেবে। সে মনে করে মায়ার মাথার দোষ দেখা দিয়েছে। তার সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো দরকার। দাম্পত্য সুখ পেতে সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ছকে বাঁধা একটা জীবন যে করেই হোক চাইছে সে। যে স্বপ্নটা কিশোরী বয়সে দেখতো, সেই স্বপ্ন সফল করতে ভেতরের যে ক্ষোভ, তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই স্বপ্ন দিয়ে আড়াল করেছে। কিন্তু তা যে একদিন বেরিয়ে আসবে না, তা কে বলবে?

– সুরঞ্জন, সোবহান তো মায়াকে বাংলাদেশে রেপ করেনি। নাকি করেছে?

– করেনি।

– তবে?

– সব মুসলমানকে এক করে দেখার মানসিকতা যেমন হিন্দুদের আছে, সব হিন্দুকে এক করে দেখার মানসিকতা মুসলমানেরও আছে।

– জেনারালাইজ তো তারা করে...

সুরঞ্জন শেষ করে বাকিটা, যারা বোকা। তাই না?

– আমরা তো বোকা।

– না। না। না। বোকা নও।

– তাহলে কনক্লুশান হলো, চালাকরা বা বুদ্ধিমানরা সাম্প্রদায়িক হয়।

আমি চুপ হয়ে থাকি। সুরঞ্জনের মন কখন ঠিক কোন দিকে যায় ঠিক ধরা যায় না। ওকে কখনও মনে হয় বেশ চিনি, আবার পর মুহূর্তেই মনে হয়, মোটেও চিনি না। আমার চিন্তা-ভাবনা, আমার আদর্শ-বিশ্বাস সম্পর্কে ওর যে স্পষ্ট কোনও ধারণা নেই, তা আমি এর মধ্যে বেশ বুঝেছি। ও আমার লেখা 'লজ্জা' ছাড়া আর যে দু-একটি বই পড়েছে, বলেছে তার ভালো লাগেনি। গুজরাট, প্যালেস্টাইনীন, আফগানিস্তানের ও ইরাকের মুসলিমদের পক্ষে, বাংলাদেশের হিন্দুদের পক্ষে, পাকিস্তানের খ্রিস্টানদের পক্ষে, ইউরোপের ইহুদিদের পক্ষে কথা বলি, যখনই মানুষ তাদের ধর্মবিশ্বাসের কারণে অত্যাচারিত হয়, আমি পাশে দাঁড়াই অত্যাচারিতের। আমি বিশ্বাস করি, কারও ধর্মবিশ্বাস কারও পরিচয় নয়। তারা মানুষ, এই তাদের পরিচয়।

শুনেও সুরঞ্জন নির্লিপ্ত থাকে। সে তার ধারণা পাল্টায় না। সে মনে করে, এটা খুব সিম্পলিফিকেশন হয়ে যাচ্ছে। সেই মরালিটি লেসনের মতো। ঈশপের গল্পের মতো। অত্যাচারীর পক্ষ নিও, অত্যাচারীকে মার দিও।

সুরঞ্জনের বক্তব্য– মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দ আছে। মৌলবাদীদের মধ্যেও ফারাক আছে। মুসলিমরা যত কট্টর হতে পারে, হিন্দুরা বা খ্রিস্টানরা তত হতে পারে না।

—তাই কি? আমি বলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরঞ্জন জোর দিয়ে বলে– হ্যাঁ, তাই। তুমি ভেবো না আমার ভেতরে কোনও গোপন হিন্দুপ্রেম থেকে এ কথা বলছি। এটা ফ্যাক্ট। একেশ্বরবাদী ধর্মগুলো সব সময় বহুঈশ্বরবাদী ধর্ম থেকে হিংস্র বেশি। সুতরাং সব ধর্মকে এক চোখে দেখা, সব রিলিজিয়াস প্যানাটিকদের এক কাতারে ফেলা তোমার মানববাদী রাজনীতির জন্য ভালো হয়তো কিন্তু ইতিহাসের জন্য ভালো নয়। সেখানে তুমি জিরো পাবে।

সুরঞ্জনের প্রথম দিককার আচরণ এবং এখনকার আচরণে অনেক তফাত। খুব আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলে। আগের চেয়ে কণ্ঠে তার সহজতা, যেন অনেককাল আমাদের আলাপ।

– ডায়মন্ড হারবারে আমার দুজন বন্ধু আছে। যাবে নাকি কারও বাড়ি? আমি জিজ্ঞেস করি।

– কারা তারা?

– শাকিল আহমেদ।

– মুসলমান?

– শাট আপ।

– হিন্দু?

– শাট আপ।

– এত শাট আপ, শাট আপ করো না। এত হিন্দু-মুসলমান নিয়ে উত্তেজিত হয়ো না, আমাকেও করো না। তার চেয়ে অন্য কথা বলি চলো। ভালোবাসার কথা বলি।

– ভালোবাসার কথাই তো দিন-রাত বলছি। ভালোবাসি বলেই তো মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখি।

– ছোঃ।

– ছোঃ কেন? কী জানো সুরঞ্জন? তোমাকে আমি এত বেশি ক্ষমা করে দিই। এত বেশি মাথায় তুলি যে তুমি তোমার যা খুশি তাই করতে পারো আমার সঙ্গে। যা খুশি তাই বলতে পারো। অন্যায়কেও জোর গলায় ন্যায় বলে ঘোষণা করতে পারো।

– হ্যাঁ, পারি। মাথায় তুলো না। মাথা থেকে নামিয়ে দাও। মিটে গেল।

ডায়মন্ড হারবারের একটা বাড়ির দরজার সামনে গাড়ি থামালাম।

— কার বাড়ি, সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো।

বললাম, মানুষের বাড়ি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরঞ্জন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, তুমি যে শিয়াল-শকুনের বাড়ি আসোনি, তা তো জানিই।

ওর কাঁধ ঝাঁকানো ভঙ্গি দেখলে আমার বড় বিরক্তি লাগে। সুরঞ্জনকে দেখতে যতটা নিরীহ মনে হয়, তত নয় সে। কিছুদিন মিশলেই ওর ভেতর থেকে একটা কানা খোঁড়া সাপ বেরিয়ে আসে। আমার যেভাবে ওর ভেতরটাকে দেখা, জুলেখা বোধহয় দেখেছে সেটা। আমার মতো করে না হলেও। তার মতো করে।

ফোন করতেই বাড়ির ভেতর থেকে মহুয়া চৌধুরী বেরিয়ে আসে। বাইশ-তেইশ বছর বয়সে। দীর্ঘাঙ্গী। এই সমাজে যে মেয়েদের একবাক্যে সুন্দরী বলে রায় দেয়, মেয়েটি তেমন। পরনে জিনস। আর ছোট সাদা জামা। গাড়ির কাছে এসে প্রায় টানাটানি করতে লাগলো। আমাকে সে নেবেই ভেতরে। গাড়ির বাইরে বেরিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলে, কথা আর কী, যাবো না বাড়ির ভেতর, বলো কেমন আছো, কী করছো, ভেতরে এসো, কেউ যদি জানে যে তুমি এসেছো, সব ছুটে আসবে, পাঁচ মিনিটের জন্য এসো, অনেক দিন দেখা হয় না, এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার ঢুঁ দিই। ও সুরঞ্জন, আমার বন্ধু, আবৃত্তির কাজ ভালো চলছে, সামনে একটা প্রোগ্রাম আছে, তার বাড়িতে আবৃত্তি শেখাবে, তুমি চলে যেও গলফ গ্রিনে তার বাড়িতে। এই সব টুকটাক কথার পর যখন রাস্তায় লোক জমে যেতে শুরু করলো ডায়মন্ড হারবার ইংলিশ আবৃত্তি ব্যান্ডের তরুণীর উচ্ছ্বাসকে আলিঙ্গনের ছোঁয়া দিয়ে বিদায় নিই।

সুরঞ্জন প্রথম কথাই বলে– এটাকে জোগাড় করলে কী করে?

– এটাকে মানে? এটা কী?

– মেয়েটাকে।

– বলো মেয়েটা। এটা-ওটা করছো কেন?

– আমি তো মালটাকে বলতে পারতাম। বলতে পারতাম মালটাকে জোগাড় করলে কী করে। বলতে পারতাম ও বেশ খাসা মাল। বলিনি।

– বাঁচিয়েছো। মেয়েটা ভীষণ বাঁচা বেঁচে গেছে তুমি বলোনি বলে।

সুরঞ্জন খুক খুক করে হাসতে থাকে। ইচ্ছে হয় ওর গালে জোরে একটা চড় মারি।

গাড়িতে জোরে গান চালিয়ে দিয়ে হাওয়ার বেগে গাড়ি চালাই। ওর সঙ্গে কথা বলতে আমার ইচ্ছে করে না। পাঁচ মিনিট পর হয়। এরপর, গানের শব্দ কমিয়ে দিয়ে বলে, শান্ত হও। আমি মানুষটা খারাপ নই। এমনি তোমাকে রাগাবার জন্য...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– আমাকে রাগাবে কেন? আমাকে রাগিয়ে তোমার লাভ কী? রাগানোর প্রশ্নই বা উঠছে কেন?

– না রাগলে খুব প্রেমিকার মতো আচরণ করো। রাগলে তুমি খুব নারীবাদী হয়ে ওঠো।

ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে ফাঁক শব্দটি। ইচ্ছে হয় অন্ধকার রাস্তায় ওকে ধাক্কা মেরে গাড়ি থেকে ফেলে আমি চলে যাই। মেইল শভেনিস্ট পিগ বললে জানি হেসে উঠবে। বলি না।

– মেয়েটার ফোন নম্বরটা দিও তো। সুরঞ্জন বলে।

– কেন, প্রেম করতে চাও?

– হ্যাঁ।

– কী করে করবে? ও তো মুসলমান।

– মুসলমান?

– হ্যাঁ।

– কিন্তু নাম যে মহুয়া চৌধুরী।

– হ্যাঁ। মুসলমানের নাম এমন থাকে না? জন্মেছিলে তো বাংলাদেশে। আজকালকার কোন মেয়ের নাম তুমি খাদিজা রহিমা আয়শা দেখেছো?

সুরঞ্জন মাথা নাড়ে। ঠিক তাই। মহুয়া চৌধুরী মুসলমানের নাম হতেই পারে। শুধু চৌধুরী কেন, বিশ্বাস, মজুমদার, তরফদার, সরকার, মণ্ডল এসব সবই তো সে দেখেছে মুসলমানের পদবি। আরবি নাম ছেড়ে নতুন ছেলেমেয়েদের বাংলা নাম রাখা হচ্ছে। বাংলা নাম, যদি লোকে ভাবে, হিন্দুর বাপের সম্পত্তি তাহলে তো ভুল করা হবে।

– তুমি মাঝে মাঝে খুব মুসলমানের মতো আচরণ করো। সুরঞ্জন বলে।

আমাদের কথায় এত বেশি হিন্দু, এত বেশি মুসলমান এসে যায়, আমার ভয় হয়, সমুদ্র ছেড়ে কুয়োয় এসে বাকি জীবন হাবুডুবু খেতে হয় কিনা।

– আমি সেক্যুলার-এর মতো আচরণ করছি। পিওর নাস্তিকের মতো আচরণ। কিন্তু নাস্তিক বেশি দেখো না বলে আইদার হিন্দু অর মুসলমান দেখো। আর কিছু দেখার চোখ ছিল যেটি, সেটিতে ছানি পড়েছে।

বলতে থাকি– ভারতের ভাগটা ঠেকানো যেত। ঠেকানোর তেমন চেষ্টা করা হয়নি। ভারত ভাগের কোনও দরকার ছিল না। চারদিকের দাঙ্গা সাম্প্রদায়িকতা দেখে আমার মনে হয় যে ধর্মের ভিত্তিতেই যদি ভাগ করেছিল দেশ, তবে ভালোভাবেই ভাগ করলো না কেন? সব মুসলমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানে চলে যাও, সব হিন্দু তল্পিতল্পা গুটিয়ে ভারতে চলে এসো। এই তো ছিল ব্যাপারটা। বাধ্যতামূলক হতো যদি ব্যাপারটা, আজ এত অশান্তি হয় না। এখানে জাতবর্ণপ্রথা নিয়ে মারামারি হতো। ওখানে মুসলমানে মুসলমানে লাগতো। শিয়া-সুন্নি, আহমদি-কাদিয়ানি কম ভাগ আছে মুসলমানে? একদল আরেকদলের শত্রু। মরে প্রচুর শেষ হলে দু দেশে যারা বাকি থাকতো, তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়ার হয়তো সম্ভাবনা ছিল। সব ভেস্তে গেল।

সুরঞ্জন মৃদু স্বরে বললো, এটা তোমার মনের কথা নয়। তুমি দেশের বাউন্ড্যারিতেই বিশ্বাস করো না, ধর্মে বিশ্বাস করো না। তুমি দেশ ভাগ নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন? তুমি তো, কোথায় যেন পড়েছিলাম, মানুষকে পৃথিবীর সন্তান বলে মনে করো। যার যেখানে বাস করার ইচ্ছে, সে সেখানে বাস করবে। পৃথিবীটা সবার।

সুরঞ্জন আবদার করলো গাঁজা খাবে। গাঁজা কোথায় মেলে, তা আমি জানি না। গাঁজা তাকে আমি খাওয়াতে পারবো না জানিয়ে দিই। পার্ক সার্কাসের কোনও অলিগলির নাম বললো— সেখানে গাঁজা মিলবে। অলিগলিতে গিয়ে গাঁজা কেনার আমার কোনও ইচ্ছে নেই। নিরাপত্তারক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে বেরিয়েছি। আমার পক্ষে পার্ক সার্কাস এলাকায় একা একা আনোগোনা করা সম্ভব নয়। এবার সুরঞ্জনের আবদার, আমার বাড়িতে সে রাতের খাবার খাবে। বাড়িতে এমন কিছু নেই খাবার। মিডলটন রোডের একটা রেস্তোরাঁয় খেয়ে সুরঞ্জনকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আমি যখন বাড়ি ফিরি, রাত সাড়ে বারো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলেখার সঙ্গে মায়া শেষ পর্যন্ত মুখোমুখি হয়। তার আবদার, সোবহানকে যেন জুলেখা বিরক্ত না করে, এত বন্ধু বলেও না ভাবে। সোবহানকে জুলেখা যদি মুক্তি দেয়; তবে সুরঞ্জনের সঙ্গে তার সম্পর্কে সে কোনো বাধা দেবে না।

জুলেখা মায়াকে হোস্টেলের ঘরে নিয়ে যায়। মুড়ি ভেজে নেয় ঘরেই, ঘরেই চা বানিয়ে দুজন খায়। মায়ার অভিযোগ-অনুযোগ, অনুরোধ-উপরোধ ইত্যাদি সব শোনার পর জুলেখা বলে, শোনো মায়া, তুমিও জীবন দেখেছো, আমিও দেখেছি। আমার মনে হয় ছেলেদের নিয়ে কাড়াকাড়ি করার চাইতে আমাদের আরও বড় কাজ আছে। আমি আপাতত সুরঞ্জন বা সোবহান কাউকে নিয়ে ভাবছি না। নিজের পায়ের তলায় শক্ত মাটি গড়তেই আমি ব্যস্ত। কোনও পুরুষ লোকের জন্য আমি নিজের কাজে ব্যাঘাত ঘটাবো না। আর প্রেম-ভালোবাসা, যার জন্য কত নাটক কত গান কত কবিতা, সবই, যা দেখেছি, ক্ষণিকের। সুরঞ্জনের সঙ্গে কখনও আমার সম্পর্ক ভাঙবে এ আমি বিশ্বাস করিনি। সবচেয়ে স্ট্রেঞ্জ যে, আমাদের সম্পর্কটা ভাঙার পেছনে কোনো কারণ নেই। দুজনের প্রতি দুজনের প্রেম যখন তুঙ্গে। তখনই ভাঙলো। দেখবে ভালো খেলোয়াড়রা চায়, টপে থাকা অবস্থায় বিদায় নিতে।

— সোবহানকে পাওয়ার জন্য তুমি সুরঞ্জনকে ছেড়ে দিয়েছো। তোমার মতো সুবিধেবাদী মেয়ে আমি অনেক দেখেছি। যাচ্ছেতাই। দাদার মতো এমন অনেস্ট একজন মানুষ তুমি আজকের যুগে পাবে? যেই না সিনে একটা সোবহান এসে গেলো, তুমি তার দিকে হাত বাড়ালে। এত লোভী তুমি।

– লোভী আমি নই, লোভী তুমি। তুমি তো কোনও দিন সুরঞ্জনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সহ্য করোনি। হঠাৎ এখন পাল্টে গেলে কেন? কারণ সোবহানকে তোমার দরকার। এখন আর তোমার দাদা কোন জাতের কার সঙ্গে কী করছে সে নিয়ে তোমার আর মাথাব্যথা নেই।

– আমার দাদাকে নিয়ে বাজে কথা বলবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলেখা তেতে উঠলো। তোমার ওই রেপিস্ট ভাইকে আমি আঁকড়ে ধরেছিলাম, কারণ আমি ভেবেছিলাম, আমি নষ্ট হয়ে গেছি, সমাজে আমার আর কোনও মূল্য নেই, আমি মৃত, আমি একটা নর্দমার কীট, আবর্জনার স্তূপ। তা ছাড়া কেন আমি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে জীবন জড়াতে চাইবো? কে সে? কী সে? রেপড হলে জীবন ফুরিয়ে যায়? নিজের ওপর আমার ঘেন্না ছিলো বলে আমি সুরঞ্জনের মতো ছেলের কাছে ভিড়েছিলাম। সেক্স এসটিম বলে কিছু ছিল আমার। আমি এখন আর নিজেকে ঘেন্না করি না। তোমার ভাই হলো বহুরূপী। আজ রেপিস্ট, কাল ফেমিনিস্ট। ওকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে বলো।

মায়া স্তব্ধ হয়ে থাকে। সে জানতে চায় না, সুরঞ্জনকে রেপিস্ট কেন বলছে জুলেখা। কিরণময়ীর কাছে যতটুকু শুনেছে সুরঞ্জন আর জুলেখার সম্পর্কের কথা, ওতে জোর-জবরদস্তির কোনও ব্যাপার আছে বলে মনে হয় না। মায়া ভাবে, মানুষের মাথায় রক্ত চড়লে সত্য-মিথ্যে মিলিয়ে খিস্তি করে। মাথা ঠাণ্ডা হলে জুলেখা নিশ্চয়ই রেপিস্ট শব্দটা আর উচ্চারণ করবে না।

মায়া অনুমান করে, জুলেখা তার অতীত থেকে দূরে সরতে চাইছে। সাফ সাফ জানিয়ে দেয়, সোবহানকে নিয়ে মায়া যা খুশি তাই করতে পারে, এতে তার কিছু যায়-আসে না। জুলেখার সঙ্গে সুরঞ্জনের যোগাযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। সুরঞ্জন মোবাইল ফোন ব্যবহার করে না আজকাল। করলে হয়তো মাঝে মাঝে ফোনে কথা হতে পারতো। আসলে এ সম্পর্কে এখন আর এমন কিছু অবশিষ্ট নেই, যেটা থেকে আবার গড়ে উঠতে পারে কিছু। মায়ার মায়াই হয়, কারণে হোক অকারণে হোক, কোনও সম্পর্ক ভেঙে গেলে। নিজে যে সে চলে এসেছে স্বামীর কাছ থেকে। এ ঘটনাও তাকে মন খারাপ করিয়ে দেয়।

জুলেখা চাকরি-বাকরি-পড়াশোনা নিয়ে থাকে। আর থাকে ময়ূর নিয়ে। ময়ূরের মতো আরও মেয়ের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব বাড়ছে। ইতিমধ্যে হোস্টেলের ভেতরই জুলেখা 'সাহসিনী' বলে একটি দল গড়ে তুলছে। প্রতি রাতে 'সাহসিনী'র সভা হয়। 'সাহসিনী'তে যোগ দিতে লিফলেট বিলি করা হয়েছে। সদস্য সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। 'সাহসিনী' মেয়েদের পরামর্শ দিচ্ছে মেয়েরা যেন পরস্পরের মধ্যে নিজেদের শক্তি বিতরণ করে। একজনের বিপদে আরেকজন যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে। একজনের অসম্মানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরেকজন রুখে দাঁড়ায়। ফিমেইল ইউনিটি। এটি না থাকা মানে কিছুই না থাকা। এটি থাকলে যেসব মেয়ে নত হয় থাকতে বাধ্য হচ্ছে, পরনির্ভর হতে বাধ্য হচ্ছে, নিজের পরিচয় হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে, তারা খুব একাকীত্ববোধ করবে না, জানবে যে সঙ্গে কেউ আছে, যার কাঁধে ভর রেখে দাঁড়ানো যায়, যার হাত ধরে ভূলুণ্ঠিত অবস্থা থেকে ওঠা যায়। চাকরি ক্ষেত্রে মালিক যদি কুপ্রস্তাব দেয়, 'সাহসিনী' থেকে সাবধানবাণীর চিঠি পৌঁছে যাবে কোম্পানিতে, প্রয়োজনে মামলা করবে 'সাহসিনী'। দলে উকিল আছে তিনজন। কোনও মেয়ে পরীক্ষার ফি দিতে না পারলে, চাঁদা তুলে সেই ফি জোগাড় করা হবে। দলে ডাক্তার আছে চারজন। যে কারও অসুখ হলে বিনে পয়সায় চিকিৎসা করবে। জুলেখা আর মৃত্তিকা গুহ, আলিপুর কোর্টের এক উকিল শুরু করেছিল 'সাহসিনী' নামের দলটা। তারপর উৎসাহী যারাই এসেছে, নতুন নতুন প্রস্তাব দিয়েছে। জুলেখার বয়সী মেয়ে যেমন আছে, ময়ূর-এর বয়সী মেয়েও আছে। রাত আটটায় সভা বসে, আগে মৃত্তিকার ঘরে বসতো, নয়তো জুলেখার ঘরে, পরে দল ভারী হয়ে যাওয়ার পর খাবার ঘরে।

মায়া মন দিয়ে জুলেখার 'সাহসিনী'র গল্প শোনে। সুরঞ্জন নিয়ে বা সোবহান নিয়ে জুলেখা আর আগ্রহী নয়। ওদের নিয়ে কোনও গল্পও আর শোনায় না।

তোমার জীবনের পরিকল্পনা কী? মায়া জিজ্ঞেস করে।

জুলেখা বলে, 'সাহসিনী'কে আরও বড় একটা অরগানাইজেশন করে তোলা। এই দলটাকে হোস্টেল ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। অলরেডি মৈত্রী বলে একটা যে দল আছে, ওদের কারও কারও সঙ্গে কথা বলাও হয়ে গেছে। নেক্সট মিটিং-এ আমরা ওদের দুজনকে ডাকছি। শহরে যে দলগুলো আছে, খুব অ্যাকটিভ না; সব সংসার নিয়ে, স্বামী নিয়ে, বাচ্চা-কাচ্চার পেছনে সময় নষ্ট করে; আমাদের তো সেই ঝামেলা নেই। তাই সবাইকে অ্যাকটিভ করার জন্য আমরাই উদ্যোগ নিচ্ছি। মেয়েদের একটা ইস্যু নিয়ে পথে বের হব, মৈত্রীও সঙ্গে থাকবে। এ রকম একটা ভাবনা আছে।

– কী হবে এসব করে?

– মেয়ে তো আমি। মেয়েদের জীবনটা তো দেখা হয়েছে। আমার তো খুব চমৎকার একটা প্রেমিক ছিল। বন্ধু ছিল। যেই না আমি একটা কিছু করবো, একটা জব খুঁজে বেড়াচ্ছি। কোথাও মাথা গোঁজার ঠাঁই দরকার। প্রেমিক গা ঢাকা দিল। জুলেখা হেসে উঠলো হো হো করে। প্রচণ্ড প্রেম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকা অবস্থাতেই যদি প্রেমিক পালিয়ে যায় কোনও একটা দায়িত্ব নিতে হবে ভয়ে, তবে দুনিয়ায় কাকে তুমি বিশ্বাস করবে? আমি আমার স্বামীকেও দেখেছি। এদের আমার মানুষ বলে মনে হয় না। সত্যি কথা বলি, কোনও পুরুষকে আমি বিশ্বাস করি না। পুরুষ যদি বন্ধু হতে চায়, হবো, হৈ হৈ করবো, নাচবো, গাইবো, ব্যস। এর বেশি না। সম্পর্ক গড়ার মতো ভুল আমি প্রায় করতে নিয়েছিলাম, করবো না।

– আর সোবহান? মায়া উদগ্রীব হয়ে থাকে উত্তর শোনার জন্য।

চা শেষ হয়ে গেলে জুলেখা নিজে আবার চা করে।

– সত্যি কথা বলতে গেলে, সোবহানকে আমি বেশি দিন দেখিনি। আমি তার সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে পারবো না। সুরঞ্জন চেয়েছিল সোবহানের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক হোক। আশ্চর্য, এভাবে হয় নাকি? কেউ কি কাউকে জোর করতে পারে সম্পর্ক করার জন্য? কতটা স্টুপিড হলে বলতে পারে। আর নিজের প্রেমিক যদি বলে, বলে যে যাও ওই লোকটার সঙ্গে প্রেম করো গিয়ে? কতটা পাষণ্ড হলে তা করে লোকে, বলো? আমার সঙ্গে সোবহানের নাকি মানাবে ভালো। উনি দেবদাস হচ্ছেন। আরে বাবা, মুসলমান হলেই কি মুসলমানের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে? আমার স্বামীও তো মুসলমান ছিল। তাতে কী হয়েছে? পুরুষ হলো পুরুষ, মায়া। সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রিস্টান হোক, ইহুদি হোক, বৌদ্ধ হোক— সে পুরুষ। পুরুষগুলো তো পুরুষশাসিত সমাজে বাস করে, তারা তো সব সুবিধে ভোগ করছে সমাজের। মেয়েদের কোনও জায়গা আছে এই সমাজে? আমাকে কি কম কষ্ট পোহাতে হয়েছে, এই যে আজ যেখানে আমি, সেখানে আসতে!

মায়া খুব ভয়ে ভয়েই এসেছিলো জুলেখার কাছে। ভেবেছিলো জুলেখা তাকে দেখেই যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগালি করে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু দিব্যি আদর করে বসিয়ে চা খাওয়াচ্ছে। যে গল্পগুলো জুলেখা করছে, মায়ার বিশ্বাস হতে চায় না যে গল্পগুলো জুলেখা করছে, মায়ার বিশ্বাস হতে চায় না যে গল্পগুলোয় পুরুষের কোনও বিষয় নেই। সবই মেয়েদের কথা। হোস্টেলের কোন মেয়ে কেমন, 'সাহসিনী'তে কজন সদস্য, তারা কে কী করছে।

– আচ্ছা সোবহানকে যে আমি বিয়ে করতে চাইছি, সে ব্যাপারে তুমি কিছু বলবে? তোমার কোনও আপত্তি আছে...?

জুলেখা হেসে বললো,– আমার আপত্তি থাকবে কেন? আমি কে সোবহানের? তুমি সোবহানের বউকে জিজ্ঞেস করো গিয়ে তার আপত্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে কিনা। অবশ্য আপত্তি থাকলেই বা কী? তোমাদের বিয়ে করতে তো বাধবে না। মুসলমানের তো আবার চারটে বউ থাকতে পারে।

বলে জুলেখা জোরে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে,

ডিসগাস্টিং।

– চৌদ্দশ বছর আগের আইন এখনও এ যুগে চলছে। আর মানুষেরা দিব্যি বগল বাজিয়ে ইসলাম কী ভালো ইসলাম কী ভালো বলে নাচছে। মুসলমান তো নাচছেই, হিন্দুও নাচছে। হিন্দুরা আবার না নাচলে তাদের সেক্যুলার না বলে যদি কেউ...।

ঘেন্না ধরে গেছে এসব দেখে।

– তুমি খুব তসলিমা নাসরিনের মতো করে কথা বলছো।

– কী রকম?

– ওই যে পুরুষশাসিত সমাজ, সেক্যুলার...

জুলেখা বলে, হ্যাঁ, আমি তার খুব ভক্ত। তার সাথে আমার রেগুলার কথা হয়।

– উনি তো এখন দাদার সঙ্গে নাকি খুব ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

– তা ঘুরতেই পারেন। মনে হয় একটা উপন্যাস লিখেছেন। তুমি দেখা করোনি?

– নাহ। তবে বিয়েতে নেমন্তন্ন করবো ভাবছি।

– আমিও ভাবছি 'সাহসিনী'র প্রথম অনুষ্ঠানটা তাকে দিয়ে উদ্বোধন করাবো।

– বাহ্।

– কিন্তু সহজ না। হোস্টেলের কিছু মুসলমান মেয়ে তাকে একেবারে সহ্য করতে পারে না।

– কেন? মুসলমান মুসলমানকে সহ্য করতে পারে না।

জুলেখা হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে মায়ার দিকে।

– তুমি কোন জগতে বাস করো হে মেয়ে?

মায়া অপ্রস্তুত বোধ করে।

– মুসলমানরা ফতোয়া দিচ্ছে। লেখক নিজের দেশে থাকতে পারলো না। ইন্ডিয়ান মুসলিমরাও পাঁচ লাখ টাকা ঘোষণা করছে তার মাথার দাম।

মায়া ঠোঁট উল্টে বলে, মুসলমানদের ব্যাপারটা ঠিক বুঝি না।

– বোঝো না, ঠিক না। বুঝতে চাও না। অথবা বুঝেও না বোঝার ভান করো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ার মুখটায় মেঘ নেমে আসে।

জুলেখা বলে, হিন্দু আর মুসলমানদের জন্য আলাদা আইন।

হিন্দু আইনে হিন্দু মেয়েরা অধিকার পাবে, মুসলমান আইনে পাবে মুসলমান মেয়েরা, তা পাবে না। এটা কি সভ্য দেশে হতে পারে? এক আইন হওয়া উচিত নয় সবার জন্য?

মায়া বলে, কেন মুসলিম আইনের বিপক্ষে বলছো? তুমি তো মুসলমান।

– তাতে কী? অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য হিন্দু বা মুসলিম হতে হয় না, বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হতে হয়।

– শুনেছি, মুসলমানরাই চায় না আইন পাল্টাতে।

– বলো যে মৌলবাদীরা চায় না।

– এখানকার হিন্দুরা সাধারণ মুসলিম আর মুসলিম মৌলবাদীর মধ্যে পার্থক্য করতে জানে না। তারা সবাইকে মুসলিম বলে ডাকে। আর হিন্দু মৌলবাদীদের তারা সাম্প্রদায়িক বলে ডাকে। আর মুসলিম মৌলবাদীদের তারা সংখ্যালঘু বলে ডাকে। ডেকে মুসলিমদের আরও অন্ধকারে ঠেলে দেয়, আরও মৌলবাদী বানায়।

মায়া অবাক চোখে জুলেখার রোষ দেখে। চোখে কাজল, ভ্রু সরু করে আঁকা। মুখটা সুন্দর। মায়া মায়া।

জুলেখা তাঁর শাড়ির আঁচল কোমরে গুঁজে উঠে দাঁড়ায়। হঠাৎ বলে,– তুমি শাঁখা সিঁদুর পরো কেন? তোমার না ডিভোর্স হয়ে গেছে?

– না। এখনও তো হয়নি। কাগজটা হাতে আসতে একটু সময় নেবে।

জুলেখা অবাক। বলে– তুমি একটা বিয়ে করবে বলে সব ঠিকঠাক করে ফেলেছো। আর এখনও কিনা আগের স্বামীর চিহ্ন বহন করছো...

– ভাবছি, শোভনকে বিয়ের পরও শাঁখা-সিঁদুর খুলবো না।

ধপাস করে বসে পড়ে জুলেখা সামনে একটা চেয়ার ছিলো, সেই চেয়ারে।

– কেন?

– অভ্যেস হয়ে গেছে তো এসব পরে।

জুলেখা বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে– সুরঞ্জনের মুখে তোমার কথা যখন শুনতাম, তুমি খুব তেজি একটা মেয়ে। বেশ সাহসী। খুব র‍্যাশনাল। তোমার মতো ভিতু, তোমার মতো দুর্বল মেয়ে আমি বোধহয় আর একটাও দেখিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ার চোখে হঠাৎ জল উপচে ওঠে।

– একটাকে না ধরে আরেকটাকে ছাড়তে পারছো না। তাই না? তোমাদের পুরুষ ছাড়া চলবে না। দুর্বল মেয়েদের জন্যই পুরুষ দরকার হয়। দুর্বল মানুষের জন্য যেমন ধর্মের দরকার হয়। একই জিনিস।

চোখের জল মুছতে মুছতে মায়া বলে, শাঁখা-সিঁদুর খুলতে ভয় হয়।

শোভন বলেছে তার কোনও আপত্তি নেই।

কোনও প্রসঙ্গ ছাড়াই জুলেখা বলে– মায়া, তোমার চেয়ে আমি কিন্তু মাইনে কম পাই। তুমি কত পাও আমি জানি। সুরঞ্জন বলেছে। তোমার চেয়ে অনেক কম আমি পাই।

চোয়াল শক্ত করে মায়া বলে, তোমার তো আর বাচ্চা-কাচ্চা নেই।

জুলেখাও দাঁতে দাঁত চেপে বলে, আছে। বংশের বাতি বিইয়েছি একটা। থাকবে না কেন? আছে।

– বাহ, তাহলে বাচ্চা ফেলে রেখে এখানে দিব্যি কাটাচ্ছো। এখানে সাহসিনী করে বেড়াচ্ছো। তুমি কি মা? কী করে থাকো বাচ্চা ছেড়ে?

– বাচ্চা পোষার চেয়ে এটা অনেক বড় কাজ।

– কোনটা বড় কাজ শুনি? তোমার 'সাহসিনী' করা?

– সেটা তো আছেই। কোনও পুরুষের গলগ্রহ হয়ে, পুরুষনির্ভর হয়ে না বাঁচাটা আমার কাছে অনেক বড় কাজ।

– আমি তো বাচ্চাদের রেখে আসতে পারলাম না কোথাও।

– তাই তো তোমার দরকার একটা স্যারোগেট ফাদারের। সোবহান তো ফাদার হিসেবে ভালো। তাই তো ওকে ধরতে চেষ্টা করছো। কী কী করেছো ওর সাথে? শুয়েছো?

– ছিঃ ছিঃ।

– ছিঃ ছিঃ কেন? মায়ার দিকে বিরক্ত চোখে তাকিয়ে জুলেখা বলে, না শুয়ে কী করে বুঝবে সে শুতে পারে কিনা। তার ইরেকটাইল ডিসফাংশন আছে কি নেই। পরে তো পস্তাবে। আবার একে ছাড়তে হবে। আরেকটা খুঁজতে হবে, যার ওটা নেই। একা তো থাকতে পারবে না, কাউকে না কাউকে তো চাই।

– তুমি কী করে একা থাকো? নিশ্চয়ই তোমার কেউ আছে? নিশ্চয়ই বিয়েটিয়ে করবে।

– বিয়ে? জুলেখা নিজের কান দুটো মলে বলে, এ জীবনে না। পরজীবনে বিশ্বাস করি না। করলেও বলতাম, পরজীবনেও না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়া জানায় সে এখন যাবে। তারা বাচ্চারা তার জন্য অপেক্ষা করছে। জুলেখা মায়াকে গেইট অবধি এগিয়ে দিয়ে আসে। যেতে যেতে মায়া আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করে, সোবহান মানুষটা তো ভালো।

– হ্যাঁ, তা তো ভালোই। বন্ধু হিসেবে তো ভালোই।

– স্বামী হিসেবে কেমন হবে?

জুলেখা হাসতে হাসতে বলে, স্বামী হিসেবে কেমন হবে তা তো আমি জানি না। ও লোক কোনও দিন আমার স্বামী ছিল না। তবে ওর বউকে তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো, সোবহান স্বামী হিসেবে কেমন।

মায়া মুখ নিচু করে গম্ভীর মুখে হাঁটতে থাকে। বাড়িতে ঢুকে মায়া দেখে সুরঞ্জন ছাত্র পড়াচ্ছে। ওর মধ্যেই

বললো, জুলেখার সাথে দেখা হলো।

— তাই নাকি? সুরঞ্জন উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পাশের ঘরে চলে এল।

– বল বল। তারপর? কিছু বললো আমার কথা?

ঠোঁট উল্টে মায়া বলে, কিচ্ছু না।

– আছে কেমন?

– ও একটা বিচ। আস্ত একটা বিচ।

– তোর তাই মনে হলো? সুরঞ্জন একটু মিইয়ে আসে।

মায়া ক্রোধ চেপে বললো– ও চায় না আমি সোবহানকে বিয়ে করি। সোবহানকে বিয়ে করতে চায় ও নিজে।

– বললো?

– ওর আপত্তি আমার বিয়েতে।

হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মায়া। সুরঞ্জন মায়ার মাথাটা নিজের বুকের ওপর নিয়ে বলল, এভাবে কাঁদিস না। ও কে যে ওর আপত্তিতে তুই কাঁদবি। তুই বিয়ে করতে চাইছিস, বিয়ে করবি। কে কী বললো তাতে কার কী যায় আসে?

– ওই বিচটাকে নিয়ে তুই কী করে ঘুরে বেড়াতি দাদা? নিশ্চয়ই ভুগিয়েছে তোকে অনেক। মায়া কাঁদতে কাঁদতেই বলে।

সুরঞ্জন বলে– তোকে তো আমি না করেছিলাম ওর কাছে যেতে। জোর করে গেলি। বাদ দে এসব। সোবহান আটটায় আসবে। তোকে নিয়ে নাকি কোথায় খেতে যাবে। যা...

মায়া চোখের জল মুছে স্নানঘরে চলে যায়। কিরণময়ী মায়ার বাচ্চা নিয়ে মাঠে গেছেন। খেলাধুলা হয়ে গেলে বাচ্চাদের ফেরত নিয়ে আসবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিরণময়ীর জীবন তিনি চান বা না চান, মায়ার বাচ্চাদের ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। যত হচ্ছে, মায়া তত বাইরের জগৎটায় একপা-দুপা করে এগিয়ে যাচ্ছে। কেবল তো অফিস আর বাড়ি ছাড়া আর কিছু ছিল না ওর জগতে। এই জগৎটায় এখন কত কিছু! মায়া ভাবছে জুলেখার কথা। ওই স্মার্ট বিচের কথা। অপমান বুকে ঝমঝম করে। ঝরণার জল মায়ার সারা আগুন জ্বলা গা ধুতে থাকে, ধুয়ে দিতে থাকে মায়ার চোখের জল। এত জল চোখে আসছে কেন! আসুক, মায়া ভাবে, জীবনে তার নেওয়া অনেক সিদ্ধান্তের মতো এটিও ভুল ছিল, কোন এক জুলেখার সঙ্গে দেখা করা। কী দরকার ছিল জুলেখার অমন তীক্ষ্ণ তীব্র নিষ্ঠুর শব্দ শোনার! তার কি যথেষ্ট অপমান সইতে হয়নি এ জীবনে? আর কত বাকি! সোবহান সোবহান সোবহান। মাথা থেকে মায়া তাড়াতে পারে না মানুষটিকে। তার জীবনকে কী ভীষণ নিবিড় করে ধরে রেখেছে এই সোবহান! যখন তার উষ্ণ হাতে সে স্পর্শ করে মায়ার হাত, কী আদর থাকে সেই হাতে, কত যে হৃদয় থাকে সে হাতে! মায়া, একটা ধর্ষিতা, প্রায় মরে যেতে থাকা মায়া, শুধু একার আত্মবিশ্বাসে আজ মাথা উঁচু করে বেঁচে আছে, পায়ের তলায় মাটি আছে তার, শুধু একার চেষ্টায়। কেউ সাহায্য করেনি। আর আজ কিনা তার শুনতে হলো মায়া দুর্বল। মায়া ভিতু। মায়া পুরুষনির্ভর। আর যা কিছুই জগতে সত্যি হোক, জুলেখার এই বিচার যে সত্যি নয়, তা মায়া কী করে বোঝাবে! জুলেখা জানে না কিছু মায়ার, তার কালো অতীতের কথা কিছুই জানে না সে। তার ভেঙে যাওয়া, ধসে যাওয়া, মাটিতে মিশে যাওয়া জীবনের কথা জানে না কিছুই। অতটুকু ভেঙে পড়ার পর একটা চাকরি খুঁজে নেওয়া, বাচ্চা-কাচ্চা সামলে এখনও চাকরিটা বজায় রাখা, বাচ্চাদের ভালো স্কুলে পড়িয়ে মানুষ করা, স্বামী ছেড়ে একটা অকর্মণ্য দাদা আর একটা পুত্রঅন্ত মায়ের কাছে একজনের নয়, তিনজনের জায়গা করিয়ে নেওয়া। জুলেখার পক্ষে সম্ভব হতো? মায়া বোঝে যে সম্ভব হতো না। জুলেখার আর কী, স্বামীকে লুকিয়ে অন্য একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করেছে। খবর পেয়ে স্বামী তাড়িয়ে দিয়েছে। এক আত্মীয়ের বাড়িতে ছিল, তারপর নির্বিঘ্নে চাকরি। এখন হোস্টেলের নিরাপদ আবাস। বান্ধবীদের সঙ্গে ফুর্তি। মায়ার চেয়ে শতগুণে সহজ জীবন। একবার মায়ার জীবনে এসে দেখুক জুলেখা। কী রকম প্রচণ্ড তাণ্ডবের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মায়া, দেখুক। সোবহানকে মায়া ভালোবাসে। এই জিনিসটাই সে বোঝাতে পারেনি জুলেখাকে। ভালোবাসা শব্দটি জুলেখার কাছে এখন অচেনা। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুলে গেছে মানুষ মানুষকে যে ভালোবাসতে পারে। ভালোবেসে যে একসঙ্গে থাকার স্বপ্ন দেখতে পারে, জুলেখা ভুলে গেছে। সে এখন শিখেছে পুরুষ অত্যাচারী, নারী অত্যাচারিত। মায়া তা অস্বীকার করছে না। কিন্তু সব পুরুষই তো অত্যাচারী নয়। কিছু পুরুষ তো এখনও প্রেমিক হতে পারে, কিছু পুরুষ তো নারীকে ভালোবেসে আত্মহত্যাও করে। পুরুষ-নারী তো দুটো জাত নয়। এরা মানুষেরই জাত। মানুষের জাতের মধ্যে কিছু ভালো জাত আছে, কিছু খারাপ জাত আছে। ভালো জাতে নারী-পুরুষ উভয়ই আছে, খারাপ জাতেও ওই ওরাই আছে। সোবহান ভালো জাতের পুরুষ। সোবহান এখন তাকে চুমু খায়, তার সারা শরীরে চুমু খায়, যে চুমু খাওয়া মায়া তার সারাজীবনে পায়নি। মায়া জানতো না এভাবে ভালোবাসা হয়। সোবহান বলেছে, মায়ার সঙ্গে ছাড়া আর তার কোনও মেয়ের সঙ্গে মনের বা শরীরের সম্পর্ক নেই। সোবহান বলেছে মায়াকে সে ভালোবাসে। এই প্রথম সে কোনও ধর্ম দেখে না, সে কোনও জাত দেখে না, দেখে মানুষ। মায়ার মতো মায়াবী মানবী দ্বিতীয় কাউকে সে পায়নি। দুনিয়ার কে কী ভাববে, কে সোবহানকে একঘরে করবে, কোন সমাজ তাকে ছুড়ে ফেলে দেবে, মোটেও পরোয়া করে না সোবহান। সে মায়াকে সারা জীবনের জন্য পেতে চায়। পেতে চায় বন্ধু হিসেবে, তার চিরকালের সঙ্গী হিসেবে। মায়াকে ভালো এভাবে কেউ আজ অবধি বাসেনি। ভালোবাসা পাওয়ার জন্য যে তৃষ্ণা তার জনমভর ছিল, তা সোবহানই মেটালো। সোবহানের বউ আছে। স্বামী তো মায়ারও ছিল বা আছে। ওই সম্পর্ক এখন অর্থহীন। তারা বাধ্য হয়েছিল ভুল মানুষকে বিয়ে করতে। ভুল বুঝতে পেরে সঠিক মানুষ পেয়ে গেলে ভুলের বাঁধন থেকে যত তাড়াতাড়ি সরে আসা যায়, ততই ভালো। সোবহান ছাড়া মায়া বোঝে যে দুঃসহ হয়ে উঠবে তার জীবন। সোবহানই এই হতাশার জীবনটা স্বপ্ন-সুখ-স্বস্তি দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে। সোবহান যদি তাকে ছেড়ে চলে যায়, মায়া হয়তো বেঁচে থাকবে, কিন্তু সেই বেঁচে থাকায় আনন্দের লেশমাত্র কিছু থাকবে না। শুধু বাঁচার জন্যই বাঁচা হবে। শুধু শূন্যতার দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকা। শুধু সূর্যাস্ত দেখা, শুধুই মৃত্যুর অপেক্ষা। তা ছাড়া এই বয়সে দুবাচ্চার মা হয়ে কার নিঃস্বার্থ নিষ্কলুষ হৃদয় উজাড় করা প্রেম পেতে পারে সে! সোবহান তার জন্য দেবতার আশীর্বাদ। না, সোবহানকে সে মুসলমান বলে মনে করে না। মনে করে সে একজন মানুষের মতো মানুষ। ঠিক যেমন প্রেমিক-পুরুষ মায়া প্রার্থনা করেছিল জীবনে, সোবহান হুবহু তাই। মায়া দীর্ঘ সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে স্নান করে যখন বেরোয়, দেখে সোবহান বসে আছে সুরঞ্জনের ঘরে। সুরঞ্জন কাপড়-চোপড় পরে বেরোচ্ছে। কোথায়? তার নাকি কাজ আছে বাইরে। মায়া লক্ষ করেছে আজকাল সোবহান বাড়িতে এলে সুরঞ্জন বেরিয়ে যায়। মায়া বোঝে যে মায়াকে ঘরটা ছেড়ে দিয়ে সে যায়। ঘরটায় যেন দরজা আটকে নিশ্চিন্তে প্রেম সারতে পারে সে। সোবহানকে নিয়ে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় একটা ঘরে, দরজা ভেজানো থাকে বা খোলা থাকে। চারদিন শুধু দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করেছে। সেই বন্ধ দরজা খোলার পর কিরণময়ী চারদিনের মধ্যে দুদিন শুধু বলেছেন, ছেলেটা তো ভালো। বিয়ে করার হলে করে নে। পাড়ায় জানাজানি হলে মুশকিল হবে। আবার মুসলমান ছেলে। ওরা টের পেয়ে গেলে আবার আস্ত রাখবে না। বাকি দুদিন কিছু বলেননি তিনি, শুধু বাচ্চাগুলোকে অন্যত্র ব্যস্ত রেখেছেন, যেন ওরা মায়ের খোঁজ করতে এসে সুরঞ্জনের ঘরের দরজায় ধাক্কা না দেয়।

মায়ার চুল টাওয়েল দিয়ে পেঁচানো। পরনে একটা নাইটি। চিবুকের কাছের কালো চুলগুলো বেয়ে জল নামছে। ভুরুতে জল চিকচিক। সোবহান মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। হাত ধরে কাছে টেনে সে চুমু খায় মায়ার ঠোঁটে, চোখের পাতায়, ভুরুতে। চিবুকে। মায়া পেছন থেকে কিরণময়ীর ঘরে যাবার দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়। ছিটকে সরে যায় সোবহান। এ কী করলে?

কেন?

মাসিমা কী ভাববেন?

মাসিমা জানেন আমরা বিয়ে করছি।

তবু।

তবু কেন গো? ইচ্ছে হচ্ছে না?

হচ্ছে তো।

তাহলে আর রাখঢাক কেন গো?

মায়া নিজেই এরপর সোবহানকে টেনে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দেয়। তার ওপর আলতো করে শুয়ে চুমু খেতে থাকে। সোবহান আবেশে চোখ বুজে থাকে। মায়াকে বুকের ওপর চেপে ধরে শুয়ে থাকে সে। বলতে থাকে, তোকে ছাড়া বাঁচবো না রে মায়া।

মায়া সোবহানের নাক টিপে দিয়ে বলে, ঠিকই বাঁচবি তুই।

সোবহানও মায়ার নাক টিপে দিয়ে বলে, বাঁচালে তুই বাঁচাবি, মারলে তুই মারবি। সব তোর হাতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ার কী যে ভালো লাগতে থাকে। তার বিশ্বাস হয়, জুলেখা এই দৃশ্য দেখলে ঈর্ষা করতো মায়াকে। ঠিকই ঈর্ষা করতো। ভালোবাসা পেতে কে না চায়! জুলেখা কি অস্বীকার করতে পারবে সে চায় না? মায়া বিশ্বাস করে না। ঈর্ষার আগুন আজই সে দেখেছে জুলেখার চোখে। কেউ সুখে সন্ন্যাস জীবন বরণ করে না। তার উপায় ছিল না বলে। পেত সোবহানের মতো কাউকে, সব ছেড়ে ছুড়ে দিওয়ানা হতো।

সেই রাতে সিনেমায় যাওয়া দুজনই বাদ দেয়। সোবহানের বুকে মাথা রেখে সাদা দেয়ালের দিকে চেয়ে, চোখে আবার জল উপচে পড়ে, জুলেখার সেই সব কথা যখন মনে পড়ে।

— কী গো, কী হয়েছে? হঠাৎ চুপ হয়ে গেলে কেন? সোবহান হাতের আগুলে মায়ার বাহুতে আদর বুলোতে বুলোতে বলে।

— আজ তোমাদের জুলেখার সাথে দেখা হলো।

— কোথায়?

— ওর হোস্টেলে গিয়েছিলাম।

— তারপর?

— ও চায় না আমাদের বিয়ে হোক।

— কী কারণ?

— মনে হচ্ছে হিংসে করছে

— হিংসে কেন?

— তার সম্পর্কটা তো ভেঙে গেছে। কী জানো, যে সুখে নেই, সে কারও সুখ সইতে পারে না।

— ও তো দেখলাম খুব ব্যস্ত চাকরিবাকরি নিয়ে, পড়াশোনা নিয়ে। খুব অ্যামবিশাস মেয়ে।

— মেয়েদের স্বপক্ষে একটা গোষ্ঠী তৈরি করেছে। খুব নারীবাদী হয়ে উঠেছে। তাসলিমা ইনফ্লুয়েন্স।

- হুম।

— আচ্ছা, আমাকে একটা সত্যি কথা বল তো। তোমাদের মধ্যে কোনও প্রেম ছিল কখনও?

— ধুত। অরডিনারি ফ্রেন্ডশিপ ছাড়া আর কিছু না। আর আমরা তো চার দিন দেখা হলেই বন্ধু বলে ফেলি। সত্যিকার বন্ধু কি সহজে হওয়া যায়?

— তোমার আছে কেউ সত্যিকার বন্ধু?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– সুরঞ্জন।

– ও যে কী করে কারও বন্ধু হয় বুঝি না। ইনটিগ্রিটি নেই তো।

– কেয়ারলেস। ক্যালাস। কিন্তু ইনটিগ্রিটি আছে।

কী করে সিনেমার সময় পার হয়ে যায়, রাতের খাবার সময় পার হয়ে যায় দুজনের কেউ টের পায় না। সুরঞ্জন বাইরে থেকে ঘরের দরজায় বেল টিপলে দুজনে হুড়মুড় করে উঠে বসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলকাতার একটা নিজস্ব গন্ধ আছে। গন্ধটা আমি যখনই বিদেশ থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে নামি, পাই। শরীরে সেঁটে থাকে স্যাঁতস্যাঁতে। বাংলা ভাষা আর সংস্কৃতিকে ভালোবেসে ইউরোপের পাট চুকিয়ে কলকাতায় এসে বাস করছি। শুরুতে যে উচ্ছ্বাস ছিল কলকাতার বন্ধুদের, থেকে যাওয়ার পর থেকে দেখি মিইয়ে গেছে। কলকাতায় আর হোটেলে উঠবো না এই প্রতিজ্ঞা করে একটা অ্যাপার্টমেন্ট তড়িঘড়ি ভাড়া করে নিয়েছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞার পর একটা ফার্নিসড অ্যাপার্টমেন্টে উঠেছিলাম পূর্ণদাস রোডে। সে এক ভীষণ ব্যাপার। টাকা চুরি, মায়ের দেওয়া সোনার হার হারিয়ে যাওয়া, বাড়িওলার গলাকাটা। এক মাসেই লাখ টাকা বেরিয়ে গেল। সব দুর্ঘটনার মধ্যে মন ভালো করে দেওয়ার ব্যাপার ছিল বন্ধুদের সান্নিধ্য। প্রতিদিন ঘর উপচে পড়তো বন্ধুতে। এরপর আবার ছুটে এলাম। এবার আর আসবাবপত্র কোনও অ্যাপার্টমেন্ট নয়। একেবারে খালি অ্যাপার্টমেন্ট। এক-দু মাসের জন্য নয়, অনির্দিষ্টকালের জন্য। বিমানবন্দরে নেমেছি, তখনও কিছুই জানি না কোথায় উঠবো। গাড়ির পেটের মধ্যে স্যুটকেস। কোথায় কোথায় বাড়িভাড়া হবে, তার খোঁজ নিয়ে ফোনে প্রথম যে বাড়িঅলার সঙ্গে কথা বলি, তার অ্যাপার্টমেন্টের কিছুই না দেখে যা ভাড়া দাবি করলো তাতেই রাজি হয়ে ঠিকানায় পৌঁছে গেলাম। সেই ঠিকানায় এখনও আছি। যেদিন ঢুকেছিলাম অ্যাপার্টমেন্টটিতে, ছিল ধুলোর পাহাড়। সবচেয়ে ভালো লেগেছিল বড় বড় ঘর দেখে, জানালায় কোন গ্রিল নেই বলে, বারান্দার দরজাতেও লোহা-লক্করের চিহ্ন নেই। খোলা চারদিকটা। আর যে ঘরটাকে লেখার ঘর করবো বলে মুহূর্তে ভেবে নিয়েছি, সেই ঘরের জানালায় চোখ রাখলে বিশাল আকাশ, আর একটি পুরনো বাড়ি, যে রকম শাটারওয়ালা দরজা-জানালা ছিল, সে রকম। পুরনো স্থাপত্য আমাকে খুব টানে। স্মৃতি আমাকে পাগল করে দেয়। এ বাড়ির তাই যত ভাড়া হোক, নিয়ে নিলাম। ভেবেছিলাম, এত বেশি ভাড়া পোষানো যাবে না। দু-এক মাসেই কম ভাড়ার বাড়ি দেখে চলে যাবো। দেখতে দেখতে এক বছর

AMARBOI.COM

কেটে গেছে, দুবছর কেটে গেল। সে না হয় কাটছে, বাংলায় আছি, বাংলা কথা বলতে পারছি, শুনতে পারছি। সকালে একগাদা বাংলা পত্রিকা আর চা নিয়ে বসছি জানালার কাছে। পরশ বুলোচ্ছে হাওয়া, পাখি শুনোচ্ছে জেগে ওঠা গান, অদ্ভুত আরাম হয় মনের। এই বাংলা রেখে কোথায় কোন বিদেশে আমি যাবো? কেন যাবো? বাংলাকে, বাঙালিকে ভালোবেসে এই যে আমার এখানে আসা, কই, এত যে ছুটে ছুটে আসতো মানুষ, কোথায় ওরা? ছমাসেও একবার চেহারা দেখি না। সব উবে গেছে ধীরে ধীরে আমাকে বিষম একা করে দিয়ে। খুব খালি খালি লাগে আজকাল।

ভাবি, কত অবন্ধুকে বন্ধু বলে ডাকি সারাদিন। বিস্তর বন্ধু আছে চারদিকে, বলি। একা নই, কখনও ছিলাম না, বলি। একাকীত্ব থেকে মনে মনে দুহাজার মাইল সরে থাকি ভয়ে, নাকি লজ্জায়, কে জানে? বন্ধু নেই, একে আমারই দোষ, আমারই চারিত্রিক দোষ বলে ভাবে যদি কেউ! পৃথিবীর যে প্রান্তে বা প্রান্তরে জীবন ভিড়াই, ঝাঁক ঝাঁক বন্ধু এসে জীবনে জীবন দেয়, বলি, নিজেকে সান্ত্বনা দিই। আজ পরিচয় হলো, কাল বা কোনও দিন তার সাথে ফের দেখা হবে কিনা না জেনেই বন্ধুর তালিকায় তার নাম যোগ করে দিয়ে তালিকা দীর্ঘ করি। কত শত্রুকেও বন্ধু বলে ভাবি, ভেবে সুখ নিই, মরা জলে নিভৃতে তরঙ্গ তুলি। এ ছাড়া বাঁচবো কী করে এই নির্বাসনে? স্বজন বলতে এই বন্ধুই আছে, দেশ বলতেও সেই বন্ধু। বন্ধুরাই তো কাছে থাকে, সুসময়ে-দুঃসময়ে থাকে, ভালোবাসে, স্নেহ দেয়, জ্বর হলে একবার হলেও কপালে উদ্বেগের হাতখানা রাখে। বন্ধুরাই তো বাবা মা, বন্ধুরাই তো বোন। বন্ধুরাই পরমাত্মীয়। কত অবন্ধুকে বন্ধু বলে ডাকি সারাদিন। না ডেকে উপায় কী? না ডেকে বাঁচবো কী করে? আমি একা, ভয়ংকর একা। বন্ধু বলে আসলে কেউ নেই আমার, এই কুৎসিত সত্যকে প্রাণপণে অস্বীকার করি, মিথ্যে বলি, বলি যে অগুনতি বন্ধু নিয়ে আছি, চমৎকার আছি। জীবনে এই একটি মিথ্যেই আমাকে বলতে হয় বারবার, নিজেকে ফাঁকি দিতে লজ্জা হয়, তবু দিতে হয়।

নিজের মতের সঙ্গে মেলে না— এমন কত মানুষের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হই। এ ছাড়া উপায় কী? মানুষ ছাড়া কেউ কি বাঁচে? একটা ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে হয় আমাকে। যদি বেরোই বাইরে, পুলিশ বেরোয় সঙ্গে। পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে অনেক সময় অনেক জায়গায় চলে যাই। বিশেষ করে সুরঞ্জনকে নিয়ে দুদিন দুদিকে চলে গেলাম। কেন গেলাম পরে ভেবেছি এবং ভেবে যে উত্তরটা পেয়েছি, তা হলো এ রকম, যে সুরঞ্জনকে নিয়ে গল্প

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখেছিলাম বলে সুরঞ্জন আমার 'লজ্জা'র প্রধান চরিত্র ছিল বলে তার প্রতি আমার একটা দায়িত্ব বা অধিকার আছে বলে আমার মন বলে, প্রায় বলে। পরে যখন আবেগ সরিয়ে রেখে ভাবি, তখন দেখি, যে কোনও দশটা ছেলের মতোই সুরঞ্জন। কিছুটা আধুনিকতা, কিছুটা রক্ষণশীলতা, কিছুটা উদাসীনতা, উদারতা, কিছুটা স্বার্থপরতা সংকীর্ণতা সব মিলিয়ে সে। তাকে নিয়ে দূরে চলে যাওয়া তার ইচ্ছেয় নয়, হয়েছে আমার ইচ্ছেয়। অন্তত এটুকু সান্ত্বনা যে, ভালো করি কি ভুল করি নিজের ইচ্ছেয় করি। নিজের সিদ্ধান্তে করি।

সুরঞ্জন কেমন আছে কলকাতায়, তার বাবা-মা-বোন নিজের জন্মের জায়গা ছেড়ে কেমন আছে, এটা জানতে আমি চাইতাম না, যদি না দেখা হতো সুরঞ্জনের সঙ্গে। কিছু চরিত্রের পেছনে আমি লেগে থাকি, যতক্ষণ না চরিত্রের ওপর থেকে গাঢ় ধোঁয়া দূর হয়। মায়ার কথা যতটুকু শুনেছি বা কিরণময়ীকে যতটুকু দেখেছি অস্পষ্ট লাগেনি কিছু। এরা আপন মানুষের মতো আচরণ না করলেও এদের আপন ভাবার আরও একটা কারণ, এরা আমার দেশের মানুষ এবং দেশের যাদের আমি দেশে থাকাকালীন চিনতাম, তারা তো এরা ছাড়া আর কেউ নয়। তাই আত্মীয়ের মতোই না চাইতেও আমার ভেতরটা এদের সেভাবেই দেখে। পূর্ববঙ্গের লোক প্রচুর আছে, বাঙাল আছে চারদিকে। কিন্তু তারা আর সুরঞ্জনরা তো এক নয়। সুরঞ্জনদের যেমন, আমাকেও তেমন প্রায় কাছাকাছি সময়ে দেশ ছাড়তে হয়েছে। অথবা বাধ্য হয়েছি দেশ ছাড়তে। কিন্তু খুব বেশি জটিল চরিত্র নিয়ে বেশি দিন চলা সম্ভব হয় না আমার। নিজেকে ওদের সামনে খুব বোকা বোকা লাগে। সত্যি কথা বলতে কী, সুরঞ্জনকে যতবারই আমি ভাবি ঠিক বুঝেছি ওকে, পরে বুঝি যে আসলে ওর কিছুই বুঝিনি।

বাড়িতে মায়া চলে আসার পর কিরণময়ীর আবেগও যেন হঠাৎ কমে গেছে। বাড়িতে ব্যস্ততা বেড়েছে। তা ছাড়া আমাকে মায়া তো সইতে পারে না। কিরণময়ীর পক্ষে সম্ভবও নয় যোগাযোগ রাখা। আমার অভিমান আমার ভেতরেই থাকে। ওদের সবার জায়গায় দাঁড়িয়ে ওদের সবাইকে আমি দেখতে চেষ্টা করি। এ রকম করলে দেখেছি, আমার রাগ-অভিমানগুলো হাওয়ায় উড়ে যায়। সবার কাজেরই একটা যুক্তি আছে। আমি এমনকি মৌলবাদীদের কাতারে নেমে গিয়ে ওদের মানসিকতা দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি, ওরা কেন আমাকে আক্রমণ করতে চাইছে, সবার পক্ষেই যুক্তি আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিরণময়ী এখন আর রান্না করে টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার পাঠান না, এখন আর ফোনও করেন না, বাড়িতে যেতেও বলেন না, বা হুট করে আমার বাড়ি চলে এসে বলেন না আমাকে অনেক দিন দেখেননি, খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। সম্ভবত, মায়া এসে আমার জন্য যে জায়গাটি ছিল, সেটি ভরাট করে দিয়েছে। মায়ার ওপর আমার রাগ হওয়া উচিত কিন্তু হয় না। মায়ার জায়গায় নিজেকে রেখে আমি দেখেছি আমার ওপরই আমার রাগ হয়। আমি মায়া হলে আমাকে আমি ক্ষমা করতে পারতাম না। আবার আমার নিজের পক্ষে যখন যুক্তি দিই, তখন দেখি আমি যা করেছি, সামান্যও ভুল করিনি। মায়া যদি আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাকে ভাবতো, মনে হয় না আমাকে সে দোষ দিতে পারতো। এই যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, এটাই আমাদের হয় না। আমরা কারও হয়ে কাউকে বুঝতে চাই না। কেবল নিজের চোখ দিয়ে দুনিয়াটা দেখি। কেবল নিজের, কেবল নিজের। মাঝে মাঝে আমি যখন কোনও সমুদ্রের দিকে তাকাই বা গভীর অরণ্যের ভেতর, আমি আমার মার চোখ দিয়ে দেখি সমুদ্র বা অরণ্য। মার খুব শখ ছিল সমুদ্র দেখবে, অরণ্য আর পাহাড়ের কাছে যাবে কোনও দিন। যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি কোনও দিন। তাই যখনই মার স্বপ্নের স্থানগুলোর সামনে গিয়ে আমি দাঁড়াই, একবার আমার চোখে দেখি, একবার মার চোখে দেখি। আমার চোখে যখন দেখি, তখন সে চোখটিতে মুগ্ধতা থাকে, নির্লিপ্তও থাকে, আর মায়ের চোখটি সব সময় জলে ভরে ওঠা।

কলকাতা ক্রমে মরুভূমি হয়ে উঠেছে আমার জন্য। যে কজন কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীকে জানি, যাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে ভেবেছিলাম, তাঁদের কারও সাক্ষাৎ পাওয়ার কোনও সুযোগই নেই। তাঁরা কেউ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন না। অনেকেই আমার বই 'দ্বিখণ্ডিত' নিষিদ্ধ করার জন্য চেষ্টা-চরিত্র করেছেন। তখনকার পত্রপত্রিকায় বড় বড় লেখক-বুদ্ধিজীবীদের আমাকে তুচ্ছ করে, আমাকে গালি গিয়ে, বই নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব যেগুলো ছাপা হয়েছে, পড়েছি। যত পড়েছি তত আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি। 'লজ্জা' লেখার পর পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের একাংশ আমার বিরুদ্ধে চলে গেল। 'দ্বিখণ্ডিত' লেখার পর তাদের বাকি অংশও চলে গেল বিরুদ্ধে। লেখকরা সব জড়ো হয়ে কোনও লেখকের বই নিষিদ্ধ করার দাবি জানাচ্ছেন সরকারের কাছে, আমার জানা মতে এমন কোনও ঘটনা পৃথিবীতে ঘটেনি এর আগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃসঙ্গতা আমাকে হাঁমুখো দাঁতালের মতো কামড় দিয়ে যাচ্ছে অনেক কাল। নিঃসঙ্গতা আমার সঙ্গ ছাড়বে না পণ করেছে। এলোপাতাড়ি ঘুরতে থাকি শহরে। সিনেমা-নাটক-গান-নাচ এসবে দৌড়াচ্ছি। রেস্তোরাঁয় কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলে আসছি। ঠিক কী যে চাই, কাকে যে চাই, বুঝিনি। খালি মনে হয়, হেথা নয় হোথা নয় অন্য কোথাও। এই কলকাতা ছাড়া আর শহর তবে কোথায় আছে যেখানে গিয়ে মন শান্ত করতে পারবো। না, কোথাও নেই। কোনও দেশের বা কোনও শহরের আলাদা কোনও চরিত্র নেই, মানুষের চরিত্র দিয়েই তো বিচার হয় শহরের চরিত্র। যদি একটাও বন্ধু আমার না থাকে এই শহরে, শহরটা কত দিন আমার ভালো লাগবে? একদিন না একদিন আমার তো শ্বাসকষ্ট হবেই।

সুরঞ্জন যথারীতি গর্তে ঢুকে গেছে। তাকে গর্ত থেকে তুলে আনতে এখন ক্লান্তি বোধ করি। সে তার মতো গর্তেই বাস করুক। তার মতো সে ঝিলের পাড়ে গিয়ে বসে থাকুক, ঝিলের জলে ঝাঁপ দেওয়ারও ইচ্ছে সে পোষণ করুক, তার জীবন নিয়ে সে যা ইচ্ছে তাই করুক। আমি নিজের লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠতে থাকি। বিদেশ থেকে আজকাল আমন্ত্রণও মুহুর্মুহু আসে না, এলেও যেতে ইচ্ছে করে না।

এমনিতে উড়োজাহাজে ভ্রমণ আমার অসহ্য। একটা সময় জীবন উড়োজাহাজেই কেটেছে বেশি, কম বায়ুচাপে থাকতে থাকতে সাংস্কৃতিক বা মানববাদী বা নারীবাদী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ আসে, কিন্তু সারাদিন উড়োজাহাজে বসে থাকার কথা ভাবলে গায়ে জ্বর চলে আসে। ছুঁড়ে ফেলে দিই আমন্ত্রণ। এ দেশে বসে বাকি জীবন লেখাপড়া করবো, ব্যস্ততায় বুঁদ হয়ে থাকলে একাকীত্বের দাঁত তেমন গায়ে লাগে না। যদি বাঁচায়, ব্যস্ততাই আমাকে বাঁচাবে। মানুষ মানুষ বলে উন্মাদের মতো মানুষ খুঁজলে মানুষ তো আর পাওয়া যায় না। মানুষের সঙ্গে যদি দেখা না হওয়ার থাকে, দেখা হবে না। এত মানুষের ভিড়ে আসল মানুষ যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে, আমার কি সাধ্য আছে খুঁজে নিয়ে আসা?

সুরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ছ মাস কেটে গেছে, একবারও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেনি। তার মোবাইল নেই। যেটা ছিল, সেটা শেষে যা জানলাম, ঝিলের জলে ফেলে দিয়েছে। ওই পরিবারের কে কেমন আছে, বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে, জানি না। আপাতত জানতে চাওয়ার ইচ্ছেটাকে আমি নানা কিছু দিয়ে রোধ করি। কিন্তু দেখা হয় একজনের সঙ্গে, সুরঞ্জনের পরিবারের কেউ নয় সে, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভাবনা ছিল কেউ হওয়ার। এলগিন রোডের ফেরামে একদিন সিনেমা দেখে নামছি, দেখি জুলেখাও নামছে। তার ছুটি হয়ে গেছে, বাড়ি যাচ্ছে। জুলেখা আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত। আমাকে সে যে করেই হোক তার হোস্টেলে নিয়ে যাবে। তার অনুরোধে আন্তরিকতা ছিল, আর এটি থাকলে আমার ভেতর থেকে বাধা দেওয়ার শক্তি থাকে না। জরুরি কাজ ফেলেও আমি যেদিকে হৃদয় সেদিকে ছুটে যাই। হৃদয়ের চেয়ে বেশি জরুরি এ জগতে কিছু নেই আমার।

জুলেখাকে কোনও দিন খুব পছন্দ হয়নি আমার। কারও ব্যক্তিত্ব যদি পছন্দ না হয়, তাহলে আমার পক্ষে মেশা খুব সহজ হয় না। নিজেকে আমি আলগোছে সরিয়ে নিই। জুলেখা একসময় ফোন করতো, সুরঞ্জনদের বাড়ির খবরাখবর দিত। অনেক দিন সেও যোগাযোগ করে না। হোস্টেলের দিকে যেতে গাড়িতে উঠি জুলেখাকে নিয়ে। বলি, অনেক দিন তো ফোনটোন করো না।

জুলেখা বলে, যোগাযোগের দায়িত্বটা একা আমার ছিল বলে একসময় ছেড়ে দিয়েছি। আমি কটা ফোন করছি, আর তুমি আমাকে কটা করেছো বলো। আমি তো প্রতিদিনই প্রায় ফোন করতাম। একদিনও, একদিনও তুমি করোনি। কোনও সম্পর্ক একতরফা টিকিয়ে রাখা যায় না। তোমাকে আমি ভালোবাসি খুব। এর মধ্যে তোমার সব বই পড়ে ফেললাম, ভালোবাসা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে।

বড় অপ্রতিভ লাগে নিজেকে। বলি, আসলে কাউকেই ফোন করা হয় না তেমন।

জুলেখা বলে, এটা ঠিক না। কাউকে না কাউকে তো করো। যাদের বন্ধু বলে মনে করো, করো। সুরঞ্জনের কাছে যদি ফোন থাকতো, আমার মনে হয় না তুমি ওর ফোনের জন্য অপেক্ষা করতে, ওকে ফোন তুমি করতেই। নিজ থেকে।

আমি চুপ করে থাকি। জুলেখার উত্তর আমার মনে হয় ঠিকও, ভুলও।

– তারপরও ওদের খবর কী?

– ওদের খবর, ওদের খবর, ওদের খবর। ওরা কেমন আছে। সুরঞ্জন কেমন আছে, মাসিমা কেমন আছেন। মায়া কী করছে। এই তো। তুমি বুবু কোনও দিন জানতে চাওনি আমি কেমন আছি। আমি এই যে স্ট্রাগল করছি জীবনে, তুমি কি কোনও দিন অ্যাপ্রিশিয়েট করেছো? কোনও দিন চেয়েছো আমাকে ইনসপিরেশন দিতে। অবশ্য তুমি না দিলেও তোমার লেখা আমাকে দিয়েছে, যা দরকার ছিল আমার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলেখা বলতে থাকে আর আমি অপ্রস্তুত চোখ দুটো জানালায় ফেলে রাখি। রাস্তার ধারে সব ঝকঝকে শপিং সেন্টার উঠছে, আর তার পাশেই মলিন দোকানপাট। দরিদ্র আর বিত্ত এমন জড়াজড়ি করে থাকতে আর কোনও দেশে আমি দেখিনি। বস্তির গা ঘেঁষে অট্টালিকা। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে, বস্তিতে থেকেও মানুষ বলছে ভালো আছে, যেন উচ্ছেদটা না করা হয় তাদের। অট্টালিকায় থেকেও মানুষ বলছে ভালো আছে, যেন তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থায় কোনও ফাঁক না রাখা হয়।

জুলেখা প্রায় কানের কাছে মুখ দিয়ে ফিসফিস করে বললো, ইসলাম নিয়ে যা বলেছো তুমি, একেবারে ঠিক বলেছো।

আমি একটু চমকেই উঠি, ইসলাম নিয়ে আমি যা বলেছি ঠিক বলেছি তা হঠাৎ আমার কানের কাছে মুখ এনে বলার দরকার কী ছিল? এ তো যেভাবে সে অন্য কথা বলছিল, এও ঠিক সেভাবেই বলতে পারতো। জুলেখা নিশ্চয়ই সাবধানতা অবলম্বন করেছে। নিশ্চয়ই ভয় আছে তার— কিছু একটা ঘটে যেতে পারে, খারাপ কিছু।

– ইসলাম আমার বিষয় নয় লেখার। জুলেখাকে বলি। নারীর অধিকারের কথা বা মানবাধিকারের কথা লিখতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে ইসলাম আসে। ঠিক একইভাবে অন্যান্য ধর্ম বা কুসংস্কার আসে। আমি ধর্মান্ধতা, ধর্মবিশ্বাস এসব থেকে প্রায় জন্মের পর থেকেই দূরে। আমাকে কোনও দিন এসব জিনিস আকর্ষণ করেনি। বুদ্ধি হবার পর আমাকে যেটা হন্ট করেছিল, তা হলো সোসাইটিতে মেয়েদের স্বাধীনতা নেই কেন? মেয়েরা কেন হিউম্যান বিয়িং হিসেবে ট্রিটেড হয় না।

কথা বলার সময় মাঝে মাঝে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার করি যখন, নিজের ওপর আমার খুব রাগ হয়। নিজেকে খুব অশিক্ষিত বলে মনে হয়। এটা কলকাতার ইনফ্লুয়েন্স! এখানকার লেখাপড়া জানা মানুষ তো ইংরেজি বাংলা না মিশিয়ে বলতে পারে না। শুনে শুনে সে রকমই অভ্যেস হয়েছে আমার। আমার খুব ইচ্ছে যখন ইংরেজি বলবো, তখন ইংরেজিই বলবো— যখন বাংলা, তখন বাংলা। প্রায় বারো বছর কাটিয়েছি ইউরোপের সেই দেশগুলোতে, যে দেশগুলোর ভাষা ইংরেজি নয়। আন্তর্জাতিক ভাষা এখন ইংরেজি ফরাসি, এ অস্বীকার করার উপায় নেই। দুই বড় উপনিবেশবাদীর ভাষাই এখন বিশ্বময় যোগাযোগের ভাষা। দেখেছি ইংরেজি জানে এমন লোকও যখন নিজেদের ভাষায় অর্থাৎ ইতালীয় বা জার্মান বা স্প্যানিশ বা ডেনিশ ভাষায় কথা বলে, একটা ইংরেজি শব্দও ভুলেও উচ্চারণ করে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন যে ভাষায় কথা বলে, সে ভাষাতেই কথা বলে, খিচুরি পরিবেশন করে না। বাঙালি খিচুরি খাওয়া জাতি, বোধহয় তাই ভাষার খিচুরি তার বেশ ভালো লাগে। আসলে এই খিচুরি ভাষাটিই হচ্ছে বোধহয় বাংলা ভাষার বিবর্তনের ফল।

আমার ভাষা-ভাবনার মগ্নতা ভাঙে যখন শুনি জুলেখা বলছে– সুরঞ্জন ভালোই আছে। বেশ আছে। একটা এনজিওর হয়ে ডকুফিল্ম বানানোর কাজ করছে।

– ও কি ফিল্ম বানিয়েছে কোনও দিন?

– না। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক কাজটা পেয়েছে সে। তার এক বন্ধুও নাকি সঙ্গে আছে। এক মাস ধরে সে আন্দামানে। ওখানকার আদিবাসীদের শুট করছে।

আমার খুব ভালো লাগে শুনতে যে সুরঞ্জন ঘরের বাইরে কোথাও কোনও এক্সাইটিং কিছু করছে। ছাত্র পড়ানোর মতো বোরিং জিনিস আর কিছু নেই। এই তীব্র হোপলেস অবস্থা থেকে সে যে গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং দৌড়াচ্ছে– এর চেয়ে সুসংবাদ আর কী আছে! অবশ্য সুরঞ্জনকে বললে সে নিশ্চয়ই বলবে, ছাত্র পড়ানো কে বললো বোরিং জিনিস বরং ফিল্ম বানানোটাই বোরিং।

সুরঞ্জন সম্পর্কে জুলেখা বিরতিহীন বলে যেতে থাকে। বলে যাওয়ার উদ্দেশ্য আমাকে তথ্য দেওয়া। জুলেখা কী কারণে জানি না, মনে করে, সুরঞ্জনের নাড়িনক্ষত্র জানার অধিকার আমার আছে। আমার এই অধিকার কারওই লঙ্ঘন করা উচিত নয়, এমনকি সুরঞ্জনেরও নয়।

জুলেখার পরনে সাধারণ একটা নীল জর্জেট শাড়ি। মুখে কোনও সাজসজ্জা নেই। কানে-নাকে গলায় কোনও গয়না নেই। মনে আছে আগে কী উৎকটভাবে সাজতো জুলেখা! প্রেমে পড়লে নিজেকে পুতুল সাজাবার প্রবণতা মেয়েদের এত বেশি বেড়ে যায় যে, ওদের জন্য সত্যিই করুণা হয় আমার। ওই সাজসজ্জার কাছে তখন ওরা এক রকম বন্দি। কী অসহায় মেয়েরা তখন! আমি কি নিজের জীবন দিয়েই তা দেখিনি? প্রেমে যেই না পড়েছি, তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় আমার আয়নার সামনে দাঁড়ানো, এদিক-ওদিক করে নিজেকে দেখা। তখন নিজেকে আর নিজের চোখ দেখি না, দেখি প্রেমিকার চোখ দিয়ে। তখন আমি আর আমি থাকি না, আমার প্রেমিক হয়ে উঠি। আমি তখন আমার নিন্দুক, আমার তীব্র সমালোচক। নিজেকে তখন আমি আর ভালোবাসতে জানি না। নিজেকে ঘৃণা করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের প্রতিটি অঙ্গকে, অঙ্গভঙ্গিকে। তাই বারবার নিজেকে শোধরানোর, বেটার হওয়ার, প্রেমিকের চোখে আকর্ষণীয় হওয়ার চেষ্টায় সময় নষ্ট করি। করিনি? প্রেমিক যেন ভালোবাসে, যেন ছেড়ে চলে না যায়, তার জন্য নিজের শরীর নিয়ে কম ব্যস্ত থাকে মেয়েরা! মেয়েদের এই দুর্বলতা প্রেমিকেরা বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করে।

– সুরঞ্জন কি আর টিউশনি করছে না?

– এখন তো তার আর সময় নেই। উনি প্রচণ্ড ব্যস্ত। সরকারি কিছু অফিসের জন্যও নাকি উনি ডকুফিল্ম করবেন। টাকা-পয়সা ভালোই কামাচ্ছে।

– এর মধ্যেই?

– হ্যাঁ, সাঁওতালদের নিয়ে করা ডকুমেন্টারি করে নাকি বেশ নাম করছে। ওটা দেখেছিও আমি। শান্তিনিকেতনে যে সাঁওতাল পল্লি আছে, ওখানেও শুটিং করেছে। পূর্ণিমা রাতে সোনাঝুরি বনে সাঁওতালদের যে নাচটা নিয়েছে, সেটা দারুণ।

– তাই নাকি? চমকিত এবং বিস্মিত আপাদমস্তক আমি।

– হ্যাঁ।

– সোনাঝুরি বন? পূর্ণিমা?

– হ্যাঁ।

চোখের সামনে সেই রাতটি উঠে আসে। মনে হয় এই সেদিনের কথা। হিসেব করলে দেখবো কী জানি কবে পার হয়ে গেছে বছর। কিছু আমার হিসেব করতে ইচ্ছে করে না, বিশেষ করে দিন।

– তুমি কী করে দেখলে ওর ফিল্ম? কোথাও চলেছে? নন্দনে বা কোথাও?

– না, মনে হয়। দেখেছি, মায়া দেখিয়েছে।

– মায়া? কোন মায়া?

– সুরঞ্জনের বোন মায়া।

এত চমকে উঠি যে প্রায় গাড়ি থামাও-এর মতো উত্তেজনা আমার।

মায়ার সঙ্গে তোমার...?

– জুলেখা হেসে বলে, হ্যাঁ বুবু। মায়ার সঙ্গে আমার অনেক কিছু?

– কী করে, ও তো মুসলমানদের নাকি দু চোক্ষে দেখতে পারে না। অবশ্য ওর বিয়ে তো হয়েছে সোবহানের সঙ্গে, মুসলমানের সঙ্গেই। আমার কাছে তখন খুব অবাক লেগেছিল। খুব পাল্টে গেছে ও তাই না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলেখার সামনে চোখ। তার হোস্টেলের পথ দেখাচ্ছে সে চালককে। চোখ সরিয়ে আমার দিকে ফিরে সে বলে, তুমি কি কিছুই খবর রাখো না? আমি তো ভাবতাম এটুকু হয়তো জানো।

– কী করে কী জানবো? কিসের খবর?

– মায়ার সঙ্গে তো সোবহানের বিয়ে হয়নি।

– মানে?

– মানে আর কী? মায়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিয়ে করবে না। ও তো আমাদের হোস্টেলে এসে উঠেছে।

– কী বলছো তুমি?

জুলেখা হেসে ওঠে জোরে।

– সত্যি কথা বলো।

– সত্যি বলছি।

– মায়া তোমার হোস্টেলে থাকে?

– শুধু হোস্টেলেই থাকে না, আমাদের অরগানাইজেশনে যোগ দিয়েছে।

– তোমার অরগানাইজেশন?

– হ্যাঁ, 'সাহসিণী'। সম্পূর্ণ মেয়েদের একটা গোষ্ঠী। মূলত মেয়েদের জন্য মেয়েরা, এই আইডিওলজি নিয়ে গড়ে তোলা। আমি জানি তোমার পছন্দ হবে। ভেবেছিলাম হোস্টেলে নিয়ে গিয়ে তোমায় সারপ্রাইজ দেব। তার আগেই জানিয়ে দিলাম।

– মায়া কেন বিয়ে করলো না? ও তো পাগল ছিল বিয়ের জন্য শুনেছিলাম।

– হ্যাঁ, ছিল।

– সুরঞ্জন কি বাধা দিয়েছে? ও তো চাইতো না বিয়েটা হোক।

– না না না। সুরঞ্জন পরে চেয়েছিল। কিন্তু মায়াই না করেছে। কিছুতেই সে বিয়ে করবে না।

আমার কাছে এসে বললো, সোবহান ভালো। কিন্তু বিয়ের পর সোবহান তো স্বামী হবে। স্বামী হলে পুরুষেরা যা করে, তা তো সেও করবে। বললো সোবহানের বউ যে কষ্ট সইছে, আমি ওর বউ হলে তো একই কষ্ট ভোগ করতে হবে আমাকেও।

– কিন্তু ও তো ভালোবাসতো...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– ভালোবাসাটা মায়ার কাছে নাকি শেষ পর্যন্ত ভালোবাসা বলে মনে হয়নি।

– কী মনে হয়েছে?

– মনে হয়েছে একটা লেনদেন। তুমি আমাকে এই এই জিনিসগুলো দেবে, আমি তোমাকে বিনিময়ে সেই সেই জিনিসগুলো দেব।

– এক্সপেকটেশন তো থাকেই, সেটা তো কনডিশন নয়।

– হয়তো আরও কিছু কারণ আছে...

– কী কারণ? সোবহান মুসলমান বলে?

জুলেখা সজোরে মাথা নাড়লো, সেটা কোনও কারণই নয়। ও মুসলিমবিদ্বেষীর ভান করতো। আসলে সবাইকে সমান চোখে দেখে।

– আশ্চর্য!

– কেন আশ্চর্য?

এর আর উত্তর দিই না। জুলেখা হোস্টেলে তার রুমে নিয়ে যায়। ছোট ঘরটাই সে নিজের মতো করে সাজিয়েছে। জানালায় দুটো ফুলের গাছ। দেয়ালে কয়েকটা পোস্টার। বিছানায় শান্তিনিকেতনি চাদর। 'সাহসিণী'র সব মেয়ের ছবি দেয়ালে সাঁটা।

– বাহ্, এ তো দেখি উইমেনস ওয়ার্ল্ড।

– অনেকটা তাই গো।

ছবিগুলো ছোট-বড়, দেয়াল জুড়ে সাঁটা। জুলেখা দেখালো ময়ূর নামের তার রুমমেটের ছবি। দেখালো মায়াকে। বড় বড় চোখের মেয়েটি মায়া। মুখে মিষ্টি হাসি। দেখে কী যে মায়া হয়!

আচ্ছা মায়া হোস্টেলে থাকে কেন? আমার কৌতূহল। তার তো বাড়ি আছে, মায়ের বাড়িতে ছিল, আর বাচ্চাগুলো? ওরা কোথায়?

জুলেখা বলে যে মায়া সপ্তাহে একবার হলেও তার মাকে দেখতে যায়। বাচ্চাদের বোর্ডিং স্কুলে দিয়ে দিয়েছে। ওখানেও মাঝে মাঝে দেখতে যায়। বাচ্চাদের বাবাকে দিয়ে দিতে চেয়েছিল বাচ্চা। সম্পর্ক মায়ের সঙ্গে আর তার দাদার সঙ্গে ভালোই। তবে হোস্টেল জীবনে সে নিজেকে বেশি ইনডিপেনডেন্ট ভাবছে।

– কিন্তু এ জীবন আর কদিন?

– টাকা বেশি রোজগার করলে কোনও ফ্ল্যাটে উঠতে পারে। মায়ার অফিসে একটা প্রবলেম হয়েছিল। বাচ্চাদের বোর্ডিং স্কুলে রাখতে কিছু ছুটোছুটি করতে হয়েছিল বলে ওকে আর্ন লিভ নিতে হয়েছিল। অফিস নাকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইনে কেটে নিয়েছে। 'সাহসিণী' থেকে চিঠি গেছে অফিসে। আমরা মিডিয়াকে জানিয়েছি। এখন সব ঠাণ্ডা।

জুলেখা হাত-পা নেড়ে বলতে থাকে। মুখখানায় কোনও রঙের প্রলেপ নেই। নেই বলেই খুব সুন্দর লাগছে ওকে। আমি একটা সময়ে মুখে কোনও রং মাখাতাম না। সব বর্জন করেছিলাম। আসলে রং ধরেছিলাম, প্রেমে যখন পড়ি তখন। পরে রং এমনই ছেড়েছিলাম যে, রঙের কোনও অস্তিত্বই সইতে পারতাম না। তখন আমার যুক্তি ছিল, মেয়েদের সাজিয়ে মেয়েদের পণ্য বানানো হয়। তা তো অবশ্যই ঠিক। কিন্তু যুক্তিহীনভাবে কঠোর যুক্তিবাদী আমিও কিছু করি মাঝে মাঝে। ঠোঁটে হালকা একটু লিপস্টিক পরলে আমার ভালো লাগে। এই ভালো লাগাটা কোনও পুরুষের জন্য নয়। নিজের জন্য। মালা পরি। তাও নিজের ভালো লাগে বলে। এত কিছু পরার আছে, পৃথিবীর কত জায়গায় প্রাকৃতিক কত কিছু দিয়ে মানুষ সাজছে, সেই সাজপোশাককে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যদি মেয়েদের দাবিয়ে রাখার জন্য ব্যবহার করে, মানবো কেন?

জুলেখা বলছে। অনর্গল কথা বলতে পারে অনেকে। এটাও একটা গুণ বটে। আমাকে বলতে দিলে তা তো দুটো বাক্য বলার পরই আর কিছু খুঁজে পাই না বলার। জুলেখা বলে যায় 'সাহসিণী'র আরও অ্যাচিভমেন্টের খবর।

– সাহসিণী' কেন? সাহসী নয় কেন? প্রশ্নটি প্রসঙ্গ ছাড়াই করি।

জুলেখা একটু থতমত খায়। ভাবে। বলে– এমনি। কেন? 'সাহসিণী' নামটা কি খারাপ? সাহসী দেব?

– না, ঠিক আছে। অনেক কিছু করে ফেলেছো তো এই নাম দিয়েই। নাম দিয়ে কী যায় আসে? কাজই তো আসল। তোমরা খুব ভালো কাজ করছো।

জুলেখা এবার প্রস্তাবটা পাড়ে। বুবু, আমরা সভায় আলোচনা করেছি তোমাকে আমাদের উপদেষ্টা রাখবো।

– কেন? আমি কী উপদেশ দেব তোমাদের? তোমরা নিজেরা যা করছো, খুব ভালো কাজ। বরং তোমাদের কাছ থেকেই আমার অনেক শেখার আছে। তোমাদের সভায় মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকবো তোমাদের কথা শোনার জন্য। শেয়ার করা যায় অভিজ্ঞতাগুলো। এখানে হায়ারার্কির ব্যাপারটা দয়া করে বাদ দিও। কাউকে ওপরে আর কাউকে নিচে রেখো না। সবাইকে সমান সুযোগ দিও, সমান গুরুত্ব দিও।

জুলেখা উত্তেজিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে জুলেখাকে আমি চিনতাম, সেই জুলেখা এই জুলেখা নয়। এই জুলেখা আগের চেয়ে আরও বেশি স্বতঃস্ফূর্ত, আরও বেশি স্বচ্ছ, সুন্দর। জুলেখার হাঁটা, চলা, বলায় সবকিছুতে অসম্ভব দৃঢ়তা। এত শক্তি এই ছোট শহরে কী করে একটি মেয়ে কোত্থেকে পাচ্ছে! জুলেখা আমার কাছে আস্ত একটা বিস্ময়ের মতো।

হঠাৎ জানতে ইচ্ছে করে, জুলেখাকে যে কে বা কারা রেপ করেছিলো, তা কতদূর সত্য।

জুলেখা হেসে বলে, তুমি তো দেখি আমাকে চমক দিচ্ছ। রেপ-এর খবর উঠে এলো, যেন মরা মানুষ কবর থেকে জীবন্ত উঠে এলো। রেপ নিয়ে ভাবি না বুবু। বিয়ের পর থেকে আমি প্রতিদিনই রেপড হতাম। প্রতিদিন একটা লোকে রেপ করতো। একদিন একাধিক লোকে করেছে। ফারাকটা কোথায়, বলো?

– কেইস করোনি কেন?

– কার বিরুদ্ধে, হাজবেন্ডের বিরুদ্ধে?

জুলেখা জোরে হাসতে হাসতে বলে– চমকে গেলে তো? কিচ্ছু লাভ নেই কেইস করে। ওই রেপিস্টদের বিরুদ্ধে কেইস করেও লাভ নেই। ছাড়া পেয়ে যেত। মাঝখান থেকে লইয়ার আমার শরীরটা লুটতো। টাকা-পয়সাগুলো লুটতো। এই তো হয়, তুমি রেপড, তুমি ইয়াং। কোন লইয়ার তোমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে চাইবে না বলো?

আমি বোবার মতো বসে থাকি। ঠিক বুঝে পাই না কী বলবো।

জুলেখা সমান তেজ নিয়ে বলতে থাকে।

– তুমি খুব ওপরতলায় বাস করো, তুমি বুঝবে না নিচের তলার আমরা কী করে বেঁচে থাকি। তোমার রিয়ালিটি আর আমাদের রিয়ালিটি আলাদা।

– এত আলাদা ভাবছো?

– হ্যাঁ, ভাবছি।

– কারা ছিল ওরা? কারা রেপ করেছিলো?

শুনে জুলেখা এবার আগের চেয়েও আরও বেশি জোরে হেসে ওঠে।

– কী দরকার জেনে তোমার? কী দরকার? জানার দরকারটা কী তোমার?

– জানতে চাইছি!

– হবে কেউ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– সুরঞ্জন কি জড়িত ছিল কোনওভাবে?

– সুরঞ্জন জড়িত ছিল? ও তো বলে, ছিল। আমি জানি না।

– হেঁয়ালি করো না।

– ছিল হয়তো।

– স্পষ্ট করে বলছো না কেন?

– অস্পষ্ট করেও কিছু বলছি না। কে ছিল না ছিল তা আমার কাছে ইম্পরটেন্ট না। সুযোগ যারা পেয়েছিল, ছিল। সুযোগ যারা পায়নি, ছিল না। সুযোগ পেলে সবাই রেপ করতো।

– হিন্দুরা করেছিল রেপ। তুমি মুসলমান বলে?

– আমি মেয়ে বলে করেছিল। মহব্বতের কৃতকর্মের শোধ নিতে যদি হিন্দুরা করে থাকে, মহব্বতের কৃতকর্মের শোধ নিতে মুসলমানরাও ওই একই কাণ্ড করতো, মহব্বতের বউকে রেপ করে শোধ নিত। পৃথিবীর সবখানেই এভাবে মেয়েদের ইউজ করা হয়। এ নতুন কিছু না।

– চুপ করে বসে থেকেছো কেন?

– চুপ করে বসে থাকবো কেন? একটা রেপিস্টের সঙ্গে দিব্যি প্রেম করলাম।

– জেলে না ঢুকিয়ে বরং আস্কারা দিলে।

– দিলাম। কারণ রেপিস্টদের দলের মধ্যে ওই ছিল বেটার। ও তো বলে ও নাকি আমাকে সবার আরও বেশি রেপড হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে। সুরঞ্জন রিপেন্টেড ছিল বলে বেশ। সিমপ্যাথিও দেখিয়েছিল। ছেলেদের তো সিমপ্যাথি নেই মেয়েদের জন্য।

– এই সিমপ্যাথির কোনও মূল্য আছে?

– মূল্য যে নেই, তা বোঝা যাচ্ছে সম্পর্কটা আর নেই বলে। তবে সুরঞ্জনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, ধর্ষণের ঘটনা ঘটিয়েছিল বলে আজ আমি আগের সেই জঘন্য জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছি।

– সুরঞ্জন এ রকম কাজ করতে পারে, কেন যেন বিশ্বাস হয় না।

– আমারও বিশ্বাস হয় না। আমার চোখ বাঁধা ছিল। আমি, সুরঞ্জন কেন, কাউকেই দেখিনি কে ছিল, কারা ছিল। সুরঞ্জন বলেছে, সে ছিল। কেন বলেছে, কে জানে? কাকে বাঁচানোর জন্য বলছে, জানি না। কার দোষ ও ওর ঘাড়ে নিতে চাইছে তাও জানি না। আমি শুধু আমজাদের কথা জানতাম। তবে আমজাদ আর তার বন্ধুরা বা সুরঞ্জন আর তার বন্ধুরা, যে-ই ঘটনাটা ঘটিয়ে থাকুক, ঘটিয়েছে। ইট ইজ পাস্ট। আই ডোন্ট কেয়ার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কোনও দিনই জানতে চাইবো না তারা কারা ছিল। কোনও দিনই তাদের বিরুদ্ধে আমি কোর্টে যাবো না। মহব্বতের টাকা ছিল, সেও তো কেয়ার করেনি। ও রেপড হয়েছে, ব্যস। ওকে এখন আরও দশবার রেপ করো।

– তোমরা শিক্ষিত মেয়েরাই যদি অন্যায়ের প্রতিবাদ না করো তাহলে অন্যরা কী করবে?

– এসব বাজে কথা ছাড়ো। ওই রেপ-এর ঘটনা আমার জীবনে বড় একটা আশীর্বাদ। ওটা না ঘটলে জীবনটা ওলটপালট হতো না। নষ্ট হিসেবে সমাজের খাতায় নাম না উঠলে যা ইচ্ছে তাই করা যায় না। কেউ দেয় না যা ইচ্ছে তাই করতে। ওই যে সুরঞ্জনের বাড়িতে ওপেনলি শুতে পারতাম গিয়ে, পেছনে গ্যাং রেপের ঘটনা না থাকলে সুরঞ্জনও ইজি করে ব্যাপারটা নিত না। ওরও সংকোচ হতো। তবে রেপড হয়েছিলাম বলে লাভ মেকিং কাকে বলে তা জেনেছি। না হলে তো জীবনে জানাও হতো না।

কলকাতায় এত মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। জুলেখার মতো এমন নিঃসংকোচে এত ভয়ংকর কথা আর কাউকে বলতে শুনিনি।

– সুরঞ্জনকে ঠিক বুঝতে পারি না। ও আবার লেকের দিকে যাচ্ছে, আত্মহত্যা করে বসে কিনা... ভয় হয়।

জুলেখা বলে, কোন দুঃখে সুইসাইড করতে যাবে? জীবনকে সুরঞ্জন খুব ভালোবাসে। এ রকম নড়বড়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবনই সে এনজয় করে। আমাকে ডাম্প করার চমৎকার যুক্তি দেয় সে, বলে সে নাকি আমার যোগ্য নয়।

– তার মানে, তোমাকে সে বেশ অনার করছে।

– নিজেকে করছে। নিজে যেন বেশ একটা কী বলে যেন মহান লোক, মহাত্মা গোছের, যেন স্যাক্রিফাইস করছে অন্যের জন্য।

সব অ্যাকটিং।

ঠিক বুঝতে পারছি না, শহরের মধ্যে এ রকম একটা গ্যাং রেপ-এর মতো ঘটনা ঘটে যাবে, আর কেউ সেটা জানবে না, এ নিয়ে কেউ কোনও কথা বলবে না, কোনও লেখালেখি হবে না, কেউ কোর্টে যাবে না, কে বা কারা দোষী কেউ জানবে না। যারা জানে, তারাও মুখ বুজে থাকবে। কী রকম যেন অবিশ্বাস্য ঠেকে। জুলেখার কথা বলা, কথা বলার ধরন আমাকে চমকিত করে। মুগ্ধও করে। ওর মনোবল এমনই এখন দৃঢ়, উঠতে উঠতে এমনই চূড়ায় উঠেছে যে আমার ভয় হতে থাকে সহসা আবার সামান্য হাওয়া এসে ভেঙে না দেয় সবকিছু। ব্যক্তি কারও ওপর রাগ করে যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলেখা আজ এই জায়গায় এসে দাঁড়ায়, যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তবে সে রাগ যদি উবে যায় কোনও কারণে, জুলেখাও গলে নদী হবে। তার আর ইস্পাত হওয়া হবে না। পুড়ে পুড়ে দগ্ধ হলেই তো ইস্পাত হওয়া হয়। তবে সুরঞ্জন সম্পর্কে জুলেখার যা ধারণা, আমি মেনে নিতে পারি না। যদি কাউকে বাঁচাতে সুরঞ্জন নিজের কাঁধে দায়িত্ব নেয়, তবে ওই আমজাদদের বাঁচাতেই। আমার কোনও রকম স্বাধীনতা নেই সুরঞ্জনের চরিত্র সৃষ্টি করার। সুরঞ্জন নিজেই তার চরিত্রটির স্রষ্টা। জানি না কেন, আমার মনে হতে থাকে, রেপ-এর ব্যাপারটাই হয়তো সাজানো। আদৌ এ রকম কোনও ঘটনা ঘটেনি। সুরঞ্জন আর জুলেখা দুজনই পরস্পরকে বলছে, ঘটেছিলো। ভাবতে ভাবতে, সাজাতে সাজাতে, বলতে বলতেই হয়তো বিশ্বাস করছে যে এ রকম একটা ঘটনা সত্যিই ঘটেছিল। আবারও মনে হয়, এ রকম বিশ্বাস তো তাদের হয়, যাদের মাথায় গণ্ডগোল আছে। সুরঞ্জন আর জুলেখাকে মাথা খারাপের দলে আমি কোনওভাবেই তো ফেলতে পারি না। তবে ভুলটা কোথায়? ভুলটা কে করেছে? আমি হারিয়ে যেতে থাকি একটা ধোঁয়ায়...।

যে মায়াকে আমি জানতাম, জুলেখা বললো, সেই মায়াও নাকি আমূল বদলে গেছে। তবে আমি যদি মনে করি, মায়া ঢাকার সেই মুসলিম মৌলবাদী ধর্ষকদের ক্ষমা করে দিয়েছে, তবে ভুল। যে কোনও ধর্ষকের বিরুদ্ধেই সে, সে যে ধর্মেরই হোক না কেন। যে কোনও নারীবিদ্বেষীর বিরুদ্ধে সে, সে যে ধর্মেরই হোক না কেন।

তবে জুলেখা হেসে বলে, মায়া অবশ্য বলে, পুরুষরা সব এক, সে যে ধর্মেরই হোক না কেন।

– এত তাড়াতাড়ি এই রিয়েলাইজেশনটা ওর এল কী করে? বিয়ে করার জন্য এই সেদিনও তো পাগল ছিল।

জুলেখা বলে, পাগল যারা বেশি থাকে, তাদের টনকটা আগে নড়ে।

– তাই কি?

– তাই।

– আমার মনে হয় না। ধর্মান্ধদের টনক সহজে নড়ে না। কোনও কিছু নিয়ে অন্ধ হওয়া মানে তো সে দেখতে পাচ্ছে না সবটা। বিয়ে-সংসার এসবের মোহ যার তীব্রভাবে থাকে, তার তো খুব বড় ধাক্কা না খেলে এই মোহ যাবার নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– ধাক্কা মায়া কম খায়নি বুবু। ও আমার কাছে রাতের পর রাত ওর জীবনের গল্প বলেছে। ও তুমি কিছুই জানো না। ময়ূর চলে গেলে ভাবছি মায়াকে আমার রুমমেট করে নেব।

– বিয়েটিয়ে করবে না কেউ আর?

জুলেখা বলে, তুমি নিজে তো একা থাকো। অন্যকে বিয়ে করার পরামর্শ দাও কেন? আমাদের একা থাকার পরামর্শ দাও না কেন?

– হোস্টেলে আছো। যে টাকা মাইনে পাচ্ছো, চলতে পারছো। কিন্তু কোনও ফ্ল্যাট নিয়ে থাকা কি পোষাতে পারবে?

জুলেখা দুজনের জন্য চা করে নিয়ে আসে। ঘরেই তার চায়ের সরঞ্জাম আছে। আমাকে এক কাপ চা দিয়ে বলে, সে ক্ষেত্রে কয়েকজন মেয়ে মিলে থাকবো।

– মানে?

– মানে কয়েকজন মিলে। একসঙ্গে থাকা। লিভ টুগেদার।

– সেই সিক্সটিজের কমিউন?

– কী বললে?

– হিপি আমলে ছেলেমেয়েরা ইউরোপ-আমেরিকায় কমিউনে থাকতো। ধরো একটা বাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে থাকতো। ওই রকম?

– না না, ওই রকম না।

জুলেখা তার চায়ে চিনি নাড়তে নাড়তে বয়াম থেকে চারটে বিস্কুট আমার হাতে বাড়িয়ে দিতে দিতে বলে, ওই রকম না।

– বিস্কুট নেব না আমি।

– বিস্কুটে কামড় দিয়ে জুলেখা বলে– আমাদের কমিউনে কোনও ছেলে থাকবে না।

চা আমার ছলকে ওঠে হাসিতে। বলি– তুমি কি পুরুষবিদ্বেষী– নাকি?

– কী কথা বলো তুমি? ইফ ইউ অ্যালাও আ ম্যান টু লিভ উইদ আস, হি উইল ফাক অল অব আস।

– এটার উল্টোটাও হতে পারে।

– কী রকম?

– ইউ অল ক্যান ফাক হিম।

জুলেখা হেসে গড়িয়ে পড়ে বলতে বলতে, ইউ উইল ফাক হিম টু ডেথ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলেখার কাছে আমার এক কাপ চা অবধি থাকার কথা ছিল। চার কাপ চা অবধি থাকি। মায়ার সঙ্গেও দেখা হয়। ওকে জড়িয়ে ধরে রাখি বুকে। সুরঞ্জন আর কিরণময়ীর কাছে যে উত্তাপ আমি চেয়েছিলাম, সেই উত্তাপ আমি মায়ার কাছে পাই। ওদের রাত আটটার সভায় আমার থাকা হয় না। কথা দিই আগামী সপ্তাহেই যাবো। মায়া আর জুলেখা সামনের রোববার আমার বাড়িতে আসছে। ওদের নিয়ে ভাবি দীঘা চলে যাবো। অনেক দিন দূরে কোথাও যাই না। শরীরে মনে হচ্ছে শ্যাওলা পড়ে গেছে।

—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~